গতিময় অভিযান
আকাশে স্বপ্নের রং। বাতাসে
শিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন
শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে
চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ
নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়,
শহর মানেই যান-বাহনের অভাব,
শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের
দু' ধারের চরম অস্বাচ্ছন্দ্যের
তিক্ত অভিজ্ঞতা।
ব্যাপক জনসংখ্যায় বিপর্যস্ত
কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সময়কে
পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্ভ রেলের
ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। ভূগর্ভ
রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ
যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের
প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই
জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক
গতিময় অভিযান।
Mtp
কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

'শিশুশাল ফুঁড়ে যাবে নীলিমা নৈরাজ্য, দুঃখ তবে
হবে সুখ, সুখ হবে নদীতে জোয়ার···
নৌকো তো ভেসেই ছিল জলশূন্য নদীতে একদিন
জোয়ার এখন ॥'

—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ছন্দ
সমন্বয়
গড়ে ওঠে
যৌথ
প্রচেষ্টায়
ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী
করে তুলতে সাহায্য করছে

গন্ধর্ব | বিজন ভট্টাচার্য : বাংলার থিয়েটার আন্দোলন

আশ্বিন ১৩৮৪ / ক্রমিক সংকলন ৩০

সহযোগিতা/সৌজন্য — সুধী প্রধান, বিভাস চক্রবর্তী, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সেন, অভিনয়, সপ্তাহ, প্রবীর বসু, নাট্যদর্পণ, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সুশান্ত রায়, সুদীপ্ত বসু, দীপককুমার ঘোষ, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, মৃণাল সেন, নবারুণ ভট্টাচার্য, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নীহার দাশগুপ্ত, জি পি বড়ুয়া, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত মুখার্জী, মুকুর ভট্টাচার্য, সুধাংশু মৈত্র, অলক ব্যানার্জী, বিপ্লব চৌধুরী, শান্তিময় ঘোষ, শিবাজী সেন, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, কণিষ্ক রায়, দিলীপ ব্যানার্জী, স্বাধীনতা, দেশ, কালান্তর এবং সমস্ত বিজ্ঞাপন দাতা ও প্রাচী প্রেসের কর্মীবৃন্দ।

সম্পাদক : নৃপেন্দ্র সাহা

রমণ মহেশ্বরী কর্তৃক গন্ধর্ব-র পক্ষে ১৮ সূর্য সেন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০১২ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক প্রাচী প্রেস ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত। বাণিজ্যিক ঠিকানা : গন্ধর্ব | ১১৩ নেতাজী সুভাষ রোড, রুম নং ১১৩, কলকাতা-৭০০০০১। ফোন : ৩৩-৮৭১৯ ও ৪৪-৬০৫৯

নবান্নের স্মারক-সূচী

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ

কর্তৃক

নবান্ন

নবান্ন প্রযোজনায়

পরিচালনা—শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য

নবান্নের প্রধান

নবান্নেব

৩টি

দুর্লভ

নাট্য-চিত্র ঃ প্রথম রজনীব

১ গ্রামে ফিরে আসা
জলদ ও তৃপ্তি
সুধী ও শোভা

২ এবার জোর প্রতিরোধ. প্রধান।
শম্ভু, বিজন. সুধী, গঙ্গাপদ
ও অন্যান্য

৩ শেষ দৃশ্যে ঃ নবান্ন উৎসব

[সুধী প্রধানের সৌজন্যে]

॥ তিতাসে ॥
বামকেশবের ভূমিকায়

নাট্যচক্রের 'নীলদর্পণ' তোরাপরূপী বিজন
ডানদিক থেকে দণ্ডায়মান চতুর্থজন

উত্তরকালের চলচ্চিত্রাভিনয়ে বিজন : মৃণাল সেনের 'পদাতিক'

বিজন ভট্টাচার্য : বাংলার থিয়েটার আন্দোলন | সম্পাদকীয় খসড়া

সমাজমনের সমূহ বাসনার এক নিষ্ঠুর নিপুণ রূপকার আমাদের থিয়েটার। সামাজিক অস্তিত্বের ঝংকার তার পরদায় পরদায়।

ফলত সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় নৈষ্ঠিক দায়িত্ব অঙ্গীকার করেই যে থিয়েটারের মুক্তি— এ ধারণা সেই জন্মলগ্নের থিয়েটার শিল্পীর মনেও স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছিল বলেই সেকালের থিয়েটার শিল্পেরও বড় কাজ হলো স মা জ কে ধাক্কা দেওয়া, দিয়ে তাকে চালিত করা।

সমাজকে চালিত করার সূত্রেই সামাজিক ন্যায়-নীতি, ঔচিত্য-অনৌচিত্য এবং আদর্শবাদ প্রখর হয়ে উঠেছিল সে যুগের বাংলা থিয়েটারে। মঞ্চের ভূমিকা, আমাদের দেশে, তখন থেকেই শিক্ষকের। মঞ্চ যে বিনোদনের বাহন নয়, সামাজিক ন্যায় অন্যায়ের সেও একজন কঠোর বিচারক; শিল্পীর নির্ভেজাল সততায় এ সত্য সেদিন প্রতিষ্ঠিত। বাংলার থিয়েটার আন্দোলনে এই সমাজ সত্যেরই সমর্থন মেলে সে দি ন কা র নাট্যরচনা এবং প্রযোজনার দীর্ঘ তালিকার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে।

সব প্রচেষ্টাই যে সেদিন নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে উৎকর্ষ-মণ্ডিত হয়েছিল এমনটা নিশ্চয়ই নয় কিন্তু সেদিনের বাঙালীর সার্বিক থিয়েটার-কর্মটাই ছিল সামাজিক স্বাধিকার লাভের এক অপ্রমত্ত আয়োজন। ফলে সমাজ সংস্কারের বিদ্যাসাগরীয় ব্যাপার স্যাপার খুব সহজেই থিয়েটারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সামাজিক আন্দোলন অনূদিত হতে লাগলো থিয়েটারের আন্দোলনে।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যেহেতু মধ্যবিত্ত উদ্যমে তাই সামাজিক ভাঙচুড়ের মধ্যে গি য়ে ও পুরোটা এগিয়ে যাওয়ার সাহস থাকে না মধ্যবিত্ত শিল্পীদের। মাই-কেলের মতন কমিটেড নাট্যকারকে তাই বাধা পেয়ে কলম তুলে নিতে হয়। আক্ষেপ করতে হয় মধ্যবিত্তের অলীক নাট্যপ্রীতি দেখে। এই মধ্যবিত্ত মানসিকতার নাট্যকারকেই আবার নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তৎকালীন গণআন্দোলন লক্ষ্য করে 'নীলদর্পণ'এর মতো বিদ্রোহ বাসনার নাটক লিখেও শাসক-ভজনার ভাণ করতে হয়। কিন্তু এসব দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও 'নীলদর্পণ' নাটক বস্তুত বাঙালীর বিদ্রোহী চিন্তা চেতনার অগ্রদূত। এ নাটক প্রকৃতপক্ষে বিদেশীয় শোষণনীতির বিরুদ্ধে দেশীয় কৃষককুলের রক্তচক্ষু প্রতিবাদ। এই নাটক

সূত্রেই এলো বাংলা থিয়েটারের রাজদ্রোহী চেতনা। জাতীয় জন-জাগরণ দেখা দিতে শুরু করলো নগরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে। দর্পণ সিরিজের নাটকগুলির মধ্যে সে যুগের থিয়েটারের জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পরূপ, এক বিশেষ ধরণের অভিব্যক্তি লাভ করে। লেখা হয় সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক, জগদানন্দ ও যুবরাজ প্রহসন। বাংলা থিয়েটারের এ অধ্যায় মূলত দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনেরই ফসল। ফলে এই সময়েই সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও উৎপীড়নের মুখোমুখি হতে হয় বাংলা থিয়েটারকে।

১৮৭৬-র নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়ে যাবার ফলে বাংলার তৎকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক জীবন জটিলতার সঙ্গে থিয়েটার সংস্কৃতির জটও জড়িয়ে যায়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সংস্কারমুক্তির আন্দোলন, পরাধীনতার নাগপাশ মুক্তির স্বপ্ন-আন্দোলন, এবং নিরন্ন বাঙালী তথা ভারতীয়দের রাজনৈতিক আন্দোলন (সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, পাবনার প্রজা বিদ্রোহ প্রভৃতি)-এর প্রেক্ষাপটে বাংলার থিয়েটার আন্দোলনও এক বিচিত্র চেহারা নিয়ে মোজ্যাইক দৃশ্যপট রচনা করে চললো।

ওদিকে ঐ নীলদর্পণ নাটক নিয়েই ১৮৭২এ আমাদের মধ্যবিত্ত থিয়েটার শিল্পীরা অপেশাদারী থিয়েটার আন্দোলনকে পরিচালিত করলেন পেশাদারী থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্তর্গত হয়ে মধ্যবিত্ত শিল্পীসমাজের এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনের যা পরিণতি হয়, তাই হলো। আধা সামন্ততান্ত্রিক জমিদার মুৎসুদ্দির খামখেয়াল থেকে মুক্ত হয়ে মধ্যবিত্তের ন্যাশনাল থিয়েটার উঠতি বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলো। অচিরেই মুনাফালোভী থিয়েটারের বিনোদনতন্ত্রের কাছে মুচলেকা লিখে দিতে হলো বাংলার তৎকালীন থিয়েটার আন্দোলনের। ১৮৭৬ এর নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হবার পর থিয়েটারী বাণিজ্যটা বেশ জমে উঠলো। তবু এরই মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে ইতিহাসাশ্রিত রূপকের আড়ালে কই জিইয়ে রাখার মত করে জিইয়ে রাখা হয়েছিল অনেক দিন। কিন্তু ততদিনে সরকারী সন্ত্রাস-কবলিত হয়ে বাংলা থিয়েটার মূলত ধর্মকথার আসরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সূচনাকালের গণজাগরণের থিয়েটার শতাব্দী শেষ হবার আগেই ঘুমপাড়ানিয়া থিয়েটারে পরিণত হলো। একই সঙ্গে সামাজিক এত বিভিন্নমুখী রক্ত চলাচলের মধ্যে থেকে বাংলা থিয়েটারকে তার শ্বাসকার্য চালাতে হয়েছে যে অতিক্রুত রক্তশূন্য হয়ে উঠলো তার ধমনী। নীরক্ত হয়ে উঠলো গিরিশ-অমরেন্দ্র-দানির থিয়েটার। বিষয়হীন শিল্পপ্রকরণের থিয়েটার বিনোদনের মূল্যেই বিকিয়ে যায়। এককালের শৈল্পিক উৎকর্ষ অন্যকালের দৃষ্টিতে অপকর্ষ বলেই ধিকৃকৃত হয় ইতিহাসে। কারণ আর্টফর্ম কখনো ষ্ট্যাটিক নয়। কিন্তু মানবতার স্বার্থে বিষয়ের গুরুত্ব যেখানে অপরিসীম, সেটা কালাকাল জুড়ে টিঁকে থাকে। গিরিশদের থিয়েটার পরাস্ত হলো শিশিরকুমারের রুচিশীল কুশলী অভিনয়ে। কিন্তু শিশিরকুমারও পারলেন না ভারহীন বিষয়ের লঘু পদচারণায় বাংলা থিয়েটারের অহল্যাভূমিকে জাগ্রত করতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কাতেও শিশিরকুমারের ঘুম ভাঙলো না। থিয়েটারে অভিনেতা-কেন্দ্রিক যে মানসিকতা দর্শকমানসে গড়ে উঠেছিল দীর্ঘ সাতটি দশকজুড়ে, তার কাল ঘনিয়ে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কমিটেড থিয়েটারের ধাক্কায়। বক্তব্যের তাৎপর্যে থিয়েটার আবার সচল হয়ে উঠলো। আর ফর্মের বিচারে অভিনেতার থিয়েটার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গড়ে উঠলো ডিরেক্টরের থিয়েটার।

২ □

নতুন করে শুরু হলো অপেশাদারী থিয়েটার আন্দোলন। ব্যবসায়িক থিয়েটারের বিবর্ণ সিনসিনারির অলীক জগতে একক অভিনয়ের মড্যালেটেড্ আর্তনাদে সমস্ত থিয়েটার ব্যাপারটাই তখন হয়ে উঠেছিল মিথ্যার প্রতিভাস। মঞ্চের এই মিথ্যাকে বাস্তব সত্যের আঘাতে ভেঙ্গে তছনছ করে গুঁড়িয়ে দিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ।

দেশজুড়ে তখন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আর যুদ্ধের কালোছায়া। এরই মধ্যে লোভী একদল মানুষের তৈরী করা দুর্ভিক্ষে দেশের শ্রমজীবী মানুষ তখন নিরন্ন, সর্বহারা।

আর সেই দেশের থিয়েটার কিনা তখন মুখে রঙ মেখে সুখদুঃখের রূপোলি গল্প শুনিয়ে মুনাফার স্বপ্ন দেখে। এই মিথ্যার জগৎ থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করার জন্য গণনাট্য সংঘ বাস্তবের কালিঝুলি মাখা ন্যাকড়ার পুঁটুলি কোলে ভিটেমাটি ছাড়া একদল নিরন্ন মানুষকে তুলে আনলো মঞ্চের ওপর। সিনসিনারির পরিবর্তে বিশুদ্ধ চট প্রেক্ষাপটের কাজ করলো। বাইরের জগতের পরিচিত 'ফ্যান দাও, একটু ফ্যান দাও' ধ্বনি মঞ্চের উপর সৃষ্টি করলো জীবন্ত অনুষঙ্গ। গোটা থিয়েটার হয়ে উঠলো জীবন্ত সমাজ দর্পণ।

এইভাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও নবান্ন সৃষ্টি করলো বাংলা থিয়েটারের এক সচল অধ্যায়। প্রগতিশীল সমাজচেতনা ও অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে জন্ম নিলো বাংলার গণনাট্য আন্দোলন।

বিশুদ্ধ রাজনীতি সচেতন একদল কম্যুনিষ্ট শিল্পী ভোল পালটে দিলো বাংলা থিয়েটারের। সমাজ সচেতনতার ব্যাপারটা এখন থেকে কেবল উদারনৈতিক বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলো না, দেখা হতে শুরু হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

থিয়েটারের এক নতুন ধারণা গড়ে উঠল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী দর্শকমানসে। থিয়েটার তার চার দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়লো শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক বন্ধন গড়ে তুলতে। দেশের আপামর জনগণ এগিয়ে এল এই নতুন গণসংস্কৃতির আস্বাদ নিয়ে 'বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে বলীয়ান' হয়ে উঠতে।

এই গণসংস্কৃতির প্রেরণা জোগাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন। রমাঁ রল্যাঁর পিপলস্ থিয়েটার মুভমেন্টের আদর্শে গড়ে উঠলো ভারতের গণনাট্য আন্দোলন। আই পি টি এর ১ সংখ্যক বুলেটিনে স্পষ্ট লেখা হলো ইট ইজ এ মুভমেন্ট হুইচ সিক্‌স টু মেক্ আওয়ার আর্টস দি এক্সপ্রেশন এণ্ড অর্গ্যানিজম অব আওয়ার পিপল্‌স স্ট্রাগল্ ফর ফ্রীডম, ইকনমিক জাস্টিস্ এণ্ড এ ডেমোক্রেটিক কালচার।

গণনাট্য আন্দোলনের এই প্রেক্ষাপটে যে বিরাট সংখ্যক গণশিল্পী নাচগান অভিনয়ে বাংলার গণসংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করতে এগিয়ে এলেন, তাঁদেরই একজন হলেন নটনাট্যকার নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য যাঁর প্রাণময় অভিব্যক্তিতে বাংলানাটক ও নাট্যাভিনয়ে একটা নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো। অব্যবসায়িক থিয়েটারের যাবতীয় দুঃসাহস ও স্পর্ধা, যা গণনাট্যের শিল্পীদের নানাবিধ শিল্পকর্মের ভিতর চিত্রল গতিময়তার সঙ্গে অঙ্কিত হতে লাগলো সে সবই সংগৃহীত হয়েছে সেইসব শিল্পীদের নানাবিধ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভূমি থেকে লোকায়ত জীবনচর্যা থেকে। যেমন বিজনের নবান্ন রচনার পটভূমিতে, কি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর নবজীবনের গানে, গণনাট্য সংঘের 'ক্ষুধাও মহামারী' নৃত্যে, হিন্দী অন্তিম অভিলাষ নাট্যানুষ্ঠানে, আব্বাসের 'ধরতী-কে লাল' চলচ্চিত্রে, অনিল ঘোষের নয়নপুর, ঋত্বিক ঘটকের সাঁকো, দলিল, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা সর্বত্রই লোকজীবনের অভিজ্ঞতাকে ভেঙ্গে, টুকরো করে, জুড়ে, বাদ দিয়ে, যোগ করে অদ্ভুত সব দুঃসাহসের ভয়ঙ্কর রকমের বিশ্বস্ত শিল্পকর্ম সংযোজিত হলো এই পিপলস্ থিয়েটারে। সুতরাং গণনাট্য আন্দোলন শুধুই রাজনৈতিক প্রচার, কম্যুনিষ্টদের কাণ্ডকারখানা—একথা বলার মতো মূর্খামী কেউ করতে পারলেন না।

দেশের মাটি, মানুষ, সেই মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে, তার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই গণনাট্যের যাবৎ শিল্পকর্ম সাধিত হয়েছিল। ফলে বিজনের নবান্ন বাংলা নাটকের সেই নীলদর্পণের সংগ্রামী ঐতিহ্যকেই এগিয়ে নিয়ে এলো।

কিন্তু গণনাট্য আন্দোলনের এই পিপল্‌স স্ট্রাগল্ ফর ফ্রীডম, ইকনমিক জাস্টিস এবং ডেমোক্রেটিক কালচারের ভিত্তি তো মধ্যবিত্ত মানসিকতার দুর্বল বিপ্লবী চেতনায়। ফলে এই ব্যাপক গণশিল্পীর মধ্যে সংগঠনের প্রতি আনুগত্য তেমন দৃঢ়মূল হতে পারেনি, কিংবা সাংগঠনিক আনুগত্য যাঁরা মেনেছেন, শিল্প কর্মের ফ্লেক্‌সিবিলিটিকে তাঁরা বুঝতে চাননি— এই ভাবে গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে শিল্পীদের সব ব্যক্তিগত শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য, সংস্কার, পিছুটান, উচ্চবিত্ত জীবনের স্বপ্ন-দোদুল্যমানতা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিতে লাগলো। যার ফলে স্বাধীনতা

প্রাপ্তির দুবছরের মধ্যে এই আন্দোলন থেকে তথাকথিত বহু গণশিল্পী নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। শ্রেণীহীন সমাজ-গঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবন, বিপ্লবীচেতনা নিয়ে তারা কতটা এগোতে পারে আর কতটা পারে না, তারই এক দলিল হয়ে থাকলো বাংলার এই অপেশাদারী থিয়েটার আন্দোলনের বিশিষ্ট এই অধ্যায়টি।

৩□

শম্ভু মিত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়ে সৃষ্টি করলেন 'বহুরূপী'। গ্রুপ থিয়েটার তৈরীর এই পর্বে একে একে আরো অনেকেই বেরোলেন। বিজন ভট্টাচার্যও বেরিয়ে এলেন। সৃষ্টি করলেন 'ক্যালকাটা থিয়েটার'। দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় করলেন নতুন গ্রুপ 'নাট্যচক্র'।

বাংলা থিয়েটার আন্দোলনে গণনাট্য আন্দোলনের পর এই যে নতুন গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন শুরু হলো এর নাম দেওয়া হলো নবনাট্য আন্দোলন।

গণনাট্য আন্দোলনের একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। নবনাট্য আন্দোলন সেই রাজনৈতিক লক্ষ্যবর্জিত গণনাট্যের একটা পাল্টা আন্দোলনরূপে গড়ে উঠলো। নবনাট্যের কোন কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় সংগঠন না থাকায় যে যার স্বাধীন বোধ বুদ্ধি এবং শিল্পকর্ম অনুযায়ী এক একটা লক্ষ্য ঘোষণা করতে লাগলো। ফলে অচিরেই নবনাট্য আন্দোলনের মধ্যে মতানৈক্যের ঝড় উঠলো।

এবং বাদানুবাদ থেকে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো তা হলো থিয়েট্রিক্যাল আর্টস ব্যাপারটাকে এরা অধিক প্রাধান্য দিতে চায়। আর বক্তব্যের বিচারে মোটামুটি দুই ভাগে এরা ভাগ হয়ে গেল। এক দল গণনাট্য আন্দোলনের শরিক রূপে সর্বহারার মতবাদকেই অঙ্গীকার করে নিলো। অন্যদল স্বাধীন দেশের বুর্জোয়া পরিবেশের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়ে অবক্ষয়, হতাশা আর ব্যক্তি জীবনের ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতাকেই অবলম্বন করলো। রবীন্দ্র-প্রযোজনায় অবশ্য নবনাট্যের একটা পৃথক ঐতিহ্য তৈরী হলো। কিন্তু মধ্যবিত্ত শিল্পীদের উচ্চাশা যাবে কোথায়? ব্যক্তি জীবনের প্রতিষ্ঠার লড়াইটাই বড় হয়ে উঠলো এই নবনাট্য আন্দোলনের কালে। এবারও অপেশাদারী থিয়েটার আন্দোলন পাবলিক স্টেজ দখলের স্বপ্ন দেখায় মগ্ন হয়ে একদিন ঐ পেশাদারী থিয়েটারের আবর্তেই গা ভাসালো। এক্ষেত্রে প্রগতিবাদী নবনাট্য কর্মী আর প্রতিক্রিয়াপন্থী নবনাট্য কর্মী ও এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছু রইলো না।

যে ভুল আমাদের থিয়েটার আন্দোলনের গোড়ায় যুগের শিল্পীরা করেছিলেন ১৮৭২এ, সেই একই ভুলের খেসারত দিতে হলো প্রায় শতবর্ষের মুখে একালের শিল্পীদেরও—পেশাদারী থিয়েটারের গর্ভে নিজেদের অপেশাদারী ভাবমূর্তিকে বিলীন করে দিয়ে। নবনাট্য আন্দোলন বিধ্বস্ত হয়ে যাবার মুখে দেখা দিল কিমিতিবাদী নাট্য আন্দোলন, সৎ নাট্য আন্দোলন। নবনাট্য আন্দোলন যদিও বা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল কিন্তু এই দুই আন্দোলন একান্ত-ই স্বল্পস্থায়ী। এখন চলতি সালের গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীরা নিজেদেরকে আর কোন আন্দোলনের শরিক বলছেন না, বলছেন অন্য থিয়েটার। ওই অন্য থিয়েটারও কিন্তু আর পুরোপুরি অপেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলছে না, মুখে না বললেও আচার আচরণে কলকাতার অধিকাংশ গ্রুপ থিয়েটারই পেশাদারী থিয়েটারের মত চলাফেরা করে। ফলে অন্য থিয়েটারের প্রগতিশীল দলগুলিও তাদের বাম বক্তব্যের নাটক প্রযোজনা করতে গিয়ে দক্ষিণপন্থীদেরই তোয়াজ করে বেশি করে। পুরস্কার প্রতিষ্ঠা বিদেশভ্রমণ সবই তখন সহজ হয়ে আসে।

কিন্তু এতসব আন্দোলনের স্তর পার হয়ে এসেও বাংলার থিয়েটার আন্দোলন তার ঐ বিপ্লবী ঐতিহ্যকে হারায়নি। পিপল্‌স থিয়েটার অর্থাৎ গণনাট্য আন্দোলন '৪৮র পরেই যে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে তা নয়; বাংলার গ্রামাঞ্চলে গণনাট্য সংঘের বহু শাখা ৫০-এর দশকের পরেও ৬০-এর দশকে, এই ৭০-এর দশকেও যথেষ্ট সক্রিয় এবং রীতিমত প্রভাবশালী। নতুন করে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে মূল গণনাট্য-সংঘের সঙ্গে সংযোগ রেখেই। কলকাতায়ও এই সংঘের কিছু শাখা দারুণ সব শিল্পকর্মের নজির উপহার দিয়েছেন বাংলার জনগণকে। এইসব প্রযোজনার সঙ্গে কলকাতার কিছু গ্রুপ থিয়েটারও সমান তালে চলেছেন।

কিন্তু শহর কলকাতার এইসব বাম থিয়েটার অপেক্ষা গ্রামবাংলা এবং দূর বাংলার গ্রুপ থিয়েটারগুলিই যেন পিপল্স থিয়েটারের আদর্শকে অনেক দৃঢ় মূল করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জনগণের সংগ্রামী চেতনায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার থিয়েটার আন্দোলনে 'বৈপ্লবিক শক্তিতে বলীয়ান' হয়ে ওঠার চেতনা নিয়ে যে সব মধ্যবিত্ত মানসিকতার শিল্পীরা প্রোলেতকাল্টের আদর্শকে আদৌ বিসর্জন দেননি সেই স্তরের অগ্রণী গণশিল্পী হলেন বিজন ভট্টাচার্য। কিন্তু যেহেতু পেতিবুর্জোয়া সংস্কার পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে তাই মূল গণনাট্য সংঘ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়তে হয় তাঁকে। শিল্পীর স্বাধীন সত্তা নিয়ে সংগাঠনিক শৃংখলা মেনে চলতে না পারার ব্যর্থতা তাঁকে তাঁর সারাজীবন ধরে যন্ত্রণায় দগ্ধে মারে। সমূহ চেতনার কাছে ব্যষ্টির এই পরাজয় তাঁর 'মরাচাঁদ' নাটকে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণে ধরা পড়ে। ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে শিল্পী জীবনের দ্বন্দ্বে পবনের ব্যক্তিসত্তাই যেখানে বড় হয়ে উঠেছিল, তাকে সেখানে নাট্যকার উদ্ধার করে আনলেন সমূহ জীবনেরই প্রশস্ত আঙ্গিনায়। বোঝা যায় নাট্যকার বিজনের অন্তস্তলে পিপল্স থিয়েটারের আবেদন ব্যর্থ হয়নি।

এই সমূহ জীবনের সর্বহারা মতাদর্শের প্রতি আত্যন্তিক বিশ্বাস ছিল বলেই জীয়নকন্যা বা গোত্রান্তর তাঁকে বাঁচিয়ে দেয়। যেমন বাঁচিয়ে দেয় উত্তরকালের তাঁর দেবীগর্জন নাটক।

আমরা আমাদের থিয়েটারের এই সংগ্রামী নাট্যকারকে তাঁর যাবতীয় লিমিটেশন্স-সহই মূল্যায়ণ করতে চেয়েছি এই কারণে যে, যেখানে অপরাপর বহু গণশিল্পীই উত্তরকালে নানাধরণের বিচ্যুতিতে পিপল্স থিয়েটারের ক্ষতি করেছেন, জনগণের বিপ্লবী চেতনার রাশ টেনে ধরেছেন; সেখানে এই বিজন ভট্টাচার্য একাই তাঁর ক্যালকাটা থিয়েটার নিয়ে, তাঁর কবচ কুণ্ডল নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে কোনরকম আপোষ না করে, বিভিন্ন প্রগতি পরিপন্থী থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে কোন সমঝোতা না করে, যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন থিয়েটারের রণাঙ্গনে। একাকী সংগ্রামের যা ফল তা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। মার্কসবাদের সঙ্গে দেশীয় লোকধর্ম, তথা বর্ণাশ্রম ধর্মের শাস্ত্রীয় অনুপান মেশাতে গিয়ে দেশের রাজনৈতিক নেতারা যে ভুল করেছেন, বিজনও এক্ষেত্রে সেই একই ভুল করেছেন। 'বাস্তববাদী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দুর্গত দুনিয়ায় শিল্পীর একমাত্র বর্ম' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিজন যখন উচ্চারণ করেন 'আধ্যাত্মিক দিকটা বাদ দিলে কমিউনিস্ট পার্টি আমার বাহ্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পিছনে মানসিকতার দিক দিয়ে সেই দিব্যশক্তির কাজ করেছে।' তখনই বোঝা যায় শিল্পীর একাকীত্বই তাঁকে তাঁর ঐ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভাববাদী জগতে নিক্ষেপ করেছে, মার্কসীয় চিন্তার সহজ যুক্তির জগৎ থেকে উৎপাটিত ক'রে। এই বেদনার মধ্যেও বিজনের সান্ত্বনা 'বাস্তববাদী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী' এই 'দুর্গত দুনিয়া'য় তাঁর মতো 'শিল্পীর একমাত্র' বর্ম।

মার্কসীয় চিন্তা চেতনার সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনার সমীকরণ হয়নি বলেই বিজনের শেষের দিকের রচনায় তিনি 'অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে চলে গেছি' বলে স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হন।

পিপল্স থিয়েটারের শিল্পের যে শর্ত অর্থাৎ সহজ সাবলীলতা তা বিজনের দেবীগর্জনোত্তর রচনাবলীতেও তাঁর প্রযোজনায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে প্রায়শ। ফলে তাঁর থিয়েটারের দর্শকও আজ অনেক কম। শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত দর্শক নিয়ে একাকী বিজন কী করবেন যদি না তাঁর সেই নবান্ন জীবনের বৃহত্তর দর্শকসমাজের কাছে তিনি পৌঁছতে পারেন? এবং পৌঁছতে যে পারেন না, তাও নয়। নবান্নর পর তাঁর মাস্টারপিস 'দেবীগর্জন' তো বৃহত্তর জনগণের দরবারে বারবার হাজির হয়েছে? সুতরাং গণের সঙ্গে থাকার আকুতি যখন বিজনের সৃষ্টি-কর্মের মধ্যে আজো জলতরঙ্গের মত বাজে, তখন জনতরঙ্গের উদাত্ত আহ্বান কি তাঁকে আমরা জানাতে পারি না যে 'আসুন না বিজনদা! অপসংস্কৃতির প্রতিরোধে গণচৈতন্য সংগঠনে দ্বন্দ্বের শিকল ছিঁড়ে গণআসরে দৃঢ় দাঁড়ান!' আপনার নাটক জনগণে বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে উঠুক। আপনার থিয়টার পথ প্রদর্শক হোক সংগ্রামের।□

—নৃপেন্দ্র সাহা

বিজন ভট্টাচার্য : নাট্যজীবনের রূপরেখা

শৈশব বাল্য : ১৯১৭-১৯৩০

জন্ম ১৭ই জুলাই, ১৯১৭ খ্রী। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন। বিদেশে রুশ বিপ্লব ১৯১৭। জন্মভূমি : পূর্ববাংলার ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রাম।

পিতা ক্ষীরোদবিহারী। মাতা সুবর্ণপ্রভা। মাতুল প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। বিজন জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁরা পাঁচ ভাই পাঁচ বোন। পিতৃদেব প্রথম জীবনে খানখানাপুর সুরাজমোহিনী ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক। পরবর্তীকালে, বসিরহাট সাতক্ষীরায় শিক্ষকতা করেন। তাঁর আদর্শ জীবন-যাত্রা, সাহিত্যসঙ্গীত-প্রীতি এবং শেক্সপীয়ার চর্চা নিষিক্ত হলো বালক বিজনের মানসপটে। '১০ বছর বয়সেই অর্থ না বুঝলেও মুখস্ত বলতে পারতাম। আবৃত্তি করতাম। পিতৃদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত'।

পাশাপাশি সঙ্গীতের প্রতি বালক বিজনের তীব্র অনুরাগ। অনুরাগ গ্রামের মানুষজনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন তরঙ্গভঙ্গে। 'আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে। ছোটবেলায় ঐ সমস্ত অঞ্চলে যে সব মেলা, আসর বসতো সেখানে যেতাম এবং গান-বাজনা কথকতা প্রভৃতি দেখতাম, তাদের

সেই সমস্ত কর্ম অনুকরণের চেষ্টা করতাম। নিজেও আবৃত্তি, গান কথকতা করতাম।' 'ভিলেজ ওরিয়েন্টেড্ বয়' তিনি।

পিতৃদেবের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন সূত্রে বসিরহাট, সাতক্ষীরা, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস কালে কিশোর বিজনের তদঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়লাভ।

কৈশোর-যৌবন : ১৯৩০-১৯৪২

১৯৩০ থেকে কলকাতায়। 'আশুতোষ কলেজ, রিপন কলেজে পড়েছি। বোর্ডিংয়ে থাকতাম তখন।' ৩১-৩২ সালে পড়াশুনা, শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। মহিষবাথানে লবণ আইন ভঙ্গে অংশগ্রহণ। বি. এ. পড়ায় ছেদ। ৩৪-৩৫ সালে ছাত্র ফেডারেশন। এই সময় বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় তাদের হাব-ভাব নকল করে হাসাতেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, বিনয় ঘোষ, অরুণ মিত্র, অনিল কাঞ্জিলাল, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি। আনন্দবাজারে চাকরি লাভ ৩৮-৩৯ নাগাদ। ওখানে ছোট ছোট স্কেচ, ফিচার আলোচনা লিখতে লাগলেন। যুদ্ধের শুরুতেই সত্যেন মজুমদারের 'অরণি' প্রকাশিত হলে বিজন তাতে গল্প লিখতে শুরু করেন। 'অনামী চক্র' সাহিত্য বাসরে বহু লেখক বন্ধু লাভ। অগ্রণীতে '৪০ থেকে নানা বিষয়ে লেখা শুরু। এতে প্রথম প্রকাশিত গল্প : জানসন্ন (ফেব্রুয়ারি '৪০)। তৎকালীন আনন্দবাজার ছিল কম্যুনিস্ট চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ লেখক গোষ্ঠীর আড্ডা। '৪০ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি আসক্ত হলেন। রেবতী বর্মণের লেখাই তাঁকে পার্টির কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এই রেবতী বর্মণেরই বইয়ের রিভিউ পড়ে আনন্দবাজারের এই তরুণ বিজনকে ডেকে নেন মুজাফ্ফর আহ্মেদ। পার্টির সদস্যপদ লাভ '৪২-এ। আনন্দবাজারের চাকরী ছেড়ে হোল টাইমার হলেন পার্টির। 'রেকলেস্ লাইফ' ফলে স্বাস্থ্যবান ব্যায়ামবীর বিজন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলেন।

যৌবন : ১৯৪২-৪৮

১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কম্যুনিস্ট পার্টির সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে ফ্যাসী বিরোধী জনযুদ্ধের লাইন গ্রহণ। ওয়াই-সি-আই-র সাংস্কৃতিক অভিযান শুরু হয়েছিল '৪০ থেকে। ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ স্থাপিত হয়েছে ৪২ থেকে। এখান থেকেই গড়ে উঠলো ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। বিজন ওয়াই. সি. আই ছাড়া আর সব গুলিতেই ঘনিষ্ঠ কর্মী, শিল্পী। এই সময় 'জনযুদ্ধ' কাগজে ফ্যাসীবাদ বিরোধী বক্তব্যের নাটিকার জন্য পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছিল। সাড়া না পেয়ে ফ্যাসীবিরোধী তরুণ লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার চালানো হয় নাটক লেখার জন্য। বিজন নাটিকা লিখলেন 'আগুন'। বেরোল অরণিতে। এই আগুন ও বিনয় ঘোষের লেখা 'ল্যাবোরেটরী' অভিনীত হলো গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় নাট্য ভারতী (গ্রেস সিনেমা) মঞ্চে ১৯৪৩-এ। লিখলেন 'জবানবন্দী', বেরোল অরণিতে। এ নাটকও আই. পি. টি এ প্রযোজনা করলেন। এরপর মাত্র ৯ দিনে বিজন 'নবান্ন' লিখলেন গণনাট্য সংঘের জন্য। ২৪শে অক্টোবর '৪৪ নবান্ন-র প্রথম রজনী আর আই পি টি এর সঙ্গে সঙ্গে বিজনও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন নাট্যকাররূপে। প্রধান সমাদ্দার চরিত্রাভিনয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন বিজন।

গণনাট্য সংঘে থাকাকালীনই বহরমপুরের ঘটক বাড়ীর কন্যা মহাশ্বেতার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ৪৬-এ বিবাহ করলেন। পটল ডাক্তার যুবনাশ্ব হলেন শ্বশুর। ঋত্বিক হলেন খুড়শ্বশুর। ৪৭-এ প্রথম ও একমাত্র পুত্র লাভ: নবারুণ। ৪৬ এ দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ইমোশনাল বিজন লিখলেন জীয়নকন্যা। পার্টির কাছে প্রস্তাব রাখলেন মোহনদাস করমচাঁদের সঙ্গে নোয়াখালি যাওয়ার। রাজনৈতিক বিভ্রান্তি দেখা দিল বিজন মানসে। লিখলেন মরাচাঁদ একাঙ্ক। অবরোধ পূর্ণাঙ্গ, শ্রমিক আন্দোলন লক্ষ্যে থাকলেও ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজের মনোবিকলনই প্রাধান্য পেলো। আই. পি. টি. এর সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীগত ফারাক বাড়তে থাকল। ফলে ১৯৪৮ নাগাদ আই. পি. টি. এ ত্যাগ।

বোম্বাই যাত্রা : ১৯৪৮-৫০

দুই বছর মতন বোম্বেতে থাকলেন জীবিকার তাগিদে। ফিল্মের জগতে মন ভরল না। লিখলেন 'নাগিন' এর স্ক্রিপ্ট। চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু হলো: ছিন্নমূল ও তথাপি দিয়ে।

ক্যালকাটা থিয়েটার : ১৯৫০-৭০

পরবর্তী ২০ বছর ক্যালকাটা থিয়েটার নিয়েই কাটালেন। নবান্নের বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্যের কাছে যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, শোষিত জনগণের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার— সেই বক্তব্যকেই শিল্পীর নিজস্ব শৈল্পিক স্বাধীনতা অনুযায়ী রূপ দিয়ে চললেন 'দেবী গর্জন' পর্যন্ত।

দেবীগর্জন রচনা ও প্রযোজনার সময় থেকেই তাঁর মানসপটে গ্রেট-মাদার তত্ত্ব স্থান জুড়ে বসল। এ ক্ষেত্রে বিজন ঋত্বিক ঘটকের সমব্যাথী। এই পর্বে বিজনের জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়-ধন্য চরিত্র হলো পবন, কেতকদাস, প্রভঞ্জন। গর্ভবতী জননী প্রযোজনার পরেই তাঁর অতিপ্রিয় ক্যালকাটা থিয়েটার তাঁকে ছাড়তে হলো।

কবচ কুণ্ডল : ১৯৭০-৭৭

তাঁর মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসের সঙ্গে লোকায়ত ধর্ম, হিন্দুধর্ম ও দর্শন জড়িয়ে যায় এই পর্বে। বিভ্রান্তি আসে দেশের রাজনৈতিক জট ছাড়িয়ে জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বিজনবাবু নিজ মুখেই উচ্চারণ করেন 'আমিও বিভ্রান্ত'। যদিও থিয়েটার-শিল্পেই তাঁর সব অভিব্যক্তি। কিন্তু সেখানেও থিয়েটার-গত বিভ্রান্তি, কাজ না করতে পারার পরিবেশটাই প্রকট। এর মধ্যেও নিস্পৃহ দার্শনিকের মত বিজন রচনা করেছেন 'চলো সাগরে'। দুর্বল প্রযোজনা, কিন্তু কনটেন্টের গুরুত্ব বিজন ক্ষুণ্ণ করেননি, সমকালীন বামঘেঁষা থিয়েটারের রঙ্গব্যঙ্গের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। তাঁর আগামী প্রযোজনা: হাঁসখালির হাঁস। — অধীর সেন

সংযোজন :

* স্বীকৃতি: দেরীতে হলেও পুরস্কার পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট অ্যাকাদেমী, কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক অ্যাকাদেমী থেকে। * অভিনীত চলচ্চিত্র: ছিন্নমূল, তথাপি, বাড়ি থেকে পালিয়ে, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণ রেখা, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো, পদাতিক, স্বপ্ন নিয়ে, ভোলা ময়রা, অর্জুন, স্বাতী। * পেশাদারী মঞ্চাভিনয়. তিতাস একটি নদীর নাম। হাসি। সম্প্রতি রাজদ্রোহীতে। * চিত্রনাট্য রচনা; নাগিন (হিন্দী)। সাড়ে চুয়াত্তর। বসু পরিবার। ডাক্তারবাবু তৃষ্ণা। * সম্পাদনা ও প্রযোজনা; রবীন্দ্র সদনে ১৯৭২-এ নীলদর্পণ নাটক।

বিজন ভট্টাচার্য : জীবনের সূত্রধার | ঋত্বিক ঘটক

সবারই জানা আছে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত। সকলেই জানেন 'নবান্ন'-এর কথা। কিন্তু এটা সাধারণত জানা নেই যে 'নবান্ন' নাটকটির জন্ম হয় 'আগুন' বলে একটি একদৃশ্যের ছোট নাটিকার থেকে। তার অভাবনীয় সাড়া জাগানো দেখে বিজনবাবু লেখেন 'জবানবন্দী' বলে একাঙ্ক। সেটাও মানুষকে অভিভূত করে এবং তারই বিস্তারিত রূপ 'নবান্ন'।

শুধু রচনাশৈলীর দিক থেকে নয়, প্রয়োগ এবং অভিনয় পদ্ধতির দিক থেকেও বিজনবাবু বিপ্লব আনেন আমাদের মঞ্চে। বঙ্গভূমি রত্ন-প্রসবিনী। তাঁর থেকে মহৎ ও মহীয়ান অভিনয় শিল্পী – তাঁর আগে বহু জন্মে গেছেন এই বাংলাদেশে। তফাৎটা সেখানে নয়। তফাৎটা হচ্ছে,— অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশ ঘোষ থেকে আরম্ভ করে শিশির ভাদুড়ী পর্যন্ত সমস্ত মহারথী ছিলেন একক সূর্যের উপাসক। ব্যক্তিগত অভিনয় প্রতিভার স্ফুরণের দিকেই তাঁদের ছিল ঝোঁক এবং প্রয়োগকর্তা হিসেবে তাঁরা বিভিন্ন মঞ্চকে সম্পূর্ণ আপন বশে রেখে নাট্যকারদের দিয়ে নাটক লেখাতেন এবং নিজেদের বিকাশের সমস্ত পথ খুলে নিতেন। ফলে তখনকার নাট্যপ্রয়োগ ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তার সঙ্গে আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যাভিচারগ্রস্ত জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা পরিপুষ্ট এক বিশেষ ধরণের নটীরা সুযোগ সুবিধে পেতেন। তখনকার বিভিন্ন মঞ্চকে ঘিরে যে ক্লেদাক্ত ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হত, তার কিছু কিছু রেশ আমরাও দেখেছি।

ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা বলব না,— কিন্তু সেটা ব্যতিক্রমই। প্রধান ধারাটি ছিল ঐ কলুষিত আবহাওয়াতে পর্যবসিত। তার থেকেও বড় কথা নাটক যে সামাজিক মানুষের সংগ্রামের অংশীদার শুধু নয়, হাতিয়ারও বটে,— এ বোধ ছিল অনুপস্থিত।

এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বিজনবাবুর নেতৃত্বে গণনাট্য সঙ্ঘের আবির্ভাব। তখন প্রথমে নাটক আরম্ভ হয় ফ্যাসীবিরোধী লীগের ছত্রছায়ায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের নামে। কিছু বাদে তারই শাখা হিসেবে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের জন্ম।

বিজনবাবুই প্রথম দেখালেন কি করে জনতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হয়, কি করে সম্মিলিত অভিনয়-

ধারার প্রবর্তন করা যায় এবং কি করে বাস্তবের একটা অংশের অখণ্ডরূপ মঞ্চের উপর তুলে ধরা যায়। আমরা যারা তখন চেষ্টা করছিলাম, সে সব দিনের কথা ভুলব না। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলোড়ন বাঙলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ শিহরিত করে তুলল।

বাঙলা নাটকে এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল। তারপরে নানা উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে বাঙলা নাট্য আন্দোলন নানা দিকে পল্লবিত— প্রসারিত হয়ে উঠেছে, বেশ কিছু বাবুদের 'নবনাট্য আন্দোলন', শম্ভু মিত্র মশায়ের 'সৎ-নাট্য আন্দোলন', মোহিত চাটুজ্জে, বাদল সরকারের 'কিমিতিবাদী নাটকের আন্দোলন',— ইত্যাকার নানাপ্রকার শব্দোচ্চারণে দিগ্‌বিদিক্ উদ্ভাসিত। আমরা অপেক্ষা করে আছি, আবার কোন নতুন বাবু-বিবি, নতুন কোন নামের জন্ম দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেন।

বিজনবাবু এ সবের মধ্যে একটেরেতে পড়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর লেখনী আজও বন্ধ হয়নি। তিনি 'সঙ্কল্প'-এর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছেন, কিন্তু মূল সিদ্ধান্তে অটল থেকে। তাঁর 'নবান্ন'-এর পরেই লেখা নাটক, তার নাম 'কারাগার'।[১] আঙ্গিকের দিক থেকে সেটা সম্পূর্ণ অন্য একটা পথের সন্ধান খোঁজবার চেষ্টা করেছিল। একটা লক্-আউট হয়ে যাওয়া ফ্যাক্টরীর গেটে একটা বুড়ো দারোয়ানের চোখ থেকে সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশা বিবৃত।

বিজনবাবুই প্রথম দেখালেন কি করে জনতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হয়, কি করে সম্মিলিত অভিনয়ধারার প্রবর্তন করা যায় এবং কি করে বাস্তবের একটা অংশের অখণ্ডরূপ মঞ্চের উপর তুলে ধরা যায়।

তারপরেই তিনি একেবারে সরে চলে যান অন্যদিকে। লিখে বসলেন 'জীয়নকন্যা'। এটি সম্পূর্ণ রূপকধর্মী গীত-নৃত্যে-কথ্য নাটক। এর আঙ্গিকের বাহার ছিল একেবারে নতুন ধরণের।

তারপর তিনি বহু নাটক লিখে গেছেন এবং লিখে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটাতেই আঙ্গিকের নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা। এই স্বল্প পরিসরে দুয়েকটির নাম বলা যেতে পারে। যেমন 'কলঙ্ক'। এটি বীরভূম অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপরে যুদ্ধের সময়ে আমেরিকান ও বৃটিশ সৈন্যের দল যে কলঙ্ক রেখে যায় তারই কাহিনী, কালো সাঁওতাল মেয়ের কোলে ধবধবে সাদা ছেলে। তাকে কি ভাবে কলঙ্কের হাত থেকে

১। 'কারাগার' নয়, হবে 'অবরোধ'। ঋত্বিকবাবু ভুল করে 'অবরোধে'র স্থলে 'কারাগার' উল্লেখ করেছেন। এই দুষ্প্রাপ্য 'অবরোধ' নাটকটি এ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। —গন্ধর্ব সম্পাদক

মুক্ত করা হল, এই হচ্ছে উপজীব্য।

'মরাচাঁদ'। একটা বাউল, অন্ধ, তার যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক এবং অর্থ নৈতিক-সামাজিক সমস্যা জড়িয়ে এই নাটকটি।

'গোত্রান্তর'। এইখান থেকে তিনি প্রচণ্ডভাবে সঙ্কেতময় নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এর পট-ভূমি বিশাল। একটা মাস্টার মশায়ের চোখ থেকে একটি সম্পূর্ণ বস্তির এক বিরাট গাথা।

'দেবীগর্জন'। এখানে মাতৃশক্তির প্রকাশের এক চণ্ডরূপের প্রকাশ।

'স্বর্ণকুম্ভ'। চারযুগে মানুষের সমস্ত অভাব বঞ্চনা জমা হতে হতে এক সময়ে এসে ফেটে পড়ে সুন্দরের প্রকাশ ঘটবে, তারই এক অপরূপ সঙ্কেতময় ব্যঞ্জনা।

'কৃষ্ণপক্ষ', 'সুন্দরবন'।[২] এরপরে বিজনবাবু আরো অনেকগুলো লেখার কথা আমাকে বলেছেন এবং যেগুলো বললাম সেগুলো ছাড়াও উনি আরও অনেক লেখা লিখেছেন। তাঁর সব লেখা আমার পড়ার

বিজনবাবু এ সবের মধ্যে একটেরেতে পড়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর লেখনী আজও বন্ধ হয়নি। তিনি সঙ্কল্প-এর থেকে অনেক অনেক দূরে চলে এসেছেন, কিন্তু মূল সিদ্ধান্তে অটল থেকে।

বা মঞ্চে অভিনীত হতে দেখার সুযোগ হয়নি; কারণ আমি উত্তরোত্তর মঞ্চ-জগৎ থেকে সরে গেছি। কিন্তু এটা আমি জানি যে তিনি কখনও থেমে থাকেন নি। তাঁর একটাই মাত্র পুঁজি, সেটা হচ্ছে শুভ্র সততা। কাজেই যখন যে সমস্যা তাঁকে আলোড়িত করে তার মধ্যে তিনি গম্ভীরভাবে ডুবে যান। সবই যে উৎরোয়, একথা বলা সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু তাঁর মত এরকম মুক্ত মন নিয়ে সারাজীবন ধরে নাট্যচর্চা করতে বাঙলা দেশে আমি কাউকে দেখিনি।

এবং তিনি নাম করা নিয়ে ব্যস্ত নন। একটা কিছু নাম দিয়ে একটা ইস্কুল তৈরী করা, এটা ওঁর ধাতে আসে না।

অর্থাৎ ভদ্রলোক চালবাজী শেখেন নি।

নাট্য দর্পণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মে ১৯৭৫ নিউদিল্লী-১

২। 'সুন্দরবন' সম্ভবত 'গর্ভবতী জননী'-কেই বোঝাতে চাইছেন ঋত্বিকবাবু, কারণ ও নামে বিজনবাবুর কোন নাটক নেই। —গন্ধর্ব সম্পাদক

অভিজ্ঞতার থিয়েটার । বিজন ভট্টাচার্য

বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে একাধিক সাক্ষাৎকারের (সবকটিই অপ্রকাশিত) সামান্য কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে সংকলিত হল। দীর্ঘতম সাক্ষাৎকারটিতে প্রশ্নকর্তা ছিলেন ধরণী ঘোষ, প্রবীর বসু, সুরজিৎ ঘোষ ও আমি। বাকি উপলক্ষগুলিতে আমি একাই আলোচনা করেছিলাম। —শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৩০ থেকে আমি কলকাতায়, তার আগে গ্রামে ছিলাম। অনেক দিন ছিলাম বসিরহাট সাতক্ষীরায়। সেইজন্য পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা আমার জানা ছিল। আমার ভীষণ ভালো লাগত ঐ গ্রামের মানুষের সঙ্গে থাকতে, ওদের সঙ্গে মিশতে। আমি লক্ষ করেছিলাম ওদের রিঅ্যাকশন কী হয়, ওরা কেমন করে কথা বলে, অসুখে কেমন করে কষ্ট পায়। এই মাটিটাকে খুব চিনতাম, ভাষাটাও জানতাম।

আমাকে যা ভীষণ ভাবে কষ্ট দিত, কোন্ আর্ট ফর্মে আমি এদের উপস্থিত করতে পারব। তারাশঙ্কর বা শরৎ চাটুজ্যের মত আমার কলম ছিল না। কিন্তু আমি দেখতাম, তাঁরা তো কিছুই করছেন না। আমার জ্বালা ধরত কারণ আমি বরাবরই জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম, কখনো 'ফ্রিন্জ'-এ, কখনো ভেতরে ছিলাম।

পূর্ব বাংলায় জীবনের যে শিক্ষা পেয়েছিলাম, পশ্চিম বাংলায় এসে তা খুব সহায়ক হয়েছিল। কারণ, মানুষের তো আর কোন ফ্রনটিয়ার নেই। আমি ফিরে যেতাম ছোটবেলার সেই সমস্ত অভিজ্ঞতায়। টগর অধিকারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল পরিণত বয়সে। তার আগেও বহু আউল বাউলের সঙ্গে আমার দিনের পর দিন যোগাযোগ হয়েছে, তাদের ঐ একই 'লাইফ', একই 'ফেথ', একই রকম চলন, একই রকম বলন। আমি টগরের মধ্যে দেখেছিলাম জনতার এক শিল্পীকে।

সে আমার কাছে তার জীবনের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা খুলে বলে। আমি জানতাম, টগর 'উইল স্পীক ইট আউট', কারণ আমিই ঠিক পারতাম টগরের সঙ্গে মিশতে, তার আগে বহু টগর অধিকারীর সঙ্গে আমার ভাব ছিল। আখড়ায়, বাবাজীদের কাল্ট, বৈষ্ণব কাল্ট, মালো পাড়া, শোলার কারিগরদের ঘরে, সব কিছুর মধ্যে গিয়ে বসতাম। প্রতিমা গড়া দেখতাম, একটু কাদা মেখে দেওয়ার সুযোগ পেলে খুব ভালো লাগত, আমার মাখা কাদা দিয়ে যদি প্রতিমার নাকটা হয় তাহলে আমার যেন ধন্য মনে হত।

কলকাতায় আসবার পরেও মাঝে মাঝে গ্রামে চলে যেতাম, তখন আবার 'কনট্যাক্ট' হত, কিন্তু কনট্যাক্ট যা হয়েছে, তার বেশির ভাগই কলকাতায় আসার আগে। আমাদের দেশে সাপ ধরা এবং সাপ চালান দেওয়ার পদ্ধতিটা বেশি লক্ষ করিনি। আমাদের দেশে যেটা লক্ষ করেছি, সাপ ধরে সাপ নাচায়, ছোটবেলায় সেইটেই আকর্ষণের ব্যাপার ছিল। আমাদের দেশে সাপ প্রচুর, ওস্তাদ সাপুড়েও অনেক। যখন ক্ষেতের কাজ থাকে না, তখনই সাপুড়েরা সাপের খোঁজে বেরোয়। এই 'রিসেস্'-এর সময়েই যত গান, বাজনা, নাচ, ঝুমুর, সবই। কৃষিভিত্তিক জীবনের লাভালাভের খতিয়ান ঐ তিন মাসের যাবতীয় সাংস্কৃতিক প্রকাশে ধরা পড়ে। 'দ পীপ্‌ল্ কমিট দেমসেল্‌ভ্‌স্ ইন দীজ আর্ট ফর্ম্‌স্।' সাপুড়েরা বর্ষাকালে দল বেঁধে শহরে চলে আসত, সাপ খেলাত, সাপের বিষ বিক্রি করত। এদের কিছু লোক এই পশ্চিমবঙ্গে বারুইপুর ক্যানিং অঞ্চলে একটা বিরাট কলোনি গড়ে তুলেছিল। বীরভূম বাঁকুড়া অঞ্চলের কিছু সাপুড়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, এঁরা বংশানুক্রমিক ধারায় সাপ চেনেন, সাপ সব বলে দিতে পারেন। সাপের স্পিশিজ, জীনাস, কতরকম 'ডিভিশন', কোন সাপ কোন ঘরানার সাপ, এক পক্ষকালের মধ্যে কোন সাপ বিষের থলিতে কত বিষ জমায়, কতটা মুনশিয়ানায় কতটা বিষ তোলা যেতে পারে, তার মোটামুটি হিসেব তাঁরা জানেন। ক্যানিং অঞ্চলের যে সাপুড়েরা সুন্দরবন থেকে ময়াল ধরে আনতেন, তার চামড়া, চর্বি, বিষ বিক্রি করতেন, তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। সাপ সম্পর্কে আমাদের পুরাণকথা ঠাকুরমার কাছ থেকে শুনে, রামায়ণ মহাভারত পড়ে জেনেছিলাম। আমি সাপুড়েদের বাড়ি গিয়ে বসে থাকতাম। ভাবতাম, যে লোক এত বড় দুর্ধর্ষ সাপ নিয়ে খেলা করে, সে কত বড় মহাবলী। আমি যদি সারা দিন তাঁর কাছেই বসে থাকি, তিনি যদি আমার গায়ে হাত দেন, আমার খুব ভালো লাগবে, মানে 'হীরো ওয়রশিপ' করতাম। ভদ্রলোক হলেও ওঁরা আমাকে 'অ্যাকসেপ্ট' করতেন, 'রেজিস্টান্‌স্'-ও ছিল। আমি এমন লেগে ছিলাম, কতদিন আর বার করে রাখবেন। তারপর না গেলেই বলে, কালকে এলি না যে?

সেদিন হয়ত জেলেপাড়ায় গেছলাম। আমি তো 'মার্কারি' নই, কত আর ছুটতে পারি, কত পাড়ায় যেতে পারি। আবার ওদিকে চাষারা শুয়োর মারতে আরম্ভ করেছে। ওটাতে থাকতেই হবে, ওটা মস্ত বড় একটা 'হেরোইজ্‌ম্'-এর কাজ। বেচু মিঞা ছিল, বাবুর আলি ছিল, ট্রনীতে কাজ করত। ট্রনী মানে একটা জাল— বাঁধত এই এখান থেকে গড়িয়াহাটার মোড় পর্যন্ত। বিরাট জাল, চোদ্দ হাত পনেরো হাত উঁচু। সেখানে দুটো লাঠি দিয়ে আটকানো থাকত। এই লাঠিগুলোকে আমি চিনতাম। এই সমস্ত লোকগুলোর গায়ের গন্ধ আমি চিনতাম। এঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান। আমি এঁদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম, শিখেছিলাম শুয়োর কি করে আনতে হয়, কি করে জাগর দেয়। ওঁরা আমাকে ১৪ হাত ওপরে আম গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখতেন, সেখান থেকে সবটা দেখতাম। বন্দুকের ব্যবহার ছোটবেলা থেকে একটাই জানতাম, ওটা মানুষ মারার জন্যই ব্যবহার হয়, জীবজন্তু বা সাপখোপের জন্য ব্যবহার হয় না। সমাজের অন্যায়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার হয় না। 'ইট ওয়াজ ইউজ্‌ড্ এক্সক্লুসিভলি ফর আওয়ার ওন স্পীশিজ'। দেখতাম, মারামারি হত। সীকোস্তি-পয়োস্তির

চর নিয়ে মারামারি যখন আরম্ভ হল এ পক্ষের ছটা পড়ে গেল, ওপক্ষের আটটা পড়ে গেল। বন্দুক আবার ঘরে উঠে গেল। মেজোবাবুকে সসম্মানে ঘরে নিয়ে গেল। সেদিন আবার পুণ্যাহ হল, এ হল, তা হল। 'দ ফাংশন অফ দ গান ইন রেলেশন টু ম্যান ইজ অলওয়েজ হেটফুল।'

প্রতি দু মাইলে ডায়ালেক্ট বদলে যেতে দেখতাম। লোকায়ত পুরাণের পরিচয় পেতাম। দাঁতওয়ালা গণেশ দেখেছি, যেখানেই 'স্ট্রাগ্‌ল্ ফর এগজিসটেন্স্'টা খুব তীব্র, সেখানে দাঁতটাকেও ওরা 'টোটেম' করেছে। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যে কুকুর স্বর্গে যায়, সেই কুকুর ওরা পুজো করে বীরভূম, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণায়।

জঙ্গলে টঙ্গলে যারা বাঘকে 'কনফ্রন্ট' করে তাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস কাজ করে। ওদের নানা আওয়াজে, গানে, মন্ত্রতন্ত্রে যে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয় কোন শ্বাপদের কানে তা কী রিঅ্যাকৃশন সৃষ্টি করছে তা আমাদের জানা নেই। আমরা সেখানে পৌঁছতে পারি না, কারণ ঐ সিক্‌স্‌থ্ সেন্‌স্ যেটা ওদের আছে তার খবরাখবর ওরাই ভালো রাখে, আমরা সেটা ভুলে যেতে বসেছি। ওরা বলে দিতে পারে, আজকে ঝড় হবে কি না! এরকম লোক আমি অনেক দেখেছি, বাতাস ওঁকে বলে দিচ্ছে। এগুলো আমি ব্যবহার করেছি 'কলঙ্ক'তে, 'দেবী গর্জনে'।

পূর্ববাংলায় খরার সময় ওরা বাঁশ নিয়ে নাচে, খড়ের চালে জল ঢালে, গান গায়,

'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে
ছাইয়া দে রে তুই
আশমান হইল টুটা ফাটা
জমিন হইল ফাড়া
ম্যাঘরাজা ঘুমাইয়া আছে
পানি দিবা ক্যাডা?'

'মোরাল' বাড়াতে মন মন ঘি পুড়িয়ে যে কাজ হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ হয় এই 'রিচুয়ল'-এ। আমি যখন নাটক লিখেছি, আমি আমার মানুষের সংস্কারগুলোকে, 'রিলিজিয়স সেনসিবিলিটিজ্'-কে যতদূর সম্ভব গ্রহণ করেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো বিপজ্জনক না হয়ে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত। আমার দেশের মানুষ যতদিন ঠাকুরদেবতাগুলোকে বাঁদরের মত নাচাবে, আমারও ততদিন তাদের নাচাতে বাধবে না।

বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও তেতাল্লিশের মন্বন্তর আমাকে নাড়া দিয়েছিল। দেখতাম, বাচ্চা ছেলে টেলিগ্রাফের তার কাটতে গিয়ে গুলি খেয়ে টুপ করে পড়ে মরত। আমি নিজেও একদিন প্রচণ্ড মার খেলাম। তারপর দুর্ভিক্ষ এল। ক্ষুধিতদের ট্র্যাজেডির উৎস ও গভীরতা প্রকাশের ক্ষমতা আমার ছিল না। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, ওরাই যদি ওদের কথা বলতে শুরু করে, ওরা নিজেরাই সামনে এসে দাঁড়ায়। ওরা কেমন করে কথা বলে, কেমন করে হাসে, কেমন করে জানে, বোধ করে, আমার জানা ছিল। তাই নিয়ে যদি কিছু করি তাহলেই কিছু করা যেতে পারে। সেই চেষ্টাতেই প্রথমে 'আগুন' তারপর 'জবানবন্দী', এবং 'জবানবন্দী'র 'সাক্‌সেস্' হওয়াতেই লিখলাম 'নবান্ন'। ন' দিনে 'নবান্ন' লিখলাম। প্রগতি লেখক সংঘে পড়া হল 'নবান্ন'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'আপনি তো

জাত চাষা।' আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। আগস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানানো নিয়ে গোলমাল বাধল। এর অল্প পরেই আমি আনন্দবাজারের কাজ ছেড়ে পার্টি হোলটাইমার হই। আট থেকে দশ ঘণ্টা রোজ রিহার্সাল হত 'নবান্ন'-র, হ্যারিসন রোড পার্টি কমিউনে, পীপ্‌ল্‌স্ ক্লিনিকে, পার্টি অফিসে, ৪৬ ধর্মতলা ষ্ট্রীটেও। প্রথম সাতটি অভিনয় হয় শ্রীরঙ্গমে। শিশিরবাবু সবে 'বন্দনার বিয়ে' করতে গিয়ে মার খেয়েছেন। রোজই আমাদের নাটক দেখতেন। একদিন উইংস দিয়ে বেরোতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে গালাগালি দিয়ে উঠি। শিশিরবাবুকে চিনতে পেরে লজ্জায় পড়ে যাই। শিশিরবাবু বলেন, ঠিকই করেছেন। তারপর আমায় প্রশ্ন করেন, 'কোথায় শিক্ষা পেয়েছেন?' আমি বলি, 'আমি তো থিয়েটারের লোক নই। রাস্তায় শিখেছি।'

আমরা নানা জায়গায় 'নবান্ন' নিয়ে যাই। আমাদের নীতি ছিল, আমরা পার্টির কথা বলব না। দেশের দশের কথা বলব। আমাদের কাজ জমি তৈরী করা, তোমরা বীজ বুনো। আমরা মানুষকে তৈরী করতে চেয়েছিলাম 'হিউম্যানিস্ট' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

১৯৪৫-এ দেশভাগের আশংকায় 'জীয়নকন্যা' লিখি। 'ক্যালাস্' দেশনেতা ও 'ক্যালাস্' সরকারের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। আঠারো দিনে নাটক লিখি। বাবা অসুস্থ, অচৈতন্য, বরফ দিচ্ছি, 'প্রেসার' দেখছি আর নাটক লিখছি। ১৯৪৭-এ রঙমহলে একবারই 'জীয়নকন্যা' মঞ্চস্থ হয়। ইজরাইলের প্রথম অভিনয় বদর আলীর ভূমিকায়। শোভেনও ছিল। প্রযোজনা ভালো হয়নি, নয়তো ঐ ফর্ম নিয়ে আরো এগোতাম। ১৯৫১ সালে আমার ক্যালকাটা থিয়েটারের পত্তন হয়। আমাদের প্রথম প্রযোজনা 'কলঙ্ক'। অভিনয় করেছিলেন শোভা সেন, গীতা সোম (সেন), প্রভা দেবী এবং দুই মাতাল মার্কিন সৈন্যের ভূমিকায় ঋত্বিক ঘটক ও উৎপল দত্ত। প্রভা দেবী অভিনয় করতেন গিরির ভূমিকায়, বেদের দলের মেট্রিয়ার্ক। একটা দৃশ্যে প্রভা দেবী খাঁড়া হাতে নিয়ে দাঁড়াতেন। নীরবে শুধু চোখটা কাজ করত। মার্কিন সৈন্যগুলো ভয়ে চলে যেত।

১৯৫৬/৫৭ সালে 'গোত্রান্তর' লিখি ও প্রযোজনা করি। দেশভাগের অভিজ্ঞতা আমি তুলে ধরি এক বাস্তুচ্যুত শিক্ষকের এ পারের অভিজ্ঞতায়। মধ্যবিত্ত সমাজ তাকে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত বস্তির শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে সে মুক্তি পায়। কমিটমেণ্টের রাজনীতি, একত্র সংগ্রামের রাজনীতিই ছিল আমার রাজনীতি।

বঞ্চিত শোষিত সংখ্যালঘুদের জীবন নিয়ে ১৯৬৬ সালে 'দেবীগর্জন'। এই নাটকের শেষে প্রবল গর্জনে দেবী মর্ত্যে নেমে আসেন। জনসাধারণই তাঁকে নাবায়। আমার সাম্প্রতিকতম নাটকে, 'হাঁসখালির হাঁসে'ও এই সমাজ-পরিত্যক্ত সংখ্যালঘুদেরই কথা। কিন্তু আমার নাটক আমাকে অধিকাংশ সময়ই করতে হয় শহরে, তাতে মধ্যবিত্ত শিল্পীরা প্রোলেতারিয় শিল্পীদের নকলনবিশি করে। আমি যদি একটা সংগঠনের সমর্থন পেতাম, দেশের ভিতরে চলে যেতাম, মাটির ইতিহাস জেনে নিতাম, সংগ্রামের ইতিহাস জেনে নিতাম, তারপর তাঁদেরই দিয়ে নাটক করাতাম। কিন্তু একটু সাহায্য না পেলে তা তো পারি না। আমার নিজেরই সঙ্গে একটা সংগ্রাম আছে। আমি দায়বদ্ধ হতে চাই। পেতিবুর্জোয়া শিল্পীরা দেশের মানুষকে ভ্যাঙাচ্ছে, এ বেশীদিন চলতে পারে না। নতুন হিস্ট্রিঅনিক্স্ জন্ম নিচ্ছে। তাকে গ্রহণ করতে হবে।

নীলকণ্ঠ তুমি, তুমি অভিমন্যু | শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য চিরঞ্জীবেষু

অস্তিত্বের বড়ো কাছে, হে প্রিয়, তোমার আক্রমণ !
বঙ্গরঙ্গভূমি রক্তে ভেসে গেছে সেদিন, একদা—
তুমি তরবারি নিয়ে নেমেছিলে সন্ধ্যায় প্রভাতে।
ঐ দীপ্তি, ঐ ক্ষোভ, ঐ মারাত্মক বিবেচনা
নিয়ে, প্রিয় সশরীর নবান্নের বিষণ্ণ প্রাঙ্গণে
নেমে এসেছিলে, সেই দৃশ্য এক কিশোর দেখেছে।
তারপর থেকে দীর্ঘ পথ ছিলো পর্যটনময়
পথ ছিলো, মত ছিলো, ফুল ও পাথর ছিলো কতো।
মায়ের মমতা দিয়ে সবকিছু জড়িয়েছো বুকে
তুমি দীর্ঘতম বৃক্ষ, নাকি তুমি মাধবীর লতা—
বাংলার সন্ন্যাসে, গৃহে প্রাণময় জ্যোৎস্নায় জড়ানো ?
নীলকণ্ঠ তুমি, তুমি অভিমন্যু ব্যূহের ভিতরে
দিগ্বিজয়ী, ঢুকে গেছো, কিছুতেই বেরুতে পারছো না—
এই ভালো, কাজ নেই, জীবনে ও নাট্যে দুঃখ আছে ॥

বিজন ভট্টাচার্য : নট ও নাট্যকার | সজল রায়চৌধুরী

এ মা র্জে ন্সী জ নি ত শ্বেতসন্ত্রাসের পাগলা ঘোড়া যখন তামাম দেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, দেখা করতে গিয়েছিলাম একদিন বিজনদার সঙ্গে। অনেক বছর পরে দোতলায় ঘরখানা দেখে মনে পড়ল যোগেশ-চন্দ্র বাগলের ঘরের কথা। উচ্চবিত্তের কোন ছাপ নেই সেখানে। চলছে কি করে? যেভাবে চলছে তাকে চলা বলে না। ফোড়ন কাটলে অনেক কালের কাজের লোক হিরণ। মালা গো মালায় চলছে। কাজ দোবার নাম নেইকো, সভা ডেকে মালা পরাচ্ছে। বুঝলাম সংবর্ধনা সভার কথা তুলছে হিরণ। ততক্ষণে বিজনদা স্বভাবসিদ্ধ নকল রাগের সুরে বলছেন,·· টা কিছুতেই মালা বরদাস্ত করবে না। যত বোঝাই, ওরে, কুমড়ো ফুল সজনে ফুল যদি ভেজে খাওয়া যায়, চেষ্টা করে দ্যাখ্‌না ব্যাসম দিয়ে রজনীগন্ধা ভাজা যায় কি না কিংবা গোলাপ ফুলের পাপড়ি! তা বেটী কিছুতেই মানবে না! নাট্যকার মরে। নাট্যিক শ্লেষ মরতে পারে না! সেই নবান্নের নায়ক— ভুলে যাও। ব্যথার কথা ভুলে যাও। সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা বিজনদা, আপনি তো সি. পি. আই-এর সমধর্মী। তাঁরা আপনার নাটকের সংকলন প্রকাশ করেন না কেন? কেনই বা ছোট্ট একটা ব্যবস্থা করে দেননা যেখানে আপনি মাঝেমধ্যে নাটক করতে পারেন? প্রত্যুত্তর শুনে মনে হয়েছিল বিজনদার ভেতরের আগুন নেভেনি। তাই ভাবনা হয়, মাইকেল অর্ধেন্দুশেখর নজরুলের মতই বিজনদাও বুকের আগুন আর জীবন ধারা মেলাতে পারছেন না! তাই ভিন্ন মতাদর্শের লোক হওয়া সত্ত্বেও ভালবাসার মণিকোঠা থেকে এই ট্র্যাজিক চরিত্রটিকে কিছুতেই ছাঁটাই করা চলছে না।

২ ▭

প্রতিষ্ঠিত কাগজের সাংবাদিকের চাকরি ছেড়ে পূর্ণ যৌবনেই বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। গণনাট্য আন্দোলনের অনেক শিল্পীই সেকালে মাসমাইনের স্থিরজীবনের গ্যারান্টি ছেড়ে অবাস্তব (?) আবেগের পরিচয় দিয়েছেন। অনেকের মতই জীবন সায়াহ্নে গাড়ি বাড়ি ফোন এবং প্রগতিশীলতার খ্যাতি বিজনদার কপালেও জুটল না। সুদীর্ঘকাল নিরুপায়ে অথবা স্বল্প আয়ে বাপমা ভাইবোন এবং অবশ্যই ছেলেকে নিয়ে সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েছেন। গণনাট্য

আন্দোলনের হোল্‌টাইমারী করতে গিয়ে যে উচ্চবৃত্তিক জীবনস্বপ্ন চাকনাচুর হয়েছিল তার জন্যে কাঁদুনি গাননি। আজীবন রাজনৈতিক মতাদর্শ ত্যাগ করেন নি। পেশাদার রঙমহলে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারেন নি। গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনে যতই মর্যাদা পান না কেন ব্যবসায়িক শিল্পমহলে করে খেতে পারলেন না। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে সোবিয়েৎ শিবিরের মর্মী হবার পরিণামে বাঙলার বামপন্থী আন্দোলন থেকে থাকলেন বিচ্ছিন্ন। কর্মক্ষেত্র হল সঙ্কুচিত। ভাবাদর্শে কংগ্রেস বিরোধী না হয়েও কংগ্রেসী পরিবেশের সঙ্গে দহরম মহরম-এ নারাজ। 'তিতাস একটি নদীর নাম' আর 'হাসির' অভিনেতা একই ব্যক্তি কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তিত্বের। ব্যক্তিজীবনে একদিকে ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে কর্তব্যপরায়ণে আত্মঘাতী ও অসহনীয়, অন্যদিকে মমতাবান কর্মচঞ্চল এবং অবশ্যই সৃজনশীল।

৩ ▭

এই সৃজনশীল বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' গণনাট্য সংঘকে অসাধারণ জনপ্রিয় করেছিল। এমন কি পেশাদার নাটমহলেও পরিবর্তনের হাওয়া বয়েছিল। আধুনিক কালে বিদেশী নাটকের অনুবাদ ভাবানুবাদ বা ছায়ানুসরণের বন্যা ছুটেছে। স্বীকার্যে বা অপ্রকাশ্যে। বিজন ভট্টাচার্য কিন্তু মৌলিক বাঙলা নাটক লিখেই চলেছেন। জবানবন্দী নবান্ন মরাচাঁদ গোত্রান্তর দেবীগর্জন প্রভৃতি নাটকগুলোর শিকড় বাঙালীর মাটিতেই। মানুষগুলি জীবনদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বাঙালী। এবং অধিকাংশই গ্রামবাঙলার প্রতিনিধি। নাটকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি এসেছে যেমন দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোও অসাধারণত্বের শিখরে উঠেছে। জোতদার মহাজন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদরা অর্থাৎ গ্রামবাঙলার শোষকরা এমন জীবন্তভাবে খুব কম নাট্যকারের নাটকে রূপায়িত হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্যের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব অসংখ্য সংবেদনশীল ছোট পজিটিভ চরিত্র। এই চরিত্রগুলি সংবেদনশীল নাট্য-মুহূর্তের রূপকার। জবানবন্দীর টাউট, নবান্নর খুকীর মা কিংবা বৃদ্ধ চাষী, দেবীগর্জনের সঞ্চারিয়ার মত কত প্রথমশ্রেণীর চরিত্রেরই না জন্মদাতৃ বিজন ভট্টাচার্য। বঙ্গদেশের সত্তরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। তাঁরা কৃষিজীবী। এই কৃষিজীবী মানুষের সুখ স্বপ্ন আনন্দ আশা যন্ত্রণা শোষণ নৈরাশ্য এবং অবশ্যই বিক্ষোভ ভাষায়িত হয়েছে

বিজন ভট্টাচার্য কিন্তু মৌলিক বাঙলা নাটক লিখেই চলেছেন। জবানবন্দী নবান্ন মরাচাঁদ গোত্রান্তর দেবীগর্জন প্রভৃতি নাটক-গুলোর শিকড় বাঙলার মাটিতেই।

বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে। খ্যাতিমান নাট্যকারদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, অনেকে অবক্ষয় বা পিছিয়ে পড়া জীবনদর্শনের যূপকাষ্ঠে নিছক প্রিয়তার মোহে আত্মহননের শিকার হয়েছেন। বিজন ভট্টাচার্য সর্বদাই আশাবাদী। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে চালিত গণতান্ত্রিক আশাবাদী চৈতন্য থেকে নাট্যকার কদাচ বিচ্যুত হননি। দ্বিতীয়ত, বাঙ্গালিত্ব নাট্যবস্তুর বনিয়াদ হলেও কৃষিবিদ্রোহের বা গণনাট্যিক চিন্তাধারায় তিনি বিশিষ্ট হয়ে রয়েছেন। তৃতীয়ত, সংলাপের এমন গীতিকাব্যিক অভিব্যক্তি খুব সীমিত সংখ্যক নাট্যকারেই দৃষ্ট হয়। একটু লক্ষ্য করলেই নজরে পড়বে বিজন ভট্টাচার্যের নাটকগুলি ক্লাসিকধর্মী বৃহদায়তন পটভূমিকায় রচিত। অথচ কী অসাধারণ গীতিময়তা নাট্যকর্মের মর্মে মর্মে। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ কিংবা মোসারফ হোসেনের জমিদার দর্পণের পর বিজন ভট্টাচার্যের জবানবন্দী বা নবান্ন। কৃষিজীবন তার অর্থনৈতিক অবক্ষয় এবং নতুন জীবন গঠনের স্বপ্নই তো নাটক দুটিকে জনপ্রিয় করেছিল। গণনাটকের আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক দৃষ্টির দুর্বলতা সত্বেও নাটকদুটির প্রযোজনা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে মদৎ জুগিয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি ! এরই স্বীকৃতি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি গণনাট্য সংঘকে স্বাগত জানিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ লালঝাণ্ডা তুলে দিয়েছিলেন নবান্নের প্রতিনিধি নাট্যকারেরই হাতে। মরাচাঁদের অন্ধ চাষী বাউল পবন গাঁজা টানে না এমন নয়। প্রাণের রাধার বিশ্বাসঘাতকতায় ঘোষণা করলে গান তার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী শচীনবাবু শিল্পীর অপমৃত্যু সইবেন কেন। জীবনদ্বন্দ্ব যখন তুঙ্গে তখন খাদ্যের দাবীর সভায় যে তাকে গান গাইতেই হবে। পবন সম্বিৎ ফিরে পায়। নতুন জীবনের গান পবনের কণ্ঠে রণিত হয়ে ওঠে। গোত্রান্তরের ইস্কুলমাস্টার হরেন নতুন ইহুদীর নতুন পাঠশালার শূন্য বেঞ্চির সামনে বসে ভাবে আর কতদিন শ্মশানে মড়া আগলে বসে থাকবে। ঘটনাচক্রে ছোটভাইয়ের সঙ্গে সপরিবারে কলকাতায় এল। যে লোকটি মাস্টারি ছাড়া জানে না সে পুতুল খেলনা ফিরি করতেও দ্বিধা করল না। কেশব জেলে গেল। বাড়িওলা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। পথই যখন ঘর হল তখন বস্তিবাসীরা সপরিবার হরেনকে থাকতে দিলে। শুধু তাই নয়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদী হরেন-কন্যা গৌরীর ভালবাসা শ্রমিক সন্তান কানাইয়ের প্রতি। হরেন মাস্টার মেয়ের বিয়ে দিলেন কানাইয়ের সঙ্গেই। বিয়ের রাত্তিরেই বস্তি উচ্ছেদের প্রতিরোধে বস্তিবাসীর সংগ্রামের শরিক হরেন। রক্তচন্দনের টিপ তার কপালে। নতুন বস্তি বা বাস্তু গড়ার স্বপ্নে সে প্রাণিত। অবরোধ শ্রমিক-মালিক সংঘাতের চিত্র। কলঙ্ক নাটকের বৃহত্তর রূপ দেবীগর্জন। এ নাটকের শেষদৃশ্যে জোতদার-চাষীর সশস্ত্র সংগ্রাম। ভিন্ন স্বাদের মধ্যবৃত্তিক নাটক আজ বসন্ত। দুইযুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে চরিত্রগুলি আত্মহত্যার অন্ধগলি পরিত্যাগ করেছে। অনেকে অনুযোগ করেছেন বিজন ভট্টাচার্যের নাটকগুলি চিত্রধর্মী। বিদেশী নাটকের নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে কতটুকু নাটক হল কতটা উৎরোলো না এসব আলোচনার শেষ নেই। মোদ্দা কথা চল্লিশোত্তরে এদেশের আর্থিক রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনগুলি এবং সমস্যা সমাধানের মৌলিক বিশিষ্টতা মোটামুটিভাবে বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সুতরাং গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনে তাঁর পজিটিভ ভূমিকা অস্বীকার করবে কে !

৪

জীয়নকন্যা ও দাঙ্গাবিরোধী 'ও হোসেন ভাই দামুকদিয়ার চাচা' গানটি গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনে সবিশেষ স্মর্তব্য। যাযাবর বাদিয়াদের কাহিনীর রূপকে রচিত জীয়নকন্যা। খানিকটা সাঙ্কেতিকও বলা যায়। বাদিয়া কন্যাকে সর্পদংশন। সম্মিলিতভাবে সাপটিকে হাজির করা। বিষমুক্তি এবং ঐক্যবদ্ধ আনন্দ। দাঙ্গাবিরোধী গানটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। ইংরেজরা এদেশ জয় করে ডিভাইড্ এণ্ড রুল নীতির সাহায্যে রাজ্য শাসন করেছে। তারই ফলশ্রুতি ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। শেষ ডাক, হিন্দু মুসলমানের দুই হাত এক করতে হবে। এই সৃষ্টি দুটির অনন্যতা সুরসৃষ্টিতে। উচ্চাঙ্গ ও লোকসঙ্গী-তের সংমিশ্রণে যে রস উৎসারিত হয়েছে তা অবশ্য অবশ্যই বাঙলা গানের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। রচয়িতার জীবৎকালে সৃষ্টি দুটির সার্থক মূল্যায়ণ হবে কিনা জানি না। ভাবীকাল যে এ কারণে তাঁকে স্মরণ করবেই সে সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত যদি অবশ্যি সুরগুলি হারিয়ে না যায়।

৫

গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনে বিজন ভট্টাচার্যের অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষকরূপে গৌরবদীপ্ত ভূমিকা রয়েছে। জনজীবনের রূপায়ণ যেমন তাঁর নাট্যকর্মে ভাসিত তেমতি জনচরিত্রসৃষ্টিতে এবং জনগণের ভাষার রূপায়ণের বৈচিত্র্যে এমন দক্ষতা আর কেউ দিয়েছেন কিনা জানি না। একালের যশস্বী শিল্পীদের অভিনয়ে কেমন যেন ম্যানারিজ্‌ম এসে গেছে। পরিচালকদের বাচনিক ভঙ্গিমা নাট্যসংস্থা বিশেষের সদস্যদের মধ্যেও যেন সংক্রামিত। কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের? যারা দেখেছেন, নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, প্রধান সমাদ্দার পবনবৈরিগী হরেন মাস্টার বা প্রভঞ্জন হালদার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। অভিনয় ধারা ও চরিত্রায়ণে একের সঙ্গে অন্যের মিল খুঁজে পাওয়া ভার। অভিনয়ের এমন সূক্ষ্ম কারু-কার্য দেখে অবাক হতে হয়। মিথ্যে বলব না, দু তিন দিন মঞ্চে একাগ্রতা নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করতে করতে। বিজন ভট্টাচার্য আরও বড়, হয়তো বা একালের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় শিক্ষক ও কোরিওগ্রাফার। অনেকে আজকাল লিখছেন দেখছি, অমুকবাবু অমুক নাটকের পরিচালক। তিনি ওঁর শিক্ষাগুরু। ইত্যাকার। বোধ করি নবান্নের সব শিল্পীই স্বীকার করবেন, প্রতিটি চরিত্রের রূপ স্রষ্টা বিজনদা। তিনি প্রতিটি দৃশ্যাবতারণার রূপকার। প্রযোজক হিসেবে বিজনদার দুর্বলতাকে

বিজন ভট্টাচার্য আরও বড় হয়তো বা একালের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় শিক্ষক ও কোরিওগ্রাফার।
সুতরাং গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনে তাঁর পজিটিভ ভূমিকা অস্বীকার করবে কে?

স্বীকার করি। শক্ত মানুষ পাশে না থাকলে তাঁর বিহ্বলতা আসে। কিন্তু শিল্পীর অন্তরে সুপ্ত সম্ভাবিত প্রতিভাকে উৎসারিত করতে তাঁর জোড়া দেখিনে। তাঁর পরিচালিত শিল্পীরা ছাঁচে ঢালাই নয়। প্রত্যেকেই স্বব্যক্তিত্বে বিকশিত। বিজন ভট্টাচার্যের দৃশ্যাবতারণায় অবশ্যই পরিকল্পনা আছে। তবু তা যান্ত্রিক নয়, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবন্ত গভীরতা ব্যঞ্জক। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত যদি ছবি তোলা থাকত নবান্ন গোত্রান্তর বা দেবী গর্জনের শেষ দৃশ্যগুলির। ভুলতে পারিনে দেবী গর্জনের সেই দৃশ্যটির কথা। জোতদার প্রভঞ্জনের খোলানে ধান ঝাড়াই হচ্ছে। হিসেব হচ্ছে সাঁওতাল চাষীর ধানের। ধান বুনেছে যারা তাদের ঘরে ধান ওঠেনি। উঠেছে জোতদারের খোলানে। জোতদারের হঠকারী হিসেব মতে ধান মাপা হচ্ছে। চাষীরা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বস্তাবগলে। হঠাৎ হিসেবে গরমিল হল। নওজোয়ানরা প্রতিবাদ করল। জোতদার পোষিত লাঠিয়ালদের সঙ্গে হল মারামারি। রক্ত ঝরল। জোতদার প্রভঞ্জন জিতল। সেই জয়ের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গাত্মক অভিব্যক্তি একটি জোয়ান চাষীকে বিরাট দাঁড়িপাল্লাতে বাটকারায় পরিণত করায়। উপস্থাপনার এমন বাস্তব অথচ শিল্পিত পরিচয় কদাচিৎই দৃষ্ট হয়। অভিনয়ের যে বাস্তবতা গণনাট্য সংঘের অবদান আধুনিক নাট্যকর্মে তা আত্মস্থ করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনে বিজন ভট্টাচার্যের ভূমিকাকে স্বীকার করতেই হয় অভিনয়ের বাস্তবতায়।

৬ ▭

ট্র্যাজিডি হল, জীবনদর্শনের সুস্থির ভাবনার বিজন ভট্টাচার্যের কোথায় যেন একটি ফাঁক রয়ে গেছে। স্বভাবতই জীবনে ও কর্মে রয়েছে জটিল দ্বন্দ্ব। এবং এ দ্বন্দ্ব তাঁর নাট্যকর্মেও প্রতিফলিত। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে আধুনিক সোবিয়েৎ শিবিরের লোক হয়েও পুরোপুরি সোবিয়েৎ নীতিকে গ্রহণ করতে পারেন নি। পশ্চিম বাঙলার বামপন্থী রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন অনেকটা। অথচ সংস্কারবাদকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। পেশাদার রঙমহলে গিয়েও কট্টর পেশাদারী কায়দা রপ্ত করতে পারেন নি। তাই তাঁর অবস্থা অনেকটা না ঘাটকা না ঘরকা। গণনাট্য আন্দোলনের আদিযুগের কর্মী হয়েও তাকে স্বীকারে কোথায় যেন বাধা। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ভূমিকা সম্পর্কেও কোথায় যেন একটা সন্দেহ। এ সন্দেহ নিরসন করতে পারেন বিজন ভট্টাচার্য নিজেই। গণনাট্য আন্দোলনেরই শরিক হয়ে॥

৭ ▭

আসুন-না বিজনদা! অপসংস্কৃতির প্রতিরোধে. গণচৈতন্য সংগঠনে দ্বন্দ্বের শেকল ছিঁড়ে গণআসরে দৃঢ় দাঁড়ান! আপনার নাটক জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে উঠুক।▭

আসুন-না বিজনদা! অপসংস্কৃতির প্রতিরোধে, গণচৈতন্য সংগঠনে দ্বন্দ্বের শেকল ছিঁড়ে গণআসরে দৃঢ় দাঁড়ান!

নাটক নবান্ন | চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বিজন ভট্টাচার্য গোড়ায় সুরু করেছিলেন গল্প দিয়ে। পরে নাটকে এলেন। তখন এটা এক হিসেবে সহজ ছিল : একই সংঘের মধ্যে লেখক ও শিল্পী দু'দলই ছিলেন ; ফলে দু দিকের যোগাযোগ ছিল সহজ, অবাধ। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু কলম-টা চলতো। নাট্য-অভিজ্ঞতা ছিল মহর্ষির, শম্ভু মিত্রের। সুতরাং মণিকাঞ্চন যোগ হলো।

'আগুন' ও 'জবানবন্দী'র মধ্য দিয়ে বিজন ভট্টাচার্য এলেন 'নবান্নে'। 'নবান্ন'-ই সাধারণ লোকের কাছে গণনাট্য ব্যাপারটা স্পষ্ট করল। অন্তত, 'গণনাট্য' কথা-টা শুনলে সাধারণ লোকের প্রথম যে নাম মনে আসে, সেটা হচ্ছে 'নবান্ন'।

কিন্তু তাত্ত্বিকেরা গণনাট্য বলতে কী বোঝেন? গণনাট্য কাকে বলে? এ নিয়ে মত পার্থক্যের অবকাশ রয়েছে। তবু মোটের ওপর চিন্তা-টা এই রকম : জনগণের আশআকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং সর্বোপরি তার সংগ্রাম— এটাই গণনাট্যের উপজীব্য। মার্কসীয় দৃষ্টি থেকে জীবনকে দেখা ও দেখানো— এটাই তার করণীয়। মার্কসবাদে সম্পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে তবে লেখা সুরু করা যাবে এমন নয়। নাট্যকার তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সুরু করতে পারেন, কিন্তু মার্কসবাদে শিক্ষা ও সচেতনতা তার বোধকে উন্নত ও প্রখর করবে।

গণনাট্য কথাটা কিন্তু আগে প্রচলিত ছিল না। বেশি চলত 'জননাট্য' কথাটা। গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার পরে গণনাট্য কথাটার চল বেড়েছে।

'নবান্ন' কি গণনাট্য? কয়েক বছর আগে কম্যুনিস্টদের একাংশ এই প্রশ্ন তুলেছিল, এবং তাদের কাছে এটি বিপ্লবের অনুকূল বা সহায়ক বলে মনে হয়নি, সুতরাং তাদের মতে এটি যথার্থ গণনাট্য নয়। তাদের বক্তব্য ছিল, এই নাটকে জনগণের সংগ্রাম তেমন স্থান পায়নি, এখানে বড় হয়ে রয়েছে হতাশা। 'নবান্ন' যখন প্রথম অভিনীত হয়, তখনও এ কথা উঠেছিল। কয়েকজন কম্যুনিস্ট নেতা 'নবান্ন' বন্ধ করে দিতেও বলেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল : আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, যথেষ্ট সংগ্রামী নয়, হতাশা-সঞ্চারী ইত্যাদি। নবান্ন অবশ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়নি, তার কারণ তখনকার কম্যুনিস্ট পার্টি-সম্পাদক পি. সি. জোশী এই মতের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত ছিল, গণনাট্যের

আদর্শ যারা মেনে নিয়েছে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে ; প্রথম দিকে কাজ করতে গিয়ে তাদের ভুল ত্রুটি যদি হয়, তবে তা তারাই কাজ করতে করতে বুঝবে এবং সংশোধন করবে। ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে দিলে তাদের কর্মপ্রেরণা নষ্ট করা হবে। (এই তথ্য একাধিক সূত্রে শুনেছি : একটি সূত্র স্বয়ং পি. সি. জোশী)।

যে 'নবান্ন' পরে গর্বের বিষয় হয়েছে, তার বোধনেই বিসর্জন হয়ে যেতে পারতো। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। তাহলে দেখা হচ্ছে, 'নবান্ন' সঠিক গণনাট্য নয়, এ মত সূচনা-পর্বে ছিল এবং আজও আছে। তার স্বপক্ষে কিছু জোরালো যুক্তিও আছে। তা সত্ত্বেও এটা ঘটনা যে 'নবান্ন' অত্যন্ত জন-সমাদৃত, কম্যুনিস্টদের বৃহৎ অংশের দ্বারা স্বীকৃত এবং গণনাট্য আন্দোলনের উৎসভূমিতে সবচেয়ে বড় নাম। তাহলে এ কথাটা বুঝতে হবে যে, কিছু রাজনৈতিক দুর্বলতা যদি তার থেকেও থাকে, বড় কোন শক্তিও তার নিশ্চয়ই ছিল। কোথায় এই শক্তি ?

যাঁরা রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করেননি, নাটকের দিক থেকে বিচার করেছেন, তাঁরা নবান্নের অনেক ত্রুটি দেখতে পেয়েছেন। এ নাটক অত্যন্ত আলগা, বাঁধুনি নেই, এবং 'এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ঐ অংশগুলিতে ঘটনা বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পঙ্গু। কিন্তু শেষ দৃশ্যটি বাদ দিলে যা বাকি থাকে তাকে যদিও সম্পূর্ণ নাটক বলা চলে না।' (পরিচয় পৌষ, ১৩৫১)।

এত দুর্বলতা সত্ত্বেও নাটক দাঁড়ালো, এবং প্রায় একটা যুগ তার নামে চিহ্নিত হলো। তাহলে নাটক হিসেবেও 'নবান্নে'র কোনো গুণ নিশ্চয়ই আছে। সে গুণটা কী ?

পেশাদারী মঞ্চে যখন জীবনবিচ্যুত নাটকের একচ্ছত্র একঘেয়েমি, তখন 'নবান্ন' গিয়েছিল জনজীবনের কাছে, তাদের সুখদুঃখকে বোঝবার চেষ্টা করেছিল। পেশাদার মঞ্চের নাট্যরথীরা বলেছিলেন—এ নাটক কী করে চলবে ? এই নোংরা একদল ভিখিরি স্টেজে নামালে সে-নাটক দেখতে কে আসবে ? কিন্তু নাট্য-রথীদের কথা ব্যর্থ প্রমাণিত হলো, নাটক দেখতে লোক এলো, পরবর্তী কালের ওপর বিশেষ প্রভাব রাখলো। নাট্যরথীরা বুঝতে পারেননি যে নবান্ন তার জনজীবন-ঘনিষ্ঠতার জন্যই দর্শক মনে একটা স্থান করে নেবে।

শুধু নবান্নে নয়, বিজনদা বার বার গেছেন বাংলার লোকজীবনে, গ্রামীণ জীবনে, কৃষক জীবনে। এই খানেই তাঁর শক্তির প্রধান উৎস। এই জোরেই, রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক দুর্বলতা যদি তাঁর কিছু থেকেও থাকে, তাকে ছাপিয়ে ওঠবার মত এক ধরণের ক্ষমতা নাটকগুলি পেয়ে যায়।

এই জোরেই 'নবান্ন' একটা যুগের পথিকৃত নাটক হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। এই জনঘনিষ্ঠ নাটক লেখা মধ্যবিত্ত নাট্যকারদের পক্ষে কত কঠিন তার প্রমাণ পরে পাওয়া গেছে। 'নবান্ন' এই জাতীয় নাটক লেখার যে রাস্তাটা দেখিয়েছিল, সে-পথে পরে অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ব্যর্থতার স্বাক্ষরই বড় হয়ে আছে।

'নবান্নে'র ত্রুটির কথা বলতে গিয়ে সে আমলে অনেকে বলেছেন যে এটা ঠিক নাটক নয়। এটা ক্রনি-

…লে, ঘটনাপঞ্জী, ইতিহাস। এই ধরণেও যে নাটক লেখা সম্ভব, তা কিন্তু আজ দেশে-বিদেশে স্বীকৃত। একটা কালকে ধরে নিয়ে, পর পর ঘটনা সাজিয়ে সেই কালে জনজীবনের পদক্ষেপগুলিকে চিহ্নিত করেও নাটক লেখা হতে পারে। তাছাড়া আমাদের দেশজ ধরণের সঙ্গেও এর মিল আছে। সুতরাং পাশ্চাত্যের একটি বিশেষ মডেল অনুসারে রচিত নয় বলেই এটি অপাংক্তেয় নয়। এর পংক্তি আলাদা, একে সেই মানদণ্ডেই বিচার করতে হবে।

এছাড়া 'নবান্নে'র আরো দু' একটি দিকে আমাদের নজর পড়া উচিত। এই নাটকে সাধারণ মানুষের সরল প্রাণবন্ত মুখের ভাষার ব্যবহার আছে। পেশাদার মঞ্চে বক্তৃতাধর্মী অথবা কৃত্রিম সেন্টিমেন্টাল ভাষা শুনে শুনে আমাদের নাটক স্বাভাবিক মুখের কথা ভুলে যাচ্ছিল। 'নবান্নে' সেখানে এনেছে গ্রামীণ মানুষের মুখের সজীব ভাষা। এই ভাষা কতগুলি সময় কবিতাকে প্রায় ছুঁয়ে যায়। পরে অন্যান্য নাট্যকারও লোকভাষাকে ধরতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এখানেও ব্যর্থতার স্বাক্ষরই বেশী!

বিষয় নির্বাচনেও 'নবান্ন' অসাধারণ অনুভবশক্তির পরিচয় দিয়েছিল। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে আঘাত করেছিল। বহু হাহাকার বহু মৃত্যু দেশের অন্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। অথচ কার্যত কোনো প্রতিরোধ করা যায় নি। দুর্ভিক্ষের আগেই ইংরেজ-বিরোধী বিয়াল্লিশের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে; সেই ব্যর্থতা দেশ-চিত্তকে অসাড় ও দিশেহারা করে ফেলেছে; নতুন কোনো শক্তিও তেমনভাবে মাথা তুলতে পারেনি। কাজেই দুর্ভিক্ষ যখন এলো, তখন সমগ্র দেশ সেই হাজার হাজার করাল মৃত্যুকে, সেই বর্বর হত্যাকে চোখের ওপর দেখছিল, কিন্তু কিছু করতে পারছিল না। বিয়াল্লিশের উত্থান, পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধের বিস্তৃতি— এই পটভূমিতে ইংরেজ তার লৌহ-শাসন কঠিনতর করেছিল। তাই রাস্তায় ও দরজায় যখন মৃত্যুমুখী ক্ষুধা আর্তনাদ করে ফিরছিল, দেশব্যাপী অমানুষিক হত্যা সংগঠিত হচ্ছিল, তখন দেশ-চিত্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে ছিল, তাদের বেদনা কোনো দিকেই কোনো মুক্তিপথ পাচ্ছিল না। এই অসহায় অক্ষম বেদনা সমগ্র জাতির মধ্যে আকণ্ঠ জমে ছিল। 'নবান্নে'র ছিন্নভূমি পথবাসী মৃত্যুপথযাত্রী মানুষেরা সেই বেদনাকে একটা ভাষা দিয়েছিল।

অবশ্য অনেকগুলি ঘটনার যোগাযোগে 'নবান্ন'-নাট্যাভিনয় তার এই উত্তুঙ্গ বিন্দুতে এসেছিল, অসাধারণ প্রযোজনা, গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক উদ্যম, পেশাদারী মঞ্চের দেউলিয়া অবস্থা, জাতির দুর্ভিক্ষোত্তর মনোভাব— এ সবই 'নবান্নে'র সাফল্যের মূলে কমবেশি কাজ করেছে।

নতুন নাট্যকালের সূচনা 'নবান্ন' দিয়ে। পেশাদারী মঞ্চের বাইরে, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল, শিল্প-সমৃদ্ধ, এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নাট্যকাল চিহ্নিত হয়েছে 'নবান্ন'কে দিয়ে। এর থেকে বড় গৌরব একটা নাটকের পক্ষে আর কী হতে পারে। ▭

নাট্যরঙ্গের জনক জননী । দেবকুমার ভট্টাচার্য

আলোর বৃত্তে আমরা যারা ঘুরে বেড়াই তারা সবাই জানি এ ঘোরা কত কষ্টকর! ঘুরতে ঘুরতে কখনও থামা, কখনও হোঁচট খাওয়া আবার কখনও চলা। এ সবই যখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় তখন বুঝি সামান্য যে চলাটুকু আছে তারই আনন্দে থামবার কষ্ট বা হোঁচট খাওয়ার দুঃখবোধ জাগে না। আর তাই চলাটুকু যত সামান্যই হোক তাকেই সার মেনে আমেজে বুঁদ হয়ে থাকি। খুঁজে ফিরি নানান ধরণের পথ— ভিন্ন মত হলেও। আর সেই পথ খুঁজতে গিয়ে শিশুর দুনিয়াদারী দেখার বিস্ময়কর চোখ নিয়ে শ্রদ্ধেয় বিজন ভট্টাচার্যর কর্মকাণ্ডর দিকে তাকাই! কিছু বুঝি, বেশি বুঝি না। কিছু জানি, বেশি জানি না। আর তাই ঐ না বোঝা আর না জানাটার জন্য আক্ষেপে হাতড়ে বেড়াই নিজেকে, নিজের আশপাশ মাটি লাঙল সব কিছুকে।

আমার দেশ আমার জাতি এ জাতীয় শব্দ সমূহ জানা থাকলেও কোনও বোধ আজও তেমন করে জাগে নি। আর তাই শহুরে বুদ্ধি মন বোধ নিয়ে নাটক যা করি তা বাংলাভাষায় হতে পারে কিন্তু বাঙালীর নাটক বা বৃহত্তর অর্থে ভারতীয় নাটক হয়ে উঠতে পারে না অর্থাৎ জাতীয় কোন বিশেষ চরিত্রের খোঁজ থাকে না। দেশীয় আচার বিচার জানি না— জানি না লোককথা লোকাচার। রামায়ণ পড়তে গিয়ে রামরাজ্যটাকে ধরে নিই সারকথা বলে। অথচ বিজন ভট্টাচার্যর কর্মকাণ্ডর মাঝে দেখতে পাই দেশকে, দেশের মানুষকে, জানতে পারি কিছু কিছু নিজেরই দেশের আচার বিচার। বেদ পুরান উপনিষদ-এর পাতা ওল্টাবার প্রয়োজন দেখি না, খুঁজে ফিরি না দেশের প্রাণকে। চলি না পরিব্রাজক-এর মতো, থাকি বিদেশী ভ্রমণকারীর দৃষ্টি নিয়ে। তাই আমাদের নাটক দেশজ হয় না। মনে হয় না দেখে এ নাটক যে বাঙালী বা ভারতীয় সংস্কৃতির চেহারা আছে এতে। জীবনের গভীর বেদের লক্ষণ দূরের কথা— মানুষের কথাও কি রকম যেন অচেনা ঠেকে। মানুষকেও। ভূগোল বলতে আমরা সেই চ্যাপটা কমলালেবু বুঝি— ইতিহাস বলতে বুঝি রাজায় রাজায় যুদ্ধ, অথবা বেনিয়াদের দাসবৃত্তি। অথবা রাজনৈতিক সচেতনতার কথা বলতে বলি শুধু বিশেষ কোনও দৃষ্টিতে দেখা ঘটনা, হয়ে ওঠে প্রচার। কিন্তু কোথায় সেই ভাবনা চিন্তা যার মধ্যে আছে আরও কিছু যা আমাদের অস্তিত্বের ছটফটানি নিয়ে 'জেহাদ ঘোষণা করে বা প্রেমের জন্ম দেয়? কোথায় সেই

শিক্ষা যে চেনায় নিজেদের মাটির কথাকে? যার সঙ্গে রয়েছে বহু বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন তাকে চেনার ক্ষমতা কোথায়? কাম্‌লা চোখ নিয়ে এ জীবন দেখা যে হাস্যকর!! বিজন ভট্টাচার্যর কর্মকাণ্ডর সেই অচেনা দিকগুলোতেই আমাদের চোখ মন ফেরায়। শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে উপদেশ দেবার মধ্যে যে অখণ্ড গীতার সৃষ্টি— বিজন ভট্টাচার্যর নাট্য-সাহিত্য-কর্ম আমাদের কাছে আর এক উপদেশ। তাই উপদেশের শিক্ষা দেশকে জানতে শেখ। দেশের মানুষকে চিনকে শেখ। যে ধর্মকে বা কর্মকে দিয়ে মনকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখবার প্রয়াস চলেছে তাই নিয়ে নবতর ব্যাখ্যা করে সাধারণ কথায়, দেশজ আচার বিচারের মাধ্যমে ধর্মের আর এক মানে তৈরী করে মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তুলে মানুষকেই মানুষের ঈশ্বর বলে চিহ্নিত করতে পারেন তিনিই। তাঁর চেনা বেশিরভাগ মানুষ কৃষক সম্প্রদায়ের। কৃষক সর্বহারা নয় অথচ সর্ব হারা। তাদের শিক্ষাদীক্ষা নেই আছে কষ্ট আর অত্যাচার। স্বাচ্ছন্দ্যর ভাষা জানে না— চেনে জোতদার সরকার পোতদারের ভাষা। তবু তারই মাঝে সর্ব হারানোর জন্যই লালচোখে তাকায়। দড়ি ছিঁড়ে বেরুতে চায় মালিকের ঘুম ভাঙ্গাবে বলে। বিশেষ কোন রাজনৈতিক ভাষা তাদের নেই, তাদের আছে নিজেদের মত করে প্রতিবাদের ঝোঁক। আর বিজন ভট্টাচার্য তাদেরকে নিয়েই মরা গাঙে 'ভাসান' ভাসিয়েছেন। তাঁর কথা অন্য কারুর মতো নয়, অন্য কোন বিশেষ নীতি ভেবে নয়, কোন প্রচার পত্রিকা ঘেঁটে নয়। তিনি তাদের এঁকেছেন তাদের কথা তাদের মতো করে বলে দু চোখ মেলে দু কান খুলে। তাই তাদের মুখের ভাষা শুধু ভাষা নয়— সে ভাষা মনেরও। ফলে তাঁর নাটক যে কোন ভাষাতেই অনূদিত হোক না কেন তা বাংলার বা ভারতীয় চরিত্রের নাটকই থেকে যায়। কোথাও কোথাও ভাষার দুর্বোধ্যতা থাকে যদিও— তবুও।

পণ্ডিতেরা আমাকে বলতে পারেন সংকীর্ণ মনের মানুষ বলে। বলতে পারেন আন্তর্জাতিকতা ছেড়ে সামান্য গণ্ডি ধরে টান দিচ্ছে কুয়োর ব্যাঙ-এর মতো। হতে পারে তা সত্য। কিন্তু তার চেয়েও সত্য —আগে জাতীয় তারপরে আন্তর্জাতিক। আমরা দেশজ রূপকথা উপকাহিনীর নতুন ব্যাখ্যা না করে জর্মন বা ফরাসী রূপকথা ভিত্তিক নাটক করি। উত্তপ্ত হই নিজেদের পিঠ নিজে বা নিজগোষ্ঠীর দ্বারা চাপড়িয়ে আরও উত্তপ্ত হবার স্বপ্ন দেখি। কিন্তু নিজের ঘর না সাজিয়ে অন্যর ঘর সাজানোর পেছনে মনের কোনও একটা ব্যাপার বোধ হয় ফাঁক থেকে যায়। বিজন ভট্টাচার্যর চোখে সে ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। তিনি দেশজ। তিনি জাতীয়। তাই তাঁকে বাংলা নাট্যর জনক জননী বলতে সাধ যায়। যিনি মাটির কাছাকাছি নেই— মাটির যার মা। গ্রেট মাদার।

ক্যালকাটা থিয়েটারের অভিনয়-শিক্ষক বিজনদা | বিভূতি মুখোপাধ্যায়

'১৯.১ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা থিয়েটারের সূচনা 'মরাচাঁদ (একাঙ্ক) ও কলঙ্ক'—এই দুটি নাটক নিয়ে তাঁরা দর্শকদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সংগঠনের বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সেদিন ছিলেন বাংলার অবিস্মরণীয় অভিনেত্রী প্রভাদেবী, আর শোভা সেন, গীতা সোম (সেন)। আলোক সম্পাতে ছিলেন তাপস সেন। তারপরে এই সংস্থা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি গীতি নৃত্য নাট্য "জীয়ন কন্যা" অভিনয় করেন রঙমহল থিয়েটারে। নানা বাধা নানা অসুবিধা অতিক্রম করে "গোত্রান্তর (১৫ আগস্ট, ১৯৫৯), মরাচাঁদ (৩১ মার্চ '৬১), ছায়াপথ (১১ অক্টো '৬১), অভিনয় করেছেন। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে এঁদের অভিনীত নাটক 'মাষ্টার মশাই।

[সূত্র : স্বাধীনতা পত্রিকা

ক্যালকাটা থিয়েটার এরপর বিজনবাবুর আজ বসন্ত প্রথম প্রযোজনা করেন অ্যাকাদেমীতে। প্রথম মঞ্চস্থ হবার সঠিক তারিখ মেলেনি। তারপর প্রযোজনা করেন বিজনবাবুর সর্বোৎকৃষ্ট নাটক 'দেবী-গর্জন' ২১শে ফেব্রুয়ারী '৬৬ তে। 'গর্ভবতী জননী' প্রযোজনা করেন মে '৬৯। সেই ক্যালকাটা থিয়েটার থেকে বিজনবাবু বেরিয়ে এসেছেন ১৯৭০-এ। ক্যালকাটা থিয়েটারের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন বিভূতি মুখোপাধ্যায়।

—গন্ধর্ব সম্পাদক

ক্যালকাটা থিয়েটারে বিজনদার সঙ্গে অভিনয় করতে এসে প্রথম দিন খুব একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। যখন প্রথম আসি তখন 'গোত্রান্তর' নাটক অভিনয়ের প্রস্তুতি চলছিল। আমাকে দেখে শুনে একটা ছোট্ট দারোয়ানের চরিত্র দিলেন। মনে লাগলো। আমি দিলদার কবা লোক! সেই আমাকে কিনা একটা দারোয়ান। মোহভঙ্গ হলো প্রথম রিহার্সালের দিনই। যে ভাবেই বলি উনি বলছেন হচ্ছে না। না হচ্ছে দাঁড়ানো, না হচ্ছে বলার কায়দা। কিন্তু কি করে যে হবে সেটাও বলছেন না। উল্টে ধমকাচ্ছেন। গোটা কয়েক সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণের পর যা বললেন তার মোদ্দা মানেটা হলো যে আমার দ্বারা কিছু হবে না। বললেন, আগে নিজেকে ভাঙো, নৈলে অভিনয় হয় না। কিন্তু নিজের থেকে কিছু বললেন না। শুধু যতবারই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলি, তত-

বারই বলেন— উঁহু হলো না। জিজ্ঞাসা করি কেমন করে হবে বলুন? উত্তর— সে আমি কি জানি। চরিত্র তোমার, তুমি অভিনয় করছো। তুমি জানো। রাগ হতো। ভাবতাম উনি শেখাতে চাইছেন না। তখন বুঝি নি বিজনদার অভিনয় শেখানোর পদ্ধতিটাই নতুন রকমের। উনি কখনো কোন সংলাপ নিয়ে এই ভাবে বলো, এই ভাবে দাঁড়াও, এসব কথা বলেন না। যাকে শেখাচ্ছেন, তার নিজের ওপরেই গোড়া থেকেই অনেক খানি দায়িত্ব ছেড়ে দেন। যেমন যে চরিত্র অভিনয় করতে হবে, সেই চরিত্রের বিশ্লেষণ, তার হাব-ভাব, কথা বলার ঢঙ, ইত্যাদি সব সেই অভিনেতাকেই ভেবে ভেবে বার করে নিতে হবে। সেই সব ভাব ভাবনা শুনবেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর শুরু হবে দ্বিতীয় প্রেশক্রপশন যদি চরিত্র বিশ্লেষণ ভঙ্গী পছন্দ হয়, অবশ্য বিজনদার পছন্দ হয়েছে কি হয়নি, কিছুতেই বোঝা যায় না। ওঁর প্রশংসা বা নিন্দা দুটোই কিন্তু অভিনয় শেখানোর অঙ্গ। যারা নতুন তারা এই পদ্ধতির প্যাঁচে পড়ে অনেকেই নাজেহাল হয়। যেমন উনি একজন ক্যাডারের দারুণ প্রশংসা শুরু করে দিলেন। এমন উচ্ছ্বাস, তার সামনেই, যে যারা পুরোনো তারা মনে মনে একটু ক্ষুব্ধও হতো। দলে সবাই মিলে মিশে আমরা যতই অভিনয় করি না, ভালখারাপ অভিনয় নিয়ে অভিনেতার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষাবোধ সব সময়েই থাকে। আমার চেয়ে ও ভালো অভিনয় করছে, বিজনদার প্রশংসা পাচ্ছে, তাতে দলের যতই মঙ্গল চিন্তা তত্ত্বগতভাবে ভাবা যাক না কেন, মনের গোপনে একটা সূক্ষ্ম বেদনা বোধ থেকেই যায়। এই সূক্ষ্ম অভিমানের তন্ত্রীতেই বিজনদা আঘাত দেন নির্মমভাবে। উদ্দেশ্য, যে অভিনয় করছে, তার আধার যদি ভালো হয়, তাহলে তার মধ্যে একটা অদম্য উৎসাহ জাগবে নিজেকে গড়ে তোলবার। প্রেরণাটা আসবে নিজের মনের গভীর থেকে। যার ফলে একটা স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে। আর যদি আধার মন্দ হয়, তাহলে এই প্রশংসাই হবে তার কাল। বিজনদার এত প্রশংসা পাচ্ছি, অতএব আমি দারুণ অভিনেতা, ব্যস হয়ে গেল, ফুলে ফেঁপে, তার মধ্যে যেটুকু সম্ভাবনা ছিল তাও নিঃশেষ। বিজনদার এই টেস্ট বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বলাবাহুল্য ভীষণ কষ্টসাধ্য। যারা পারলো, উৎরে গেলো। আর যারা পারলো না, তারা হয় থাকলো দলে, অথবা চলে গেলো। ব্যক্তিগত জীবনে তাদের সঙ্গে বিজনদার যতই ভাব ভালোবাসা থাকুক, অভিনয়-শিক্ষক বিজন ভট্টাচার্যের তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা নেই। সেক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হলো অভিনয়টা সাময়িক চুলকুনি নয়, এটা মিশন। মিলিটারী ডিসিপ্লিন রক্ষার উপযুক্ত করেই অভিনেতাকে গড়ে উঠতে হবে। নিন্দায় ম্রিয়মাণ বা প্রশংসায় পাফ্‌ড্‌ আপ হয়, তাহলে তার দ্বারা অভিনয় হবে না। নরম মাটিতেই মূর্তি গড়া যায়। পোড়খাওয়া পোড়ামাটি তাঁর কাছে অর্থহীন।

চরিত্রটি বোঝার পর সুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। বিজনদার কাছে যারা অভিনয় শিখতে আসে, তাদের একটা কথা তিনি বারবার বলেন, আমি যা দেখেছি, যার সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাই লিখেছি। যা দেখিনি তা লিখিনি। অর্থাৎ আমার নাটকের চরিত্রগুলি ছড়িয়ে আছে আমাদের চোখের সামনে। সেই মডেলগুলি আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, স্টাডি করতে হবে। ছায়াপথ অভিনয় করবার সময় এই রকম মডেল স্টাডি করতে আমরা দিনের পর দিন ভিখিরীদের আস্তানায় গিয়ে বসে থেকেছি। তাদের নৈমিত্তিক জীবনের খুঁটি-

নাটি লক্ষ্য করেছি রিহার্সালে এসে তা অভিনয় করে দেখিয়েছি বিজনদাকে। যতক্ষণ না তাঁর মনঃপুত হয়েছে। শুধু কি মানুষ, জীবজন্তুও পর্যবেক্ষণ থেকে বাদ যেতো না। বিজনদার কঠিন নির্দেশ শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই নয়, পশুদের মধ্যেও স্নেহ মায়া মমতার এক অপূর্ব প্রকাশ আছে। একটা গরু যখন আদর করে বাছুরের গা চেটে দেয়, ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে, সেই গরুটির হাবে ভাবে, কি অপূর্ব মাতৃস্নেহের প্রকাশ ঘটছে। ডাস্টবিনে খাবার নিয়ে যখন এক দঙ্গল কুকুর পরস্পর মারপিট করে, কিম্বা বিড়াল যখন স্থির লক্ষ্যে পায়ে পায়ে চুপিসাড়ে শিকারের দিকে এগিয়ে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর : তারপর থাবা দিয়ে তাকে মেরে নুলো দিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে মজা করে, তার মধ্যে খুঁজে পাবে জীবনের মশলা। ভিলেন করতে গেলে গতানুগতিক প্রথায় চাৎকার করবেই বা কেন? আর চোখমুখ ঘোরাবেই বা কেন। ওই বেড়ালটাকে দেখ না। কত স্বাভাবিক, অথচ কী ভীষণ। মনের ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ ফোটাতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই তাকে আনতে হয়। কায়দা করতে গেলেই তার সুর কেটে যাবে। অস্বাভাবিকত্বের ছোঁয়া লাগবে অভিনয়ে। চরিত্রায়ণ হবে প্রাণহীন··· বাড়াবাড়ি। দেবী গর্জনে প্রভঞ্জন সর্দারের ভূমিকায় রত্নার ওপর পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্যে এই রকম এক শিকারী বেড়ালের ভাবভঙ্গী নিয়ে বিজনদা যে অসাধারণ মুহূর্তগুলো ফুটিয়ে তোলেন, তা অকল্পনীয়। বিজনদার বড় আদরের একটা কুকুর ছিল 'জিপসী'। বড় খেতে ভালবাসতো। যখন খাবার দেওয়া হতো তখন সেই খাবারের সামনে থাবা দিয়ে বসে সে কি ল্যাজ নাড়ার ধূম। চোখের সে কী চাউনি। তারপর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ম্যাক ম্যাক করে খাওয়া। খাওয়ার মধ্যে নিজেই নিজের সঙ্গে ঝগড়া করতো জিপসী। আপনমনেই গরগর করতো। মাংসের হাড় দাঁতে চেপে, মাথা ঝাঁকাত। আবার সেটা মুখ থেকে ফেলে, যেন হাড়টা পালিয়ে যাচ্ছে, এমন ভেবে নিয়ে একটু পেছিয়ে গিয়ে সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নুলো দিয়ে টেনে, ছোট সাদা বুকের মাঝখানে এনে চেপে বসে থাকতো। ছায়াপথ নাটকে এক দুর্ভিক্ষ-তাড়িত অন্ধ ভিখিরীর ভূমিকায় আমি যখন অভিনয় করি, তখন তার রাস্তার ফুটপাথে বসে ভিক্ষে করা মণ্ডামিঠাই খাওয়ার দৃশ্যটা কিছুতেই আয়ত্বে আনতে পারছিলাম না। সেই বেদনাতুর আকাঙ্ক্ষা, লোভ, কেমন করে ফোটাবো। ভেবে ভেবে যখন সারা হচ্ছি, তখন বিজনদা পথের সন্ধান দিলেন। গুরু-মন্তর। বলেছিলেন খাওয়ার সময় জিপসীকে লক্ষ্য করো। হদিশ পেয়েছিলাম। এই ভাবে নানা ধরণের কথাবার্তা, দেখা শোনার মধ্য দিয়ে চরিত্রায়ণের পথ দেখিয়ে দেন বিজনদা।

নাট্য-প্রয়োগপরিকল্পনার ক্ষেত্রেও বারে বারে এই নিয়ম ভাঙার প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। সাধারণতঃ কোন নাটক প্রয়োগ করবার সময় সেট, লাইট, মিউজিক, মেকআপ, কষ্টিউম, কি হবে, সেগুলির একটি বিস্তারিত বিবরণ লিখে এবং এঁকে পরিচালক অভিনেতা এবং অন্যান্য কুশলী শিল্পীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বিজনদাও এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম নন। সমস্ত নাটকের ক্ষেত্রেই তিনি সেট, লাইট, মেকআপ ও কষ্টিউম যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে থাকেন। এবং বহু আলোচনার পর, নিজে যখন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসেন তখন সেগুলির আলাদা আলাদা চার্ট তৈরী করে কাজে নেমে পড়েন। সেট ডিজাইন থেকে শুরু করে, সেটিকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার

সম্পূর্ণ কাজটির শেষ পর্যায় পর্যন্ত সকলের সঙ্গে তিনি নিজে হাতে করতে অভ্যস্থ। কিন্তু এগুলিই বড় কথা নয়। পদ্ধতির মধ্য থেকেও পদ্ধতিটাকে ভেঙে এগিয়ে যাবার একটা প্রবণতা বিজনদার মধ্যে বর্তমান। তাই অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে কোন পরিবেশই তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন না। বরং নতুন নতুন উপায়ে তাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলেন। বহুক্ষেত্রেই দেখেছি পরীক্ষা গুলোয় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া গেছে।

'গোত্রান্তর' অভিনয় করতে গেছি সিঁথিতে। বিরাট প্যাণ্ডেল। স্টেজও বিরাট। আমাদের সেট সেই বিরাট স্টেজে খাটানো যাচ্ছে না। উইংস করা ছিল না বলে। তাকে টেনে এনে স্টেজের ওপেনিং ছোট করে আনার প্রশ্নই ওঠে না। তার ওপর আবার ওপরে ফ্লাই না থাকায়, সেটের মাথাও কাটা যাচ্ছে না। আমরা তো সেট খাটাতে গলদঘর্ম। বিজনদা এসে, সমস্ত ব্যাপারটা দেখে, স্টেজের চারপাশটা একবার ঘুরে এলেন। তারপর হুকুম দিলেন সেটের দরকার নেই। এবং সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন, মঞ্চের পিছনে যে নীল কাপড়টা কভার করা রয়েছে, সেটাও খুলে দিতে। আমরা সকলে সমস্বরে একটা 'সে কী' বলে থেমে গিয়েছিলাম। নির্দেশ মতো কাজ হলো। মঞ্চের পেছনে নীল কাপড়টা খুলতে পেছনের রাস্তা, পার্ক, তার ওপারে হাসপাতাল, আর আমাদের স্টেজ একাকার। স্টেজের পেছনে গোটাকয়েক আলোর ব্যবস্থা করে, অভিনয় শুরু করে দিলেন বিজনদা। আশ্চর্যের বিষয় দর্শকের চোখে সেদিন ওই রাস্তা পার্ক, হাসপাতাল সব মঞ্চের দৃশ্য সজ্জার সাঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা বুঝতেও পারেন নি, যে ওটা সেট নয়। বরং অনেকেই পরে প্রশ্ন করেছিলেন, ওই রকম এলাহী সেট আমরা করেছিলাম কি ভাবে।

আর একবার মজঃফরপুরে 'দেবীগর্জন' অভিনয় হচ্ছে। অকস্মাৎ লোডশেডিং। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আলো আসার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব অভিনয় বন্ধ। কিন্তু বিজনদা দেখি একটা হ্যারিকেন নিয়ে-মেকআপ করছেন নির্বিকার ভাবে। ঘটনাটা যদিও তাঁরও জানা, তবু একবার বললাম, আলো যে নেই। গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। —ব্যবস্থা দেখে চক্ষু চড়কগাছ। দুটো হ্যাজাক এনে মঞ্চের সামনে ঝোলানো হয়েছে। আর কয়েকটা হ্যারিকেন। বিজনদা বললেন প্রত্যেকে একটা করে হ্যারিকেন নিয়ে স্টেজে যাও। অভিনয়ের সময়, আলোটা তুলে মুখের কাছে এনো। সেই ভাবেই অভিনয় করা গেল। খারাপ হয়নি। বরং নতুন ধরণ দেখে সবাই চমৎকৃত হয়েছিলেন।

কিন্তু এত বাহ্য। বিজনদার আসল রূপটা রয়েছে ধেয়ানে মননে নিত্য নূতন নাট্যভাবনার মধ্যে। যে ভাবনা বিষয়বস্তু, প্রয়োগরীতির কোন নিয়ম-মাফিক ছক বেঁধে চলে না। প্রতিপদক্ষেপে তিনি পুরাতন কনটেন্ট আর ফরম্‌গুলি ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলেছেন।

নাটক, আর অভিনয় ছাড়া ঘর সংসার সব কিছুই যেন তাঁর কাছে বাহ্য। যারাই নাটক করে এবং সিরিয়াসলি নাটক করতে তাঁর কাছে এগিয়ে আসে, তারা সবাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সংসারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুখে দুঃখে তিনি সব সময়ে তাদের সাথী। মানে অভিমানে ঝগড়া বিবাদে তিনি কখনো আমাদের পাশাপাশি, আবার কখনো অনেক অনেক দূরে। সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ধ্যানস্থ সেই মানুষটাকে তখন মনে হয়, আমরা চিনি না। হয়তো চেনাও যাবে না কোন দিন।

কবচ কুণ্ডলের-এর বিজন ভট্টাচার্য । অ

বিজনবাবু গণনাট্য সংঘ ছাড়বার পর গড়েছিলেন ক্যালকাটা থিয়েটার। ১৯৫১য় গড়া ক্যালকাটা থিয়েটার ছাড়লেন ১৯৭০-এ। গড়লেন কবচ-কুণ্ডল। ১৯৭৫-এ ১২ জানুয়ারিতে নামালেন তাঁর নতুন নাটক কৃষ্ণপক্ষ কবচ। কুণ্ডলের দ্বিতীয় প্রযোজনা 'আজ বসন্ত'। ২২ মার্চ '৭৫ রবীন্দ্র সদন আয়োজিত নাট্যোৎসবে পরিবেশিত। এর পরের প্রযোজনা : 'চলো সাগরে'। ৩০ শে মার্চ, ১৯৭৭। সেই কবচকুণ্ডল-এর পক্ষ থেকে অশোককুমার চক্রবর্তী, তাঁদের প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। — গন্ধর্ব সম্পাদক

সুযোগ মিলল অনেক দিন পর। খবর পেলাম বিজনবাবু তাঁর নতুন নাটক 'কৃষ্ণপক্ষ' করছেন কবচ-কুণ্ডলের পক্ষে। রিহার্সাল হয় সদানন্দ রোডের দেশবন্ধু কলেজে। (বর্তমান তপন থিয়েটারের ঠিক উল্টো দিকে)। আর অপেক্ষা করা নয় ; আজই বিজনবাবুর কাছে যেতে হবে। সদানন্দ রোডের রিহার্সাল-রুমে ভয়ে ভয়ে গিয়ে হাজির হলাম দুজনে, আমি আর অসিত। ভয় হচ্ছে যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন। হঠাৎ প্রশ্ন ভেসে এল, নাম কি। তিনচারবার ঢোক গিলে উত্তর দিলাম। তারপর এগিয়ে দিলেন বড় একটা খাতা। বললেন পড়ো। খাতা খুলে দেখি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' নাটকের বড় একটা সংলাপ। কোন রকমে পড়ে গেলাম। খানিক পরে বললেন, কাল থেকে এসো। মনে খটকা লাগল ; যতদূর জানতাম বিজনবাবু নিজের লেখা নাটকই সাধারণতঃ করে থাকেন। অথচ স্ক্রিপ্টে এ দেখলাম 'নরনারায়ণ'-এর একটা অংশ। পরে জানতে পারলাম বঙ্গ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে ১৮৭২ থেকে মোটামুটি আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের ধারাকে অনুসরণ করে একটা নতুন ধরণের নাটক তৈরীর পরিকল্পনা করছেন। ঐটি তারই একটা অংশমাত্র। নাটকের নাম সম্ভবতঃ 'প্রস্তাবনা'। নানান বিপর্যয়ের জন্য সে নাটক আজও কবচ-কুণ্ডল মঞ্চস্থ করতে পারেনি। নাটকটি অর্ধেকের উপর লেখা হয়ে পড়ে আছে। যাই হোক এরপর শুরু হল প্রায় ১৫০ জন চরিত্র নিয়ে 'কৃষ্ণপক্ষ' নাটক। এর আগে নাট্যকার এবং অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যকে দেখেছি দূর থেকে। কিন্তু সেদিন দেখলাম অন্য এক বিজন ভট্টাচার্যকে—প্রযোজক ও নাট্যশিক্ষক হিসেবে, কাছ থেকে।

সাতটায় রিহার্সাল শুরু হতো আর আমরা সব কাজ ছেড়ে কি এক অদ্ভুত আকর্ষণে বিকেল ৩ টা থেকে ওঁর বাড়ির কাছে গাঁজা পার্কে এসে চুপচাপ বসে থাকতাম। ঠিক সাড়ে ছ'টায় উনি একটি ছেলের হাত ধরে পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছেন। আমরাও দূরত্ব বজায় রেখে পেছন পেছন হেঁটে যেতাম। একদিন একটা ঘটনা ঘটলো। আগে থেকে জানানো হয়েছিল, সেদিন কোন রিহার্সাল হবে না; কিন্তু আমরা দু-বন্ধুতে বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে কখন সে রাজেন্দ্র রোডের কাছে চলে এসেছি, ঠিক নেই। প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে; এখন কি করি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে দরজার কড়া নাড়লাম। এক বৃদ্ধা বিধবা মহিলা (হিরণদি) বেরিয়ে এসে বললেন—'বাবু তোমাদের ছাদে গিয়ে বসতে বলেছেন—অবাক হলাম! উনি কি করে জানলেন যে আমরা আসবো! যাই হোক অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গুটি গুটি ছাদে উঠলাম, দেখি আকাশের দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসে আছেন। তন্ময় হয়ে কি যেন দেখছেন। বললেন:

"আমি জানতাম তোমরা আজ আসবে—বসো। সারাদিন ধরে শুধু তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। তোমাদের আমার খুব দরকার। আর আমাকেও তোমাদের দরকার। তোমাদের অনেক দায়, অনেক দায়িত্ব। তোমরা যে আর্টিস্ট—এই দুর্গত দেশের জন্যে চাই সত্যিকারের কালচারিস্ট-আর্টিস্ট শিল্পীকে একা একাই বাঁচতে হয়, একা একাই কাঁদতে হয়— সে একা। তার জন্যে কেউ নয়, অথচ সবার জন্যে সে। সবার দুঃখে ঘরে বসে একলা কাঁদবে। আবার এ দুঃখ দূর করার জন্যে সংগ্রাম তোমাকেই করতে হবে, কেননা দায় তো তোমার। একই ব্যক্তিমানসের মধ্যে দুটো সত্তা কাজ করে। জনগণের সাথে মিশবে, তার দুঃখে আনন্দে একাত্ম হয়ে যাবে। আবার সব কিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে নিরপেক্ষভাবে সবকিছু নিরীক্ষণ করবে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব কিছু বোঝবার চেষ্টা করবে। অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা হয়তো তোমাকে সহ্য করতে হবে, কিন্তু ভেঙ্গে পড়লে চলবে না—তুমি ভেঙ্গে পড়লে দুর্গত যারা তাদের বাঁচাবে কে? অনেক ঝড় আমার ওপর দিয়ে গেছে, কোনদিন খাবার জুটেছে, কোনদিন জোটেনি। যাতে আমি কোন কাজ করতে না পারি তার ব্যবস্থা হয়েছে; ক্ষতি হয়েছে কাজ কিন্তু থেমে থাকেনি। জানো, আমি এই ছোট্ট ছাদে বসে বসেই সব দেখতে পাই। গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাকে টেনে এনে উল্টেপাল্টে প্রত্যক্ষ করি। এইখানেই বসে বসে নাটকের সব চরিত্রদের সাথে কথা বলি। আমার অভিজ্ঞতার সব চরিত্ররা এখানে এসে ভিড় করে।"

হঠাৎ হিরণদি চেঁচিয়ে উঠলো, তোমাদের হলো কি? রাত দশটা বেজে গেছে বাড়ি যাবে না। চমক ভাঙ্গল। উনি বললেন, সময় পেলেই চলে এসো আর আমার কাছে কাছে থেকো। সেই থেকে শুরু হলো আমাদের কাছে থাকা।

প্রত্যেকদিন রিহার্সালের পর হাজরা মোড়ে সুকুমার বাবুর চায়ের দোকানে আমাদের আড্ডা বসতো। ঠিক আড্ডা না বলে অবশ্য ক্লাস বলাই ভাল। তিন চার ঘণ্টা রিহার্সালে ঘরে চলতো প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস আর তারপরে এ আলোচনা। রিহার্সাল যে ওঁকে খাটতে হতো অসম্ভব। 'কৃষ্ণপক্ষ' নাটকের রিহার্সালের বিবরণ আমি দিচ্ছি না, কেননা শুধু এর উপরই একটা ছোট-খাট বই লেখা হয়ে যাবে। কানাঘুঁষোয় অনেকে একটা অপপ্রচার করে থাকেন যে বিজনবাবু শেষ হয়ে গেছেন। ওঁর আর কিছু করবার নেই, দেবার নেই। আমার

অনুরোধ তাঁরা যেন একবার আমাদের 'কবচ-কুণ্ডলে'র রিহার্সালে এসে দেখে যান, বিজনবাবু কত সক্রিয়। তিনি আজও স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল। 'কৃষ্ণপক্ষ' নাটকে এক গাড়োয়ান সন্ন্যাসীর ছোট্ট ভূমিকায় বিজনদা এক অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। আমার মনে হয়, তোরাপ, প্রধান সমাদ্দার, পবন, কেতকদাস ও প্রভঞ্জনের পর বাংলা থিয়েটারের অভিনয়ের দিক থেকে এ এক বিরল সংযোজন। অভিনয়ের শেষে আমার পরিচিত এক দর্শক 'গ্রীন-রুম'এ এসে অভিযোগ করলেন—'কি ব্যাপার, বিজনবাবুর নাম রয়েছে চরিত্রলিপিতে অথচ উনি অভিনয় করলেন না? তাকে অনেক কষ্টে বোঝানো গেল যে বিজনবাবু অভিনয় করেছেন। ঐ সন্ন্যাসীর ছোট্ট ভূমিকায়।

যে আলোচনা বসতো তাতে আমরা শ্রোতা আর বিজনদা বক্তা। একবার বলতে শুরু করলে একনাগাড়ে বলে চলেন :

তোমাদের অনেক কিছু বুঝতে হবে। কী—কেন'র প্রশ্নটা তোমার। অনেক পড়াশোনা কর, অনেক বেশী দেখ। পড়াশুনো অর্থে শুধু বই পড়া নয়, মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করো। ঐ মুখে অলিখিত সব বই লেখা রয়েছে—ধরবার চেষ্টা করো। আজকের শিল্পী, আগামী দিনের মুক্তিযোদ্ধা—সেইভাবে নিজেকে তৈরী কর। চাষীর আছে লাঙ্গল, মেশিন আর নাট্যকর্মীর হাতিয়ার নাটক। নাটকের সংলাপগুলোকে বুলেটের এর মতো ব্যবহার কর। আমাদের কাছে মঞ্চটা ওয়র-ফ্রন্ট আর আমরা প্রত্যেকে সৈনিক। নাটকের প্রত্যেকটা শব্দকে সার্বিক লক্ষ্যে বুলেটের মতো ছুড়তে হবে। প্রত্যেকটি দর্শকের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়। কম গুলিতে যে বেশী শত্রুসৈন্য খতম করতে পারে, সে বড় সৈনিক। মনে রেখো শব্দই ব্রহ্ম। এখানে হিপোক্রেসির জায়গা নেই। অভিনয়ের সময় ভাবপ্রকাশে কোন তঞ্চকতা বা হিপোক্রেসি করবে না। জীবন তো একবারেরই জন্য, দুবার তো আর জন্মাবে না। যা কিছু বলার; যা কিছু দেখাবার এখনই করো, আর সময় পাবে না। আমরা জমি তৈরী করবো আর রাজনৈতিক নেতারা তাতে বীজ বপন করবে— এইভাবেই তো কাজ হবে, কিন্তু হচ্ছে না···। রাজনৈতিক দলগুলি কেবল ক্ষমতা লাভের চেষ্টাতেই ব্যস্ত। এটা দুর্দিন।

মনে আছে একজন একদিন প্রশ্ন করেছিল বিজনদাকে—'আচ্ছা আপনার কি করে চলে বলতে পারেন, আপনার তো কোন আয়ই নেই।' মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বললেন—

"কি করে চলে, কিভাবে বেঁচে আছি জানতে চেওনা। হাজার হাজার লোক যেভাবে একবেলা খেয়ে চুরি-ছিনতাই করে কোনক্রমে বেঁচে আছে, আমিও তাই। আর্টিস্ট অন্যকে খাওয়াতে হবে বলে খায়। অন্যকে বাঁচাতে হবে বলে নিজে বাঁচে। এটাই নিয়ম। দুঃখ জীবনে আসবেই, দুঃখ পাবে, কিন্তু কখনও দুঃখী হয়ো না— ওটা পাপ!"

এর মধ্যে 'কৃষ্ণপক্ষ' নাটক মাত্র একবার রবীন্দ্র সদনে করেছি—আর করতে পারছি না। অনেক টাকার দরকার, টাকা নেই। তার উপর যে রিহার্সাল রুমটা ছিল সেটাও চলে গেছে। অল্প খরচে একটা নতুন নাটক করব ভাবছি। নাটক ঠিক হলো 'চলো সাগরে'। কিন্তু রিহার্সালের জায়গা নেই। আজ এ বাড়ীতে কাল কোন বন্ধুর বাড়িতে আবার কখনও বা পার্কের মধ্যে এইভাবে যাযাবরের মতো এখানে ওখানে বসে কোনরকমে ধারকর্জ করে 'চলো সাগরে' তৈরী হলো। শুনেছি সঙ্গীত নাটক

অ্যাকাডেমী প্রোডাকশন করবার জন্য টাকা দিয়ে থাকেন। ঠিক করলাম অ্যাকাদেমীর কাছে আমরাও টাকা চাইবো। কথাটা শুনেই বিজনদা রেগে উঠলেন— 'আজ পর্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য আমি নিইনি— ও টাকা আমি চাইতে পারবো না'। আমরা বোঝালাম টাকা তো আপনি নিজের জন্যে চাইছেন না, টাকা চাইবে দল, আর তাছাড়া সরকারী টাকায় তো সকলেরই দাবী আছে, আর অনেকেই তো নিচ্ছে, আমরা কেন নেব না ; যাই হোক অনেক কষ্টে বুঝিয়ে রাজী করানো হল। টাকা পেলাম। মাত্র পাঁচ হাজার। প্রসঙ্গতঃ এটাই বিজনদার নাট্য জীবনে অ্যাকাদেমীর কাছ থেকে প্রথম টাকা পাওয়া। যাই হোক টাকা পেলাম কিন্তু মঞ্চ পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে রঙ্গনা কর্তৃপক্ষের সহ-যোগিতায় কয়েকটা দিন মঞ্চ পেলাম। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ২৭শে মার্চ রবিবার সকাল দশটা। রঙ্গনাতে আমাদের অভিনয়। নাটক 'চলো সাগরে'। নাটকের একটি প্রধান অংশের মুখ্য অভিনেতা অসিত ; যে নগিনা করে। ও অসুস্থ। ফলে নির্দেশ হল আমার অভিনয় ছাড়াও ঐ চরিত্রে আমাকে করতে হবে। যথারীতি অভিনয় শুরু হল, আমার নিজের অংশের অভিনয় করে শ্রমিক নগিনার অভিনয় করছি। বিজনদা উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছেন। নাটকের শেষাংশে মালিকের গুণ্ডারা নগিনাকে বোমা ছুঁড়ে মারে। রক্তাপ্লুত নগিনা মৃত্যুকালীন জবানবন্দী রেখে যায় তার শ্রমিক ভাইদের উদ্দেশ্যে— তারপরই ফ্রিজ এবং পেছনে ইণ্টারন্যাশাল সঙ্‌ বাজতে থাকে। দুটি চরিত্রে অভিনয়ের শ্রমজনিত কষ্ট এবং খানিকটা ভাবাবেগে এই শেষ দৃশ্যে অভিনয়ের পর মঞ্চে উপুর হয়ে কাঁদছি— হঠাৎ শুনতে পেলাম উইংসের পাশ থেকে কে যেন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো— নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি উইংস ধরে বিজনদা ছোট ছেলের মত কাঁদছেন আর বলছেন— অশোক আমাদের কী হবে রে, আমরা শুধু ইণ্টার ন্যাশনাল সঙ্‌ বাজিয়েই গেলাম, এখনও তো হাজার হাজার নগিনা মরে যাচ্ছে— আমাদের ওয়ার্কিং ক্লাসের তো কিছুই হলো না!

আগেই বলেছি রিহার্সালের পর প্র.ত্যকদিন আমাদের আলোচনা বসতো। প্রথমদিকে ঐ আলোচনা বসতো কাফে ডিলাক্সে রেস্তোরাঁতে, পরের দিকে নর্দান পার্কে। কখনও ওঁর জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা আবার কঠনও বা নতুন নতুন নাটকের পরিকল্পনার কথা এমন সুন্দরভাবে নাটকের সব গল্প বলতেন যা শুনে অনায়াসে যে কেউ নতুন নাটক বা গল্প লিখে ফেলতে পারে। খেজুর গাছ কেটে রস বিক্রী করে বেড়ায় এ রকন একটি চরিত্রের গল্প, ওয়াগন'ব্রেকারদের জীবন নিয়ে গল্প, নানা-রকমের পাখী বিক্রী করে এ রকম এক পাখীওয়ালার গল্প এই ধরনের কত নতুন নতুন সব নাটকের স্কিম যা, আজও লেখা হয়নি—সুযোগ এবং অর্থাভাবে স্কিম, স্কিমই থেকে গেছে।

'কৃষ্ণপক্ষ' নাটকের প্রথম অভিনয়ের পর নানাকারণে নাটকের কিছু অংশ বদল করবার দরকার হয়। বললেন, কাল থেকে তুমি এবং অসিত 'কৃষ্ণপক্ষ' নিয়ে বসবে। নাটকটা এডিট বরব। এ নাটক এডিট করা নিয়ে আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। কারণে অকারণে খানিক লেখার পরই মতামত জানতে চাইতেন। প্রথমদিকে এই মতামতের ব্যাপারে খুব অসুবিধায় পড়তে হতো। কেননা এতবড় একটা প্রতিভার সামনে কোন মতামত পেশ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। ক্রমশঃ বিজনদা

এই ব্যাপারটাকে সহজ করে নিলেন এবং আমরাও মতামত রাখতে শুরু করলাম। কোন চরিত্র কি সংলাপ বলবে কেন কি ভাবে বলবে এ ধরণের সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করতেন। এমন অনেক সময় হয়েছে যে নাটকের কোন একটা নতুন সিকোয়েন্স তৈরীর ব্যাপারে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলেন, তারপর হঠাৎ বলে বসলেন— আজ যা আলোচনা হল কাল তোমরা দুজনে আলাদা করে লিখে নিয়ে এসো— দেখব। যথারীতি অনেক কষ্টে লেখা হাজির করলাম। উনি মনযোগ দিয়ে সবটা শুনলেন। আমাদের কোন অংশের ভুল হয়েছে বিশদভাবে আলোচনা করে তারপর নিজের লেখা পড়ে শোনালেন। এইভাবে নিজের নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করা, সংলাপ তৈরী করা এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি সব ব্যাপারই হাতে ধরে শেখান।

ঠিক হল নতুন একটা নাটক লেখা হবে। 'অপারেশান বোড়াল'। এক অভিনব পদ্ধতিতে এ নাটক লেখা হবে। বিজনদা নাটকের মূল থীম এবং মোটামুটি পাত্রপাত্রীদের এক ছক করলেন। বললেন, সব ছেলেমেয়েদের ডাকো। সকলে মিলে রোজ একটু একটু করে রিহার্সলে নাটকটা লিখবে। আমি শুধু তোমাদের গাইড্ করবো। বোড়াল থেকে উৎখাত হয়ে আসা কিছু চাষী পরিবারের জীবন সংগ্রামকে ভিত্তি করে লেখা হবে এই নাটক। সপ্তাহে একদিন করে তোমাদের সবাইকে নিয়ে আমি বোয়ালে যাবো। ওখানকার লোকেদের সাথে তোমরা কথা বলবে। হিষ্ট্রি-অনিকস্ তোমরা লক্ষ্য করবে, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখবে এবং স্পট থেকে খাতায় নোট নেবে। মাঝে মাঝে কলকাতার ফুটপাথে বসবাসকারী চাষী পরিবারের সাথে কথা বলবে। শুরু হল কাজ। প্রায় ৪০ জনের মত নানান বয়সের ছেলেমেয়ে জড়ো করলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রিহার্সাল রুম হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় কাজে বাধা পড়লো। ছেলেমেয়েরাও নানাদিকে ছিট্‌কে গেলো আর নতুন স্কিমে এ নাটক লেখার পরিকল্পনা গেল ভেস্তে। ক্রিয়েটিভ আর্টের পেছনে সময় দেওয়ার চেয়ে সংগঠন— টাকা জোগার— ছেলেমেয়ে জোটানো আর রিহার্সালের ঘর খুঁজতে খুঁজতেই বেশী সময় কেটে গেল। স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেলো।

এরপর ঠিক করলাম অল্প চরিত্রের নাটক 'আজ বসন্ত' করবো। খরচাও কম। চারটি মাত্র চরিত্র। দুই বৃদ্ধ; একজন রিটায়ার্ড জজ, অন্যজন রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট। আর তরুণ বয়েসের ছেলেমেয়ে দুটি। এটা প্রেমের নাটক। নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ক্রাইসিস্ ইন রোমান্স অর্থাৎ আমাদের অবজেক্টিভ রিয়ালিটিতে যে ক্রাইসিস্ ক্রমশঃ ঘনায়মান হয়ে উঠছে তা ধীরে ধীরে প্রেমকে গ্রাস করতে চলেছে। নায়ক উপলব্ধি করছে চারদিকে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে তাকে পিষে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে—কনসেনট্রেশন ক্যাম্প···লুবিয়াঙ্কা···কারাগাণ্ডা···ট্রেভ্‌লিঙ্কা···। এই নাটকের মহলা হতো বিজনদার বাড়িতে এক অভিনব পদ্ধতিতে। সকাল থেকে শুরু হতো রিহার্সাল। চলত বেলা একটা পর্যন্ত। তারপর ওখানেই খাওয়া-দাওয়া— আধঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর আবার কাজ। চলত একটানা রিহার্সাল। এ নাটকের রিহার্সালে কারো কোন প্রবেশাধিকার থাকত না, বিশেষ করে যখন নাটকের নায়ক-নায়িকার প্রেমের অংশের রিহার্সাল চলত। প্রথমে নাটক বিশ্লেষণ, চরিত্র বিশ্লেষণ, নাটক নিয়ে নানা আলোচনা তারপরে শুরু হতো মূল রিহার্সাল।

প্রথমে বললেন তোমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াও—আশপাশের সবকিছুর অস্তিত্ব ভুলে যাও। চরিত্রের মধ্যে ডুবে যাও। দুজনে দুজনার দিকে তাকাও, ভাল করে দেখ। এবার পাশাপাশি দুজনে গা ঘেঁসে ব'স। হঠাৎ ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলেন। বললেন, চোখ বন্ধ কর। দুজনে দুজনকে ভাব। আর থেকে থেকে পিছন থেকে ফিস্‌ফিস্ করে বলছেন—তোমরা দুজনে দুজনকে ভীষণ ভালবাস। সাত বছর ধরে চলেছে তোমাদের পূর্বরাগের পালা। একটি সংলাপ বলার সাথে সাথেই যেন বোঝা যায় তোমরা দুজনে দুজনকে ভালবাস। অন্ধকার ঘরে আমরা দুজন ছেলেমেয়ে চোখ বুঁজে পাশাপাশি বসে—কেউ কোথাও নেই। আর পেছন থেকে মাঝে মাঝে বিজনদার ঐ ধরণের সব কমেণ্টারী। ফলে আলো জ্বেলে যখন সংলাপ শুরু করতে বলতেন— দেখা যেতো কেমন যেন ঘোরে-পড়া ভাব।— ফ্রেণ্ডলী এটমস্ফেয়ার। কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেছে, গলা কাঁপছে— সংলাপ উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে আর উনি বলছেন এ্যাকটিং করো না, জীবনে এ্যাকটিং করার কোন সুযোগ নেই। নন্‌এ্যাকটিং ইজ দি বেস্ট এ্যাকটিং··· ইউ ক্যাননট এ্যাক্ট—ইউ ক্যান ওনলি রিয়্যাক্ট। ভুলে যাও নিজের অস্তিত্ব। মানসিকতায় সুবিনয় (নায়ক) হয়ে যাও। সেইমত রিয়্যাক্ট করো। নিজের পারসোনালিটি দিয়ে কখনও চরিত্রকে ডোমিনেট করার চেষ্টা করো না, তাহলে চরিত্র মারা যাবে বরং চরিত্র তোমাকে ডোমিনেট করুক। একেবারে সুবিনয় হয়ে গিয়ে সংলাপ বলো। ইনভল্‌ভ ইওরসেল্‌ফ। সংলাপ বলতে বলতে যদি ভেতরে যন্ত্রণা হয়, তবে বুঝবে কিছুটা ইন্‌ভল্‌ভমেণ্ট হয়েছে। একটানা এইভাবে কিছুক্ষণ রিহার্সাল চলার পর স্নায়ুর উপরে ভীষণ চাপ পড়তো। একে প্রেমের ব্যাপার, তার উপর এই ধরনের ইনভল্‌ভমেণ্ট আনার চেষ্টা— ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মত অবস্থা হতো। সাথে সাথেই উনি রিহার্সাল বন্ধ করে দিয়ে বলতেন— তোমরা একটু শুয়ে বিশ্রাম করো— আমি গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি? আর বলে চলতেন— কত ইচ্ছে ছিলরে, আর্টিস্টদের নিয়ে একটা 'গণ-কমিউন' করব— তোদের নিয়ে আমি একসাথে থাকব— স্টেজ্ সংলগ্ন একটা বাড়ি থাকবে। সকাল থেকে চলবে গলার এক্সারসাইজ— গানের ক্লাশ— শরীর চর্চা— নাটক— নাটকের রিহার্সাল— মাঝে মাঝে বসবে আলোচনা— সেমিনার— আর সন্ধ্যেবেলায় মঞ্চে অভিনয়। মাঝে মাঝে আমরা দর্শকদের আমাদের রিহার্সাল দেখাব। মঞ্চে কিভাবে একটা চরিত্র আস্তে আস্তে জন্ম নেয়, কি করে একটা নাটক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ রূপ পায়।

কিছুদিন ধরেই নতুন নাটক লেখার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলাম— আর উনি কেবলি বলছেন ঠিক আছে হবে। একদিন ওঁর ঘরে ঢুকতে যাবো হঠাৎ কান্নার শব্দ পেলাম। কৌতূহলী হয়ে ভেতরে ঢুকলাম। দেখি, অবাক কাণ্ড! একটা খাতায় কি সব লিখছেন আর মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছেন। কখনও বিড়বিড় করে কি সব বকছেন— কখনও হাসছেন— কখনও বা বাচ্চা ছেলের মত ডুকরে কেঁদে উঠছেন। অনেকক্ষণ পর পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, আমি দাঁড়িয়ে আছি। জিজ্ঞেস করলাম— কি ব্যাপার, কি লিখছেন? বললেন, একটা হাত। জিজ্ঞেস করলাম, হাত মানে? বললেন, একটা প্রজেক্টেড হাত তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন— ধর তুমি বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছ। একটা হাত এসে তোমার কাছে ভিক্ষে

চাইল, তুমি তাচ্ছিল্য করে দুটো পয়সা তাকে দিলে কি দিলে না। সে চলে গেল। তুমি যথারীতি বাড়ি চলে গেলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছ— হঠাৎ দেখলে সেই হাতটা আয়নার মধ্যে। তুমি খেতে বসেছ— আবার সেই হাত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিছানায় শুতে গিয়েও সেই হাত। প্রিয়ার ঠোঁটে চুমু খেতে যাবে— দেখলে প্রজেক্টেড সেই হাত দুজনের মাঝখানে, কি সাংঘাতিক ব্যাপার বলতো! সারাটা দিন ধরে সেই হাতটা তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ আশ্চর্য দেখ, সে কিন্তু কোন ভয় দেখাচ্ছে না বা অন্য কিছু করছে না। কেবল কিছু পাবার আশায় হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। আর থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌ছে। আমি অবাক হয়ে বললাম— কার হাত, কেনই বা হাত! উনি বললেন— একটা নতুন নাটক— হাঁসখালির হাঁস— হাঁসখালির হাঁসেরা জলে থাকে। মানুষ থাকে মাটিতে। কিন্তু মাটিও আজ জোতদারের দখলে— মাটি সব নোনাফেনা, সব মাটি দিয়োগো গার্সিয়া। হাঁসখালির ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, যজ্ঞেশ্বর, জনার্দন, ভীষ্মরা আজ কলকাতায় ফুটপাথের ভিখিরী।

ভাবতে অবাক লাগে এতবড় একটা প্রতিভা, এত তাঁর স্বপ্ন কিছুই ঠিকমত বাস্তবায়িত হতে পারল না। দুর্ভাগা আমাদের মাতৃভূমি। প্রতিদিনই বোধ হয় হাজার হাজার ফুটের ডকুমেন্টারী ফিল্‌ম নষ্ট হয়। অথচ আজ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ নাট্যকর্মীদের জন্যে এতবড় একটা প্রতিভার কোন নাটকের একটা ফিল্‌ম ধরে রাখা গেল না। সংস্কৃতি সম্পর্কে সরকারী বেসরকারী অনুষ্ঠান কম হয় না আর টাকাও খরচ হয় কত। বিরাট স্বপ্ন, কত পরিকল্পনা কিন্তু কোন কিছুই বাস্তবায়িত হলো না। ভাবলে কষ্ট হয় গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা— নবান্নের জনকের এক বছরের আয় মাত্র ৩০০ টাকা। কখনও আবার তাও না। হায়রে দুর্ভাগা দেশ!

যুদ্ধ করে চলেছি মঞ্চে | ইরা

বাংলায় গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক বিজন ভট্টাচার্য যাঁর ঘজে অভাব নেই রচনা, অভিনয় ও প্রযোজনা কোনটিরই— এ কথা তো সর্বজনবিদিত।

১৯৪৪-এ নবান্ন দিয়ে যার শুরু তার শুরুটা আজও চাপা পড়ে নি, তিনি এখনও অশেষ, এখনও চলছেন, ১৯৭৭-এর প্রযোজনাতেও এই এগিয়ে চলার তীব্র আহ্বান।

এই দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের ইতিহাস মনে রেখেই এ আমার শ্রদ্ধার স্মরণ। তথাপি তারুণ্যের আবেগ-সর্বস্বতা মুক্ত হয়ে আজকের মন বিশ্লেষণমুখী— বিশ্লেষণ আছে বলেই প্রশ্ন আছে— বিজনদাকে নানারূপে —নাট্যকার, নাট্যপরিচালক এবং সংগীতজ্ঞ বটেই -- কখনো প্রশ্ন জাগছে, কখনো উত্তর পাচ্ছি— আজকে এই দেখার কথার শুরু আপাতত আমার কয়েকটি জিজ্ঞাসায় সত্তরের দশকের বহতা নাট্যধারায় সেদিনের প্রাজ্ঞ ঋত্বিক কি দিতে পারছেন? কতটুকু পারছেন? আর যদি বা না পেয়ে থাকেন, সে কেন?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে জাতির ইতিহাসের মহাসংকটে, যুদ্ধের আঘাত, মন্বন্তরের বিভীষিকা যখন বাংলাদেশটার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে বসেছিল, তখনই যে বিরাট এক সংঘবদ্ধ জীবনীশক্তি নাট্য আন্দোলনের মধ্যে সমাজকে সজীব করে তুলল এবং তাঁরা বলতে চাইলেন জীবনের জন্যই শিল্প— ভারতীয় গণনাট্যের এই বিপ্লবী মতবাদ দেশের নাট্যধারায় নিয়ে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। গঙ্গোত্রী থেকে এখন বহতা গঙ্গা। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে আজ যে প্রবাহ—কোথায় সে চলা? কেমন সে চলা? সেদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির তুলনায় আজকের পরিস্থিতি অনেক বেশী জটিল, একদিকে বৈদেশিক বৃহৎশক্তির ছাদনা তলায় বসে ভারতবর্ষ এগোতে চাইছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতায়, আর একদিকে বিপ্লবী জনতা মুখোস ছিঁড়ে ফেলে, ভণ্ডামী ঝেড়ে ফেলে যারা সত্যিকারের বাঘ চায়, কাগুজে বাঘ নয়। অবশ্য এ সম্পর্কে নানামুনির নানা মত,— বর্তমানে এ রাজনীতির সহজ বিভাজন সম্ভব নয়। ফলত আমাদের শিল্প-সাহিত্যে নাটকও সেই জটিলতা থেকে মুক্ত নয়। তাছাড়া সঙ্গে রয়েছে নানা বেড়াজাল তবু এই কাঁটাঝোপের মধ্যে থেকেও যে গাছগুলো এখনও স্ব-মতাদর্শে সপ্রাণ তারা সত্যিই বলবান। যদিও তাদের কিছু ডাল, কিছু ছাল বাদ পড়েছে, পড়ছে, তথাপি তারা টিঁকে থাকে, অনেকের মত

বিজন ভট্টাচার্যও তেমনি একজন শক্তিমান।' শারীরিক অসুস্থতা এবং বার্ধক্য এখনও তাকে পেড়ে ফেলতে পারে নি, এখনও তিনি ঋজু এখনও তার উদ্যম যে কোন যুবার প্রেরণা দিতে পারে। তবে তার এই ঋজুতা কতখানি প্রকাশ পাচ্ছে ? চিন্তার প্রকাশহীনতা তো মৃত্যুর সামিল।

প্রকাশের অপমৃত্যু রোধ করতে গিয়ে আজ কয়েক বছর ধরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত নামী নাট্যসংস্থাও পারিপার্শ্বিক নোনাজলে ঘূর্ণ্যমান। অবশ্য যারা এর উর্ধে থাকতে চায় তারাও সুযোগ সন্ধানী, ফলে তাদের উপর শাস্তির চাপটা, কাদার ঝাপ্‌টা লাগে বেশী। তবু নিরুপায়, অনেকের মত তবু বিজন ভট্টাচার্য ও তার সাথীদের চলতে হচ্ছে ভাঙা কোমর আর শক্ত মন নিয়ে।

বিজনদার সংস্পর্শে আসার আগে আমার নাট্যভাবনা শুধুমাত্র সখের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। কারণ, সমাজের উঁচুতলার নির্যাতন আমাকে অধিকাংশের যন্ত্রণার সামিল করে তুলেছিল এবং চলছিল তার অনুসন্ধান। সেই সময় বিজনদার সান্নিধ্য আমার অনুসন্ধানের পথ দৃঢ় করে তুলল। নাটক করি কেন এই প্রসঙ্গে যখনই প্রশ্ন তুলেছি, বারবার বিজনদা একটা কথাই বলেন : 'আন্দোলনের জন্য নাটক —এই নাট্যআন্দোলনের জন্যই নাটক করা'। আরও বলেন : 'দেখ্‌, বাঁচা এক, আর বাঁচার মত বাঁচার চেষ্টা করা আর এক প্রশ্ন'— সেই প্রশ্নেই চেতনার আন্দোলন— ক্রমে বুঝলাম মনুষ্যত্বের দায়িত্ব, বুঝলাম, রাজনৈতিক পরিবর্তন তখনই আসে যখন নিপীড়িত শ্রেণী হয় সংঘবদ্ধ এবং এই সংঘবদ্ধতার বোধ জাগাতে শিল্পের দায়িত্ব অনেক। সেই দায়িত্ব পালন করতে আমরা শুধু নাট্যশিল্পী নই ; নাট্য শ্রমিকও বটে।

অবশ্য সার্থক নাট্যশ্রমিক হওয়ার শ্রম অনেক। বিজনদা নাট্যকারের শিল্পীর মিথ্যে অহংকার নিয়ে উঁচু আসনে বসে থাকলে লিখতে পারতেন না। '৭৬-এর মন্বন্তরের পটভূমিতে 'নবান্ন', লিখতে পারতেন না, হাঁসখালির নোনাজলে ভাসা হাঁসেদের কথা— যে হাঁস ডালহৌসীর দশটা পাঁচটার সাদা সার্ট পড়া অগণিত ক্লান্ত মানুষ। যারা নিজেদের হাঁস জেনেও বলে হাঁস না,—বলতে পারতেন না আর্ত মানুষের কথা। তবে একথাও ঠিক, যেমনটি যতখানি স্পষ্ট করে বলা দরকার, তা তিনি পারছেন না। এই ব্যর্থতার দায়িত্ব কি তাঁর একার ? না, যে সমস্যা আজ সমস্ত গ্রুপ থিয়েটারের—বসবার ঘর নেই, টাকা নেই, একটি দুটির বেশী অভিনেত্রী নেই, সব থেকে বড় কথা নাট্যমঞ্চ নেই। যা আছে তাতে তো অধিকার পেশাদারী নাট্যগোষ্ঠীর - যারা শরীরী লীলায় মাত করছেন বাজার, মানুষকে বিনোদনের নামে বিভ্রান্ত করাই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই যুগপরিবেশে মানুষ আছে অমানুষও আছে। আর মানুষতো বাঁচবেই সুস্বাস্থ্য নিয়ে— 'কার্জন পার্কের একফালি সবুজে গোটা দেশ নয় সীমাবদ্ধ'—একজন প্রবীর দত্তকে পিটিয়ে হত্যা করা যায় তা বলে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রবীরকে সরকারী জুলুম নিশ্চিহ্ন করতে পারবে ? পারবে না। এই কথাটাই 'জানিয়ে দিতে চায় গ্রুপ থিয়েটার'। কালাকাল জুড়ে শিল্পের কোন পরাধীনতা নেই। তাই বিজন ভট্টাচার্যদের প্রতি তথাকথিত সরকার একচক্ষু কাকের মত প্রশংসাপত্রের সম্মাননায় বেঁধেই দেশনায়কদের দায়িত্ব শেষ ? প্রকাশের সুযোগের ব্যবস্থা করাও তো তাদেরই কর্তব্য। তবে শোনা যাচ্ছে, তাদের অন্য দিকের বোঁজা চোখটাও খুলছে। সুখবর বটে। তবে কিনা শুভস্য শীঘ্রম্‌— সরকার চায় দেশের ভালো করতে, নাট্যগোষ্ঠীর

দেশের ভাল করতেই তাদের আপনজনের কথা বলে। তবে, এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ কেন? বিরোধ বোধ হয় উদ্দেশ্য সমাধানের পথে।

বিজন ভট্টাচার্য ও তাঁর নাটকে ও প্রযোজনায় প্রতিরোধের কথা বলেন। একদিন বিজনদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— 'ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা ছত্রখান হল কেন?' উত্তরে বললেন— 'সে অনেক কথা, তবে মোদ্দা হল গিয়ে, মানুষের চাইতে কেরিয়ারিস্ট বেশী ছিল যে'— কথাটা একদিকে সত্যি, না হলে যে শম্ভু ভট্টাচার্য রানারের রূপ ফোটান তিনি আজ ছিট্‌কে পড়েছেন কোথায়? শম্ভু মিত্রও তো আজ ২৭-১৮ বছর ধরে তার বহুরূপী গড়ে তুলেছেন এবং তিনি বলেছিলেন তিনি তাঁর রবীন্দ্রনাট্যের প্রযোজনার মাধ্যমে রবীন্দ্র ঐতিহ্য গড়ে তুলতে চেয়েছেন। বাঙালীর নাটমঞ্চে বহুরূপীর দান অসামান্য, তাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞ থেকেও প্রশ্ন না করে পারছি না— যুদ্ধ যখন দ্বারে, তখন ঐতিহ্য সৃষ্টিই বড় কথা হল? মাত্র কয়েকটি ফলনের পরেই ঋত্বিক ঘটকের অবিনাশ প্রতিভা একাকীত্বের সংগ্রামে কেমন করে অকালে বিনষ্ট হলো সে তো জ্বলন্ত উদাহরণ। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে উঠতে না পারলে শিল্পীর শিল্পত্ব কোথায়? বিজনদা বেশ বলেন— 'দেখ্, শরীরে জণ্ডিস হলে তাকে সারানো যায়, কিন্তু মাথা-মনে হলে তাকে সারাবে কে?' এই যে, যে-যার মত বিচ্ছিন্ন হয়ে সুফলটা কি হয়েছে? না, বহুল সংখ্যায় নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। কয়েক বছর ধরে অনেক খ্যাত-অখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী কালের ঘোলাজলে ডুবে মরে তো যায়-ইনি বরং তারা নাটকের নতুন নতুন দিকের উন্মোচন করছে।— চরিত্রের মুখে বাঁধা বুলি ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়া তাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং সমাজটাকে বদলাতেই তারা চায়, তাছাড়া, 'শতাব্দী' নিয়ে বাদল সরকার আমাদের শোনাচ্ছেন 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' কিংবা 'ভোমা', 'ভাঙা মানুষ' প্রভৃতি এবং নাট্যরীতিতে তিন দেওয়ালের বন্ধন ভেঙে ক্রমশ আনছেন প্রসেনিয়াম থিয়েটার, এই ক্রমোন্নতিতে নবনাট্য ধারার অন্যতম উদ্‌গাতা বিজন ভট্টাচার্যও কিছুদিন আগে ক্যালকাটা থিয়েটারের মাধ্যমে 'দেবী গর্জন' শুনিয়েছেন। সেই দেবীর ডাক প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ধ্বনিতহচ্ছে।— আবার হয়েছে পরিবর্তন। বিজনদা আবার প্রায় সাত-আট বছর ধরে তাঁর গোষ্ঠী 'কবচ-কুণ্ডলের' মাধ্যমে বক্তব্য বলে চলেছেন। করছেন প্রযোজনা।

আমরা জানি '৭৫ এর জরুরী অবস্থার চাপ কতখানি গুরুতর ছিল। তথাপি, ক্রান্তিকালেই বিজন ভট্টাচার্য ভারতের কমিউনিস্ট সংগ্রামের বিশ্লেষণ করলেন কোলকাতার কয়েকটি মঞ্চে তাঁর 'চলো সাগরে' নাটকে। ১৯৭৫ '৭৭-এর মধ্যে প্রায় আটবার মঞ্চস্থ হয়। তিনি ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠার প্রেরণা দিলেন— পরাজিতের ভাঙা বুকেই বাঁচার আশা দুর্বার হয়ে ওঠে।

একদিন অভিনেতা হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে বিজনদা বলেছিলেন বড় সুন্দর কথা— 'জানিস, কুঁড়ি ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফুল হয়. ফুল ফোটে গন্ধ ছড়ায়, তারই গন্ধ টানে মৌমাছিকে, অভিনেতাও তাই, দর্শককে টানতে না পারলে তুই তো ব্যর্থ।'

নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজক বিজন ভট্টাচার্যের দুই ভূমিকার মধ্যে অমিল তাই বিশেষ। তবে দ্বন্দ্ব জেগে আছে তার সদাজাগ্রত মনে, তাই যা তিনি দেন, তা জীবন্ত স্বাভাবিক করে দেন। কি নাটকে অথবা নাটকে অথবা নাটক প্রয়োগে।

মহলার সময় বিজনদা একজন দায়িত্বশীল মানুষ, তাঁর মহড়া দেওয়ার পদ্ধতিটা চমৎকার। উনি কিন্তু একের পরে দুই তারপর তিন সংখ্যা এমন কোন ছক বাঁধা নিয়মে এগোন না। যার ক্ষেত্রে যেমন দরকার তেমন করে কাজ করেন। ধরা যাক্ আমার প্রসঙ্গ— আমাকে উনি 'চলো সাগরে' নাটকে শোষিত সংগ্রামী সাঁওতাল বধূ 'কালিয়া' চরিত্রটা প্রথমে পড়তে বললেন— তারপর চরিত্রটা কী ধরনের, কেন নাটকে আছে অর্থাৎ নাটকের কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে, চরিত্রটি যখন আসছে তখন একে একে ব্যাখ্যা করলেন এবং কিছুদিন সংলাপে স্বরক্ষেপ কণ্ঠস্থ করালেন বসে বসে মহড়া দিয়ে— মাসখানেক বাদে— ভঙ্গী, হাঁটা চলা সুরু হলো, মহড়া চলাকালে যদি কখনো অন্যমনস্ক হই— বারংবার বলেন—'চরিত্রের মধ্যে ঢোক, না হলে তাকে বের করে দেখাবি কি করে— আগে ইমাজিনেশন তারপর কম্পোজিশন্'। বিজনদার এই শেখাবার রীতি বড় সুন্দর। তবে এই স্নেহ-প্রবণ বিজনদাই আবার ভারী কঠোর। মহড়ায় যদি কখনো গাফিলতি হয় গালমন্দর সঙ্গে চড়-চাপড়টাও পড়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু তা দুঃখ-র থেকে বেশী জাগায় উদ্যম, কেমন একটা জিদ্ চেপে যায়— 'হতেই হবে'। স্বভাবতই যারা নিতে পারি তারাই হই ফলপ্রসূ। অশক্ত শরীরে এখনও পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য সত্যিই আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

অনেকে বলেন বিজনদার 'জবানবন্দী,' 'নবান্ন,' 'দেবীগর্জন,' 'গোত্রান্তর,' 'আজ বসন্ত,' 'কৃষ্ণপক্ষ,' 'মরাচাঁদ,' 'চলো সাগরে,' প্রায় সমস্ত নাটকই বড় বেশী সংলাপ নির্ভর। তবে সংলাপ বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও, নাটকে নতুন নতুন আঙ্গিক-নিরীক্ষা না থাকা সত্ত্বেও অথবা সংগীতের বুননি (অবশ্য লোক সংগীতের প্রয়োগে সুর-বৈচিত্র্য এনেছেন নাটকে) বেশী থাকা সত্ত্বেও আমি বলবো নাটকের বক্তব্যের যে প্রাণস্পন্দন তা জীবনের অত্যন্ত বিশ্বাস্য প্রতিরূপ। বাঁচতে চাওয়ার স্বপ্ন ছাড়া আর কোন স্বপ্নের খাদ এতে মেশানো নেই। তবু প্রশ্ন মতাদর্শে বিশ্বস্ত থাকা সত্ত্বেও কেন বিজন ভট্টাচার্যের প্রযোজনা আজ সেদিনের মত উন্নত মানের হয়ে উঠতে পারছে না? একটি প্রযোজনার সাফল্য নির্ভর করে তার সু-অভিনয়, উপযুক্ত মঞ্চসজ্জা, সুর-সসংযোজন এবং যথাযথ আলোক। সম্পাতের উপর, গত প্রযোজনায় এর মধ্যে কোন্‌টির অভাব ছিল? আমি 'চলো সাগরে' প্রসঙ্গে জানি, সেখানে সামগ্রিক অভিনয় ছিল কিছুটা বিশৃঙ্খল, মঞ্চসজ্জা ছিল সাদামাটা, অনাড়ম্বর, অবশ্য সুরসংযোজন যথাযথ। শব্দ প্রক্ষেপণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ। আলোর ব্যবহার ছিল অপটু হাতের। তথাপি আঙ্গিকের মধ্যে কয়েকটি স্থির চিত্রকল্প সুর ও আলোয় প্রতীকী হয়ে উঠেছিল। তবে ত্রুটি যা ঘটেছে তা একটাও অকারণ নয়।

সম্প্রতি মনোজ মিত্রের 'অলীক সুনাট্যরঙ্গে' প্রবন্ধে তিনি ভালো নাটক না হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে বলেছেন— 'নাটক লেখার সহজ সরল একটা ছক তৈরী হয়েছে, কিছু উত্তাপ আর অভিশাপ দিয়ে কেনা এক হাততালি পাওয়া ছক। —সমস্ত নাটকই কি তাই? অন্য কারো প্রসঙ্গে না গিয়ে বিজন ভট্টাচার্যকে দিয়ে বলি 'দেবীগর্জন' কি তাই? 'চলো সাগরে' নাটকের শেষ দৃশ্যে অসমর্থরা যখন বাঁচার আশায় চিৎকার করে প্রশ্ন করে 'হামলোগোকা কেয়া হোগা' —তখন স্বর্গের দেবতার মত

কোন নেতা এসে তাকে তুলে ধরে না, তুলে ধরে তাদেরই পাশেপাশে যে সমর্থরা তখনও যুদ্ধ করে চলেছে— কেউ তুলে নেয় নিহতকে, কেউ আহতকে— উদ্‌গ্রীব তখন বাঁচার প্রতিজ্ঞায় যুঝে চলা জনতা— বাড়তে থাকে আন্তর্জাতিক চিরকালীন বাঁচার সুর— এও কি সস্তা হাত-তালির প্রত্যাশার লক্ষণ? বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন,' 'দেবীগর্জন' 'আজ বসন্ত' এখনও সাড়া জাগায় মঞ্চে মঞ্চে এবং স্মরণে তো বটেই। অনেক পূর্বদ্রষ্টাদের বলতে শুনি— 'ওহ্, সে একটা জিনিষ।' দুঃখজর্জর মানব চরিত্র দুঃখ অতিক্রম করতেই তো চায়, যে হতাশ— পালিয়ে এড়াতে চায় সমস্যা সেও তো কষ্টকে তাড়াতে চাইছে, অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু এ যে ঐতিহাসিক সমস্যা। সুতরাং অসুস্থতাকে সুস্থতা দিয়ে অন্ধকারে আলোর ইঙ্গিত দেওয়াই তো জীবনবাদী শিল্পীর কর্তব্য, বিজন ভট্টাচার্য জীবনবাদী শিল্পী। তাঁর সব নাটকেই যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের প্রেরণা থাকে, তবে তা কিন্তু নিছক বক্তব্য-সর্বস্ব নয়, রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে বলতে হয় সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য। তবে নাটকে আঙ্গিক, সংলাপ, আলো, সুর, অভিনয়— এই প্রত্যেকটি মাত্রার একলয়ে ঐকতান না হলে বেখাপ্পা শোনায় বৈকি এবং প্রযোজনা আনে ব্যর্থতা— দর্শকমনে ছাপ ফেলে না। একটি বা কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যে নিবেদন তা যখন অন্যমনে সংবেদনার সৃষ্টি করে তখনই তো সার্থক শিল্পরূপ।

বিজনদার কথা, তাঁর প্রচেষ্টা, তাঁর উদ্যম, শিল্প ভাবনা, আমাদের উদ্দীপ্ত করে। তবে একথা না বলে পারছি না—আজকের নাট্যদর্শক চায় নতুনত্ব, বৈচিত্র্য, আঙ্গিকের কলাকৌশলে সমৃদ্ধ, বিষয় গৌরবে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন নাট্যপ্রযোজনা। সাদামাটা গ্রাম বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে সরলতা আছে বটে, বাহুল্যবর্জিত মঞ্চসজ্জা প্রতীকী ব্যঞ্জনার অপেক্ষা রাখে। যুগপরিবেশ ও মানবমনের অনুভবে এসেছে জটিলতা। ১৯৪৪ থেকে ১৯৭৭-সময়ের বয়স অনেক পরিণত— নাট্যদর্শকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়েছে প্রচুর, বুদ্ধিও পরিশীলিত— উন্নত শিল্পকে চায় আজকের মানুষ। জীবনের জন্য যে শিল্প তাকে, জীবনকে গভীর ব্যঞ্জনায় সংবেদনায় জীবন্ত করে তুলতে।

বিজনদা বলেন—'আমার কথাগুলোই আমার বুলেট, তাই দিয়ে যুদ্ধ করে চলেছি মঞ্চে'। সেই যুদ্ধের সামিল আমরা বহু বহু নাট্যকর্মী, বর্তমানে দুঃসময় এবং দুঃসময় অতিক্রমের যুদ্ধ, যতদিন না 'রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে না আনতে পারি 'ফুটন্ত সকাল'।

বাংলা থিয়েটারে গণনাট্যের ভগীরথ এখনো সক্রিয় | একটি সাক্ষাৎকার

আজকের বাংলা থিয়েটারের যা কিছু প্রগতিশীল ঐশ্বর্য, তার প্রবর্তক ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। আর গণনাট্য আন্দোলনের সেদিনের অন্যতম প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা হলেন নট নাট্যকার নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য। বাংলা থিয়েটারে আন্দোলন, সচেতন সংগঠিত আন্দোলন, গণনাট্য সংঘই শুরু করে। উত্তরকালে সংগঠকদের সঙ্গে শিল্পী ব্যক্তিত্বের সংঘাতে শুরু হয় নবনাট্য আন্দোলন। তদবধি গণনাট্য আন্দোলন, নবনাট্য আন্দোলন, সৎ নাট্য আন্দোলন, কিমিতিবাদী নাট্য আন্দোলন ইত্যাদি বহুবিধ আন্দোলনে আন্দোলনে বাংলার থিয়েটার রীতিমত আন্দোলিত। কিন্তু এতসব আন্দোলনের মধ্যেও সেদিনকার প্রধান ঋত্বিক নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য আজো তাঁর সেই প্রথম দিনকার প্রতিশ্রুতি, গণনাট্যের যে যৌথ জীবনাগ্রহ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সৃজনশীলতায়—তাকেই রূপায়িত করে চলেছেন থিয়েটার-শিল্পে। তাঁর থিয়েটার শোষণ মুক্তি, বন্ধন মুক্তির থিয়েটার। তাঁর থিয়েটার সামাজিক গণ মানুষের আপোষহীন থিয়েটার। বাংলা থিয়েটারে তাঁর এই বিরাট অবদানের, যেহেতু তা নিনাদিত নয়, তাই তাঁর যথার্থ মূল্যায়ণও হয় নি।

আমরা তার থিয়েটারের কথা তাঁরই মুখ থেকে জানবার জন্য দুটি সাক্ষাৎকারে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করি, যদিও জানি বিগত এক দশক ধরে তাঁর একাধিক সাক্ষাৎকারে বিজন ভট্টাচার্যকে যেভাবে যত গভীরে নানাদিক থেকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে আমরা তার কাছাকাছিও যেতে পারিনি ; তবু মনে হয় আমাদের চেষ্টা নিস্ফল হয়নি। কারণ বিজন ভট্টাচার্যের ন্যায় নিরহঙ্কার 'শুভ্র সততা'কে ক্যামেরার যে কোন লেন্সে ধরা যায়।

প্রশ্নকর্তা ছিলাম অধীর সেন, জগন্নাথ হালদার, নৃপেন্দ্র সাহা। সহযোগিতায় : মুকুর ভট্টাচার্য। —গন্ধর্ব সম্পাদক

প্রশ্ন : আপনি জীবন-শিল্পী। শিল্পের বহুতর মাধ্যমের মধ্যে থিয়েটার শিল্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়লেন কেন ? কোন বয়সে ? কিসের প্রেরণায় ?

উত্তর : এক একজন মানুষের সহজাত এবং অর্জিত কিছু ইনটেলিজেন্স থাকে। আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে। ছোট বেলায় ঐ সমস্ত অঞ্চলে যে সব মেলা, আসর বসত সেখানে যেতাম এবং গান, বাজনা, কথকতা প্রভৃতি দেখতাম, তাদের সেই সমস্ত ফর্ম অনুকরণের চেষ্টা করতাম। নিজেও আবৃত্তি, গান, কথকতা করতাম। পরবর্তী জীবনে মানুষের জীবনের সঙ্গে ঐ

গুলোর সাদৃশ্য এবং নাটকে মানুষের জীবন প্রতিফলিত লক্ষ্য করেই আমি নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হই। এক একজন মানুষের এক একরকম ভাবগত দিক থাকে। আমার ভাবগত দিক এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং আমি এই দিকেই ঝুঁকে পড়ি।

প্রশ্ন : আপনি তো আই পি টিএ-র গোড়া থেকেই যুক্ত ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি প্রথম থেকেই আছি।

প্রশ্ন : নাট্যচর্চার প্রতি আবাল্য আগ্রহ না মানুষের প্রতি কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গড়ার কাজে এগিয়ে এলেন ?

উত্তর : খানিকটা জীবন-বোধ থেকেই আসে শিল্প-বোধ আসে আর শিল্প-বোধ থেকেই আসে নাট্যবোধ। আমি মাধ্যমটা নিয়ে ভীষণ কষ্টে পড়ি। ফর্ম নিয়ে, হাউ টু এক্সপ্রেস মাই সেল্‌ফ ? আমি তো আঁকিয়ে, গাইয়ে বা বাজিয়ে নই। তা আমি কি করে শিল্পের মাধ্যমে জীবন-বোধ সঞ্চারিত করব ? তো, শিল্পের মাধ্যমটা ধরতে খুব অসুবিধায় পড়ি। সত্যি কারের এই জীবন যন্ত্রণা ছিল বলেই এই নাটকের যন্ত্রণা শুরু হলো।

প্রশ্ন : যে 'মানুষ' আপনার নাট্যশিক্ষক, সেই গ্রামের মানুষের মিছিল চলেছে আপনার সব নাটকে। এর কারণ কি ? আপনার বিশ্বাস—

উত্তর : আমার সেদিনকার বিশ্বাস আর, আজকের বিশ্বাস অটুট। আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এই শিল্পের প্রতি, জীবন-বোধ সঞ্জাত শিল্পের প্রতি, যখন আমি আমার হীরোকে আবিষ্কার করেছিলাম পিপ্‌লের মধ্যে। ঐ গ্রীক হীরোর মতন। খুব বলশালী। ক্ষেত-খামারে দেখেছি, পদ্মায় দেখেছি, ফ্যাক্টরীতে দেখেছি— বিশেষ করে গ্রাম জীবনে বড় বড় মেলায় দেখেছি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে আমি যখন সোশিও-পলিটিক্যাল ককাস-এর মধ্যে এসে পড়লাম সেই সব হীরো গুলো হীরো হয়ে সমাজ জীবনে বা রাজনৈতিক জীবনে উঠে আসে।···এখন তারা কোথায় গেল ? তাদেরই খুঁজেছি। পাইনি। কিন্তু ঐ যে বললাম,সোশিও-পলিটিক্যাল ককাস, যেটা নাকি বহুতর স্বার্থান্বেষী চক্রের আড্ডা, তার রিং ভেদ করে সেই সমস্ত হীরো, তারা উঠে আসতে পারেনি। পারেনি তাদের সরব এবং সুস্থ জীবনের সংকল্প ঘোষণা করতে। সেই দিক থেকে, আজকেও নাট্য-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরই টেনে টেনে তোলবার চেষ্টা করি। কিন্তু যেহেতু, সমাজ এবং রাষ্ট্র তাদেরকে আইসোলেট করে রেখেছে, এবং এখনো পরিপূর্ণ মাত্রায় রাখবার চেষ্টা করছে, তারা এই আপোষের পরিবেশ থেকে দূরে দূরে থেকে যাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা; তাদের সেই স্বার্থান্বেষী চক্র ভেদ করে আসতেই হবে। আমরা যে অন্ধকারে ছিলুম, খানিকটা সেই অন্ধকারেই আছি। যাঁরা নতুন অন্ধকার সরাবার চেষ্টা করছেন তাঁরা বলছেন। আগের কর্তারা বলেনি, এঁরা বলেন। কিন্তু কতকাল বলবেন ? এই ভাল কথা শুনে শুনে জীবনকাল শেষ হয়ে যাবে। আমার নাট্যচরিত্ররা হয়ত বেঁচে থাকবে অ্যাণ্ড ইফ সাম ডে, ইফ দে উইল কাম অ্যাসার্ট, দে উইল্ কাম, দে উইল প্লে দেয়ার রোলস অন দি স্টেজ।

প্রশ্ন : হ্যাঁ। কিন্তু, সেই চক্র ভেদ করেও যে চরিত্রগুলোকে আপনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারা তো জীবিত রয়ে গেছে আপনার নাটকের ভেতর। যে নাটকের মধ্যে দিয়ে গ্রামের মানুষের ঘাম রক্তের গন্ধ আমরা পাই, সেই গ্রামের মানুষ কেমন চোখে নিয়েছে আপনার নাটককে, প্রযোজনাকে ?

উত্তর : গ্রামের মানুষ কিছুটা ভালোভাবে নিয়েছে, কিছুটা বুঝতে পারেনি। কারণ, সমস্ত গ্রামীণ জীবনটা একটা বৃহত্তর বাগানের মত। এর সমস্ত গাছগুলোকেই লালন পালন করতে হয়। ধানের চারাকেও লালন পালন করতে হয়, পাটের ক্ষেতেও নিড়ানি না দিলে পাট বাড়ে না। তেমনি মানুষের জীবনেও। যা আছে সমস্ত নষ্ট করে দেয়। ফলে সেই সমস্ত সদ্‌গুণ বা জীবনবোধ যেটা থাকা উচিত— সেইমত তাদের মধ্যে তার পরিপোষণ হয় না। ফলে সেগুলো বাড়ে না। আর যারা অশিক্ষিত, তারা অনেক জিনিষ বিচার করতে পারে না। যদিবা পারে, তাদেরকে না পারবার জন্য মায়া বিস্তার করা হয়। তবে একটা কথা বলছি, আমার সমস্ত নাটক, নবান্ন থেকে আজ পর্যন্ত যত নাটক,—মধ্যবিত্ত সমাজে কিন্তু সমাদৃত হয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজ খুবই জেনারাস, তারা প্রগতিশীল। কিন্তু যাকে নিয়ে বিডস, সেই মাস্‌ তো আর আমার নাটক দেখেনি। কিছু কিছু হয়ত আংশিক ভাবে, অন্য নাটক যা দেখেছে তার চেয়ে হয়ত আমার নাটক বেশি দেখেছে। বেশী দেখাবার চেষ্টা করে করে দেখিয়েছি। কিন্তু আমার নাটকের চাইতে যাত্রা গান টান তারা অনেক বেশী দেখেছে। সেখানে অপসংস্কৃতির ছয়লাপ হচ্ছে। সেখানে একটা বলিষ্ঠ জীবন বোধ দেবার কোন চেষ্টাই হয় না। ন্যাচারালি আমি যা মালা পেয়েছি— মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। 'আপনি খুব ভালো করেছেন' বলে, কিছু ফুল চন্দন আমাকে দেওয়া হয়েছে— কথায়, মানপত্রে, ইত্যাকার ব্যাপারে। কিন্তু এটা কি ? এটাতো— যারা অপসংস্কৃতির পরিপোষক তারাই আবার সংস্কৃতির পোষক— এটা কি করে হয় ? মধ্যবিত্ত সমাজের সেই রিভোলিউ-শনের জিল্‌ তো নেই। থাকলে দেশের ভাগ্য এবং তার চেহারা অন্যরকম হত। তা কোনও কালে ছিল না আজও নেই। ফাইট করতেই মধ্যবিত্ত সমাজ সব সময় ব্যস্ত। ফলে যে জীবন বোধ তাকে স্ট্র্যাচার দেবে সেই জীবনবোধ তো থাকতে পারে না। তার না আছে ট্রাডিশনালি অ্যাকোয়ারড্‌ নলেজ— তার কিছুই নেই। ফলে হচ্ছে কি আমায় কতকগুলো মালা মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে দিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য তাদের কোন আকুতি আমি লক্ষ্য করিনি।

প্রশ্ন : কিন্তু তারাই তো নবান্ন, দেবীগর্জনের প্রযোজনার জন্য বেশী অ্যাস্পায়াড আপনার কথামতো, তারাই তো বেশী উচ্চাশা পোষণ করছে যে, সমাজ বিপ্লব বা সমাজ পরিবর্তন···

উত্তর : হ্যাঁ, তার ফলেই তো আজ আমার কোন স্টেজ নেই, কোন কিছু নেই, অ্যাক্টরস্‌ নেই। অথচ আমি জানি যে, এই শিল্পী-মহল, দে আর অ্যাস্পায়ারিং ফর মানি অনেক টাকা সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ওরা অপব্যয় করে।— কই আমি, তো পাইনি। আমাকে

সামান্য, কয়েক পয়সা মাত্র দেওয়া হয়েছে। এবং এই শিল্পীরা, যারা শিল্পের স্বরগ্রাম জানে না, অথচ তারা নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে প্রত্যেক স্টেজে— এটা দেখে পিপ্‌ল কি মনে করবে? পিপ্‌লের শিল্পজ্ঞান নেই, তাই তোমরা প্রশস্ত ভাবে লাফ ঝাঁপ করছ স্টেজের ওপরে। তা, নাটকের স্বরলিপি নেই, তাই বলে তুমি এই অনাচার করবে? এ্যাঁ। তুমি একটা ক্লাসিক গাও—রবীন্দ্র সংগীত তোমাকে দু'বছর, চারবছর শিখতে হবে। তুমি যেহেতু কিচ্ছু জান না, মাশরুম সমস্ত গ্রুপস হয়েছে, এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট এর তো সম্পূর্ণ অনীহা। ·· ক্রাইসিসে-এ এই হয় এবং এই হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনার এই অতি উৎকৃষ্ট মৌলিক নাটক গুলির প্রতি আমাদের '৭০ দশকের গ্রুপ থিয়েটার গুলির আকর্ষণ কম মনে হয়। আপনার ধারণা কি?

উত্তর : আমার 'আজ বসন্ত' নাটকটা বহুরূপী, নান্দীকার করতে চেয়েছিল। তাছাড়া, একটু কমার্শিয়াল গন্ধ না থাকলে অন্য কেউ নেয় না। আর এ ব্যাপারে আমারও একটু অনীহা আছে। কারণ অন্যরা কেউ এত খাটা খাটনি করবে না। দে আর নট ট্রেইন্‌ড দেমসেল্‌ভস্ ইন দ্যা ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ড্রামা অ্যাজ আই রাইট এবং অত এক্সট্রা নিয়ে চলাফেরা করা— অত তাঁরা করবেন না। এই ট্রেনিংয়ের ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত। আমার ধারণা এই, জাতীয় জীবনই যখন অবিন্যস্ত, মঞ্চ অত বিন্যস্ত হ'বার কারণ নেই। মানুষের জন্য নাটক। নাটকের জন্য মানুষ নয়। তা সেই, মানুষের দাবীটাই অগ্রগণ্য। আমার যখন টাকা নেই, মঞ্চ নেই, বড় বড় আর্টিস্ট নেই, তা কতদিন কন্টিনিউ বসে থাকব? ন্যাচারালি প্রোডাকশন স্কীম সেই মত করতে হবে। যাই হোক বহুরূপী 'আজ বসন্ত' নিয়ে বলল, 'তোমায় ডাইরেক্ট করতে হবে'। আমি ডাইরেক্ট করব। তা শম্ভুকে বললাম, তুমি একটা চরিত্র কর বুড়ো, আমি একটা করি। আর এ ব্যাপারে ডাইরেক্টরের কথাই শেষ কথা। আর তা যদি মনে না কর, তোমরা পারলে কর। তোমরা নাটকটাই নাও। তা তাঁরা নাটক নিলেন না। আমিও নাটক নিয়ে চলে এলাম। আর নান্দীকারকে আমি দিইনি তখন আমারই করবার ইচ্ছা ছিল। 'আজ বসন্ত' সিনেমায়ও করতে চেয়েছিল। রেডিওতে দিলাম— একটা সাপ-ব্যাঙ্ হয়েছে। ওটা 'আজ বসন্ত' হয় নি, কাল বসন্ত হয়েছে— এই তো প্রোডাকশনের ছি রি।

প্রশ্ন : আপনার আগামী নাটক কি?

উত্তর : হাঁসখালির হাঁস। নতুন নাটক। ভেরী ভেরী এক্সপেরিমেণ্টাল বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক-গত ভাবেও কোনদিন হয়নি। আমার সন্দেহ কোথাও হয়েছে কি না।

দর্শক ও গণনাট্য এবং বিজন ভট্টাচার্য | দর্শন চৌধুরী

উনিশ শতকের ধারা বেয়ে বিশ শতকের প্রথম দুটি দশকের শেষেও বাংলা পেশাদার নাট্যশালায় যে অভিনয়ের গতানুগতিক ধারা তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সখেদ ক্ষোভ একটি সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 'যে ভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যাঁর মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারবে না।'— এই প্রসঙ্গেই তিনি সূক্ষ্মরুচিশীল দর্শকের উপযোগী নতুন একটি নাট্যশালার পরিকল্পনা দেন— 'সর্বসাধারণের জন্যে নয়— যাঁরা ললিতকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান— তাদের জন্যে কি বাংলাদেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না ?···সাধারণ রঙ্গালয় দর্শকদের মুখ চেয়ে যেমন চলছে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না। এখানে যে সব নাটক নির্বাচিত হবে, কলারসিকের উন্নত মনে তা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে। সর্বসাধারণের উপযোগী নয় বলে যে-সব উঁচু-দরের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অচল এখানে অনায়াসেই সেইসব নাটকের অভিনয় সম্ভব হবে। এমন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হলে আমাদের-ও অভিনয় দেখতে সাধ হয় এবং মনের ভিতরে নাটক লিখবারও ইচ্ছা জাগে।'[১]

সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় সম্পর্কে এই কথাই বিশ শতকের একেবারে গোড়াতে (১৯০৩) তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন এবং সেখানে 'লক্ষ্মীর পেঁচাই' যে 'সরস্বতীর পদ্মকে' আচ্ছন্ন করে রয়েছে তা তিনি দেখিয়েছিলেন। তখনকার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে ধরণের সস্তা দর্শক-মনোরঞ্জনের নাটক লিখিত ও অভিনীত হয়েছে, তিনি তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এবং সেই চাহিদায় তিনি নাটকও রচনা করেন নি। তাঁর সাহিত্য গুণ সম্পন্ন সূক্ষ্মভাব ও মার্জিত রসের নাটক তৎকালীন স্থূলভাব, সংঘাত ও সহজ নাট্যক্রিয়ার যুগে স্বভাবতই 'অচল' ছিল। তাছাড়া তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের (যাকে তিনি 'ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ' বলেছেন) নির্দেশনা ও প্রয়োগরীতি কোনটিই তাঁর নাটকের পরিবেশ, ঘটনাবিন্যাস বা চরিত্রচিত্রণের মধ্যে অনুসৃত হয়নি। যে ভবিষ্যৎ কলারসিকের উন্নতমনের কথা ভেবে তিনি নাটক রচনা করেছেন, তা সাধারণ রঙ্গালয়ে ছিল না বলেই, সে যুগে তাঁকে উপেক্ষিত হতে হয়েছে।

উনিশ শতকের নাট্যকারেরা সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে নাটককে ক্রমে ক্ষণস্থায়ী উপভোগ্য করে তুলেছেন। আর এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে শিক্ষিত ও পরিশীলিত মানুষেরা দর্শক হিসেবে আসেনি, এসেছে সাধারণ ভাবনার মানুষেরা। যার মধ্যে ভাঙা সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়িত রুচিহীন বাবু সমাজ, তাদের মোসাহেব ও তল্পীবাহক আধাশিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং কৌতূহলী অথচ অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের কিছুলোক সম্মিলিত হয়েছিল।[২] পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এদের উপযোগী নাটকের জোগান দিতে গিয়ে এই সময়ের নাট্যকারেরা নিঃশেষ হয়ে গেলেন।

অথচ উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা বিশ শতকের প্রথম দিকেই বাংলা উপন্যাসকে শিল্পমর্যাদায় অনেক উন্নত করে তুললেন। কাব্যের ক্ষেত্রে একা রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুসারী কবিবৃন্দ বাংলাকাব্যকে এই শতকের গোড়াতেই নবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্তি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বস্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা এনে দিল। অথচ তখনো বাংলা নাটক উনিশ শতকীয় গতানুগতিক ধারা থেকে মুক্ত হতে পারল না।

১৯১২ খৃস্টাব্দে গিরিশ মারা গেলেন, পরের বছরই দ্বিজেন্দ্রলাল। তারপরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বাংলা নাটক গতানুগতিক হয়েই রইল, নতুনপ্রাণে নতুন নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল না, লেখাও হল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ির আবির্ভাব। কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে পুরোপুরি নট ও নির্দেশকের জীবন গ্রহণ করলেন, এমেচার অভিনয়ের অভিজ্ঞতা সঙ্গে নিয়ে। এতদিন রঙ্গমঞ্চে নটজীবন নিন্দিত ও সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। অধ্যাপনার সম্মানের নিশ্চিত জীবন ত্যাগ করে তিনি গতানুগতিক রঙ্গমঞ্চকে নতুন জীবন দান করতে এগিয়ে এলেন। অভিনয়ের নতুন রীতিতে, মঞ্চোপস্থাপনার নবতর আঙ্গিকে, নাট্যনির্দেশনার সুরুচিসম্মত শিল্পবোধে তিনি রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয়কে নতুন প্রাণ দান করলেন। রুচি, শিল্পবোধ, নাট্যজ্ঞান ও ব্যক্তিত্বে তিনি যে নবত্ব সৃষ্টি করলেন, তাতে সে যুগের শিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন ও পরিশীলিত বিদগ্ধ নাট্যরসিকেরা তাঁর নাট্যশালায় হাজির হলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আবার দর্শকের নতুন মানসভঙ্গী দেখা গেল।

শিশির ভাদুড়ি সৌখীন অভিনয় করতে করতে পেশাদার রঙ্গশালায় এসেছেন। তাঁর সময়ে গতানু-গতিক থিয়েটার শুধু নয়, নবাগত সিনেমা তার নতুন ধরণ, অভিনব কৌশল, সর্বোপরি এ দেশীয় দর্শকের চোখে একেবারে বিস্ময়কর উপস্থাপন, সবকিছু নিয়ে নতুন আকর্ষণ ও আমোদের উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। জীবনবিমুখ ও নিম্নমানের থিয়েটার শিক্ষিত জনমানসে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রথম দিকের সিনেমাগুলিও নেহাৎই বৈচিত্র্যসৃষ্টি ছাড়া শিল্পহিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। একঘেয়ে মৃতপ্রায় থিয়েটার ও সিনেমার শিল্পহীন অভিনবত্ব; রুচিশীল, শিক্ষিত দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থিয়েটার ক্রমশঃ হেরে যেতে থাকল, অন্ততঃ দর্শক আকর্ষণের দিক দিয়ে। শিশির ভাদুড়ি থিয়েটারের এই উভয়ত দুর্যোগের সময়ে পেশাদার রঙ্গশালার নানা প্রতিবন্ধ-কতার ঘেরাটোপের মধ্য থেকেই তার প্রাণদানের দায়িত্ব নিলেন। মনোমোহন নাট্যমন্দিরে 'সীতা'র অভিনয়ের খবর দিয়ে 'নাচঘর' (৬ই-ভাদ্র, ১৩৩১) পত্রিকা লিখেছিল, 'গত রবিবারের 'সীতার অভিনয়

দেখবার জন্যে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে যত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সেবক ও কলাবিদের সমাগম হয়েছিল এর আগে বাংলা রঙ্গালয়ে আমরা তা দেখিনি।' রবীন্দ্রনাথও শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এবং তাঁর নাটক শিশিরকুমারকে অভিনয় করবার অনুমতি দিয়েছিলন। পেশাদার নাট্যশালার জন্ম-মুহূর্ত থেকে যুক্ত অমৃতলাল বসু পেশাদারী মঞ্চের অভিনয়ের হীন অবস্থায় পীড়িত হচ্ছিলেন, তিনি শিশির ভাদুড়ির এই অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানালেন।

বিশশতকের গোড়া থেকেই সমাজমানসের যে ধীরগতি পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাকে স্বভাবগত কারণেই ত্বরান্বিত করল। সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত্য তার ভাব ও ধারণা সমেত ক্রমশঃ বিলীন হতে থাকল, একেবারে শেষ হল না, আর বুর্জোয়া আভিজাত্য অনেকদিন ধরে বাড়তে বাড়তে এইসময়ে বেশ প্রাধান্য পেতে থাকল। শিশিরকুমারের আবির্ভাব এই বুর্জোয়া সমাজ-মানসেরই আবির্ভাব। এই মানসিকতার যে ভালো দিকগুলি পরিবর্তনকামী সমাজ অস্বীকার করতে পারে না, নাট্যশালার ভাবনার পরিবর্তনে শিশিরকুমার সে গুলিকেই কাজে লাগালেন। রবীন্দ্রনাথ যে সূক্ষ্মভাব, উন্নতরুচি ইত্যাদি কথা আমাদের নাট্যশালা সম্পর্কে প্রয়োগ করেছেন, তা ঐ বুর্জোয়া মানসসঞ্জাত। ফলে শিশিরকুমারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তিনি স্বভাবতই তাঁর ভাবের আস্বাদন লাভ করেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার গতানুগতিকতার মধ্যে থেকেই 'উন্নতরুচি ও সূক্ষ্মভাব' চিন্তা মানেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া সমাজের কথাই চিন্তা করা। রবীন্দ্রনাথ এদের ওপরই শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে নির্ভর করতে চেয়েছেন, পরিবর্তনকামী নাট্যশালায় শিশির ভাদুড়ি সেই চিন্তার ধারা বেয়েই নাট্যপ্রযোজনা করেছেন। প্রচলিত জীর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই তার ভালো করতে যাওয়ার সংস্কারবাদী চিন্তার যে ফল হয়, শিশিরকুমারের তাই হয়েছিল। শেষবয়সে 'ঘুঘুবীর' ও 'হালুমগীর' অভিনয়কে ব্যঙ্গ করলেও, তাঁর সমাজমানসিককার শ্রেণীঅবস্থানেই এর বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিলনা। তাঁর সিদ্ধি ঐ পরিসরেই এবং সীমাবদ্ধতাও ঐখানে। খাঁচায় বন্দী শিশিরকুমারের সিংহ গর্জন এখনো ভোলা যায় না।

পরিবর্তনকামী সমাজে সা হি ত্য - শি ল্প লেখা হবে কাদের জন্য এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন মাওৎ-সে-তুঙ্ তাঁর ইয়েনান ফোরাম আলোচনায় (মে, ১৯৪২)। শিল্প-সাহিত্য হবে জনগণের জন্য। এবং জনগণের জন্য যা কিছু তা সব অ ব শ্য ম্ভা বী রূ পে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে হবে। আর বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে যা কিছু তা কখনই জনসাধারণের হতে পারে না। জনসাধারণের ব্যাপক ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক (গণবাহিনী) আর পেটি বুর্জোয়ারা। পর্যায়ক্রমে এদের জন্য শিল্প-সাহিত্যকে পরিচালিত করতে হবে। পেটি বুর্জোয়াদের কথা সবার শেষে, কখনোই প্রথমে নয়। তাদের একেবারেই বাদ দেওয়া যাবে না এই কারণে যে তাঁরা চিন্তায় শিক্ষায় অনেক অগ্রসর। তাদের শ্রেণীর মধ্যে যারা বিপ্লবীদের সম্পর্কে সহানুভূতি সম্পন্ন তাদেরই গ্রহণ করতে হবে।

তাহলে, নাটক জনগণের জন্য হলে, সেই জনগণ কারা আমরা তা বুঝতে পারছি। এবং এরাই যে সমগ্র জনসংখ্যার তিনভাগের বেশি, তাও অস্বীকার করা যাবে না। এই বৃহত্তর জনসমষ্টিকে বাদ দিয়ে

আমাদের নাট্যধারা প্রবাহিত হয়েছে বলে, উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমাবধি বাংলা নাট্যশালা জনজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে নি। এদের বাদ দিয়েই আমাদের নাট্যশালা দাঁড়াতে গিয়েছে বলে প্রায়ই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সমালোচকেরা আমাদের নাট্যশিল্পের 'যুগান্তকারী দিক পরিবর্তন' বলে যখনই কোন ধারা বা যুগ বা ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়েছেন তখনই বুঝতে হবে তার সবটাই হয়েছে ঐ নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থেকেই তার সংস্কারের প্রচেষ্টা। বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে তার যোগ নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের সমাজ-মানসিকতার পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছিল। মোহনদাস করমচাঁদের নেতৃত্বে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হচ্ছিল, তা বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদেরই আশা আকাঙ্ক্ষা সেখানে রূপ পাচ্ছিল। দেশবন্ধু কিংবা নেতাজী যে শিশিরকুমারের নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণবোধ করেছিলেন, তার কারণটা এবার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এর পাশাপাশিই, সাম্যবাদী ভাবনায় সমাজতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ এদেশে ঘটে চলেছিল। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এর মূলে কাজ করছিল। ধীরে ধীরে এ দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শোষণের মধ্যেই কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হচ্ছিল। এই প্রথম এদেশে একটা চিন্তা পরিষ্কার হল যে, জনগণ কারা এবং কাদের জন্য শিল্পসাহিত্য? সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যাদের নিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনও তাদের জন্য। এবং 'সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট হল সামরিক ফ্রন্টের মতই আর একটি ফ্রন্ট'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এবং বৃটিশের শোষণের ও শাসনের নগ্নরূপ সাম্যবাদী চিন্তাকে সংগঠিত হতে সাহায্য করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, হতাশা এবং অন্যদিকে ফ্যাশিস্ট শক্তির অভ্যুত্থান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে দৃঢ়তর করেছে। এ দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি সারা পৃথিবীর ফ্যাশী-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কথাগুলি যত দ্রুত এবং সংক্ষেপে বললাম ঘটনা তত সংক্ষিপ্ত নয়, কিন্তু ঘটেছে দ্রুত। আর এই ইতিহাসক্রম সবারই জানা।

এই সময়কালেই শিশিরকুমারের বেশীরভাগ নাট্যপ্রয়াসগুলি ঘটেছে। তিনি নাটকের বিষয়বস্তু ও ভাবনাকে এই নতুন আলোড়নের কাছাকাছি আনতে পরেলেন না। তবে নাট্যশালার শিক্ষিত, বিদগ্ধ তথা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে তিনি অপাঙ্‌ক্তেয় রঙ্গসমাজকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে নাট্য আন্দোলনের প্রথম ধাপটুকু এগিয়ে দিয়েছিলেন। ওই সময়কার অন্য নাট্যকারেরাও ভাবজগতের এই পরিবর্তনকে ধরতে পারে নি কিংবা পারলেও সঙ্গোপনে তা থেকে সরে থেকে গতানুগতিক নাট্যধারায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। বৃহত্তর জনমানসের প্রাণের সঙ্গে কোন যোগই এরা রক্ষা করতে পারলেন না।

অথচ এই সময়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যের অন্য দিকগুলিতে কত পরিবর্তন দেখা দিল। শুধু ইংরেজি নয়, সমগ্র পৃথিবীর বিচিত্র সাহিত্যের সঙ্গে মানসিক যোগের ফলে বাংলা কাব্য ও উপন্যাস-ছোটগল্পে ভাব-ভাবনা এবং আঙ্গিকের বহুমুখী প্রকাশ ঘটল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে পরাধীন বাঙালী সরাসরি যুক্ত ছিল না। ইংরেজের উপনিবেশ ভারতবর্ষ শাসকের যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ভোগ করেছিল। যুদ্ধোত্তর সারা পৃথিবীতে যে হতাশা, জীবনযন্ত্রণা, মানুষকে জীবন সম্বন্ধে নতুন

করে ভাবিয়ে তুলেছিল তারই প্রকাশ প্রবন্ধে, কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন দারুণভাবে বেঁচে। তিনি আবার নতুন করে আধুনিক হয়ে উঠছেন। অন্যদিকে কল্লোল, কালি কলম ইত্যাদি পত্রিকাকে অবলম্বন করে নতুন সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠতে লাগল; যারা উনিশশতকী জীবনভাবনা চক্রে আবর্তিত হতে চাননি। নতুন যুগের সাহিত্যে তাই সাধারণ ও অন্ত্যজ মানুষ (বর্ণ ও অর্থগত দিক দিয়ে) তার দুঃখ-দারিদ্র্য, বিকৃতি, ব্যাভিচার, জড়ত্ব, কুসংস্কার, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে হাজির হয়েছে। সাধারণ মানুষের বঞ্চনা থেকেই শোষিত জনগণের ওপর শোষণ ও শোষকের চরিত্র ফুটে উঠেছে। ক্রমে শ্রেণী সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ এই সময়ে বাংলা নাটকের সেই পরিবর্তন ঘটলো না। সমসাময়িক পরিবর্তিত নতুন জীবন-ভাবনা থেকে বাংলা নাটক অনেক দূরে রয়ে গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯) চলাকালীন পরাধীন বাঙালীকে যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ভোগ করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক মন্দা, হতাশা, বেকারী। এর ওপরে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ। সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ— বন্যা। মনুষ্যসৃষ্ট এই বিপদ এবং প্রাকৃতিক আপদ— দুয়ে মিলে বাঙালীর জীবন বিধ্বস্ত করে দিল। মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু এর অবশ্যম্ভাবী ফল। কালোবাজারী ও মুনাফালোভী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এই সময়েই (১৯৪২) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'ভারত ছাড়' আগস্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বৃটিশের শোষণ ও অত্যাচার মর্মান্তিকরূপে ভারতবাসী তথা বাঙালীর জনজীবনকে ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্যস্ত করে তুলল। গ্রামবাংলা ধ্বংস হতে থাকল, গ্রামের মানুষ দুটো খাদ্যের আশায় শহরে ভিড় করল। একদিকে শোষিত জনগণের এই মর্মান্তিক হাহাকার, অন্যদিকে শোষকের পেটোয়া ও দালাল মানুষের লোভ লালসা লাম্পট্য— সব মিলিয়ে গতানুগতিক সমাজ জীবনে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল।

কলকাতার পেশাদারী নাট্যশালা তখনো দীপাবলীতেজে জাজ্বল্যমান এবং সমাজ জীবনের এই বিপর্যয় থেকে উটপাখীর মতো মুখ লুকিয়ে সেই গতানুগতিক ঐতিহাসিক, পৌরানিক এবং সামাজিক (উচ্চ বিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজ জীবনের রঙ্গীন ছবি) নাটক অভিনয় করে চলেছে। শিশির ভাদুড়ী এর মধ্যেই স্বভাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্ভব এবং এই সময়কার কম্যুনিস্ট আন্দোলন ও তার সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট এই গণনাট্য সঙ্ঘ লেখক ও সাংবাদিক বিজন ভট্টাচার্যকে নাটক লিখতে কলম ধরিয়েছে। সাহিত্যের অন্য শাখা যেমন প্রগতি লেখক সঙ্ঘের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করছিল, নাটক তেমনি গণনাট্য সঙ্ঘের পতাকা তলেই সঙ্ঘটিত হচ্ছিল। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে বলা হল, 'It is a movement which seeks to make our arts the expression and organism of our peoples' struggle for freedom, economic justice and a democratic culture.[৩]।' এবং এটা পরিষ্কার করা হল যে, গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠবে বিভিন্ন গণআন্দোলনের মাধ্যমে এবং শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য সংগ্রামী শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের যে গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই — এক কথায় সাম্যবাদের লড়াই— তার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে। শ্রেণীচেতনায় তারা কোন পক্ষে, এবং তাদের উদ্দেশ্যই বা কি—এই ব্যাপারে তারা নিজেদের পরিষ্কার করে নিয়েই নাট্যআন্দোলনে নামলেন।

'শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শিল্প-সাহিত্য শ্রেণীসংগ্রামের হাতিহার'—তাদের নাট্যআন্দোলন থেকে এই কথাটা বুঝে নিতে কষ্ট হল না। তাই মনে রাখতে হবে, গতানুগতিক পেশাদারী মঞ্চের আওতার মধ্যে থেকেই তার সংস্কারের প্রচেষ্টায় গণনাট্যের উদ্ভব নয়, তার উদ্ভব হয়েছে সমাজ মানসের এক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারণে।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ নাট্যপ্রযোজনার যে দায়িত্বে এগিয়ে এলেন তাতে নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র, রূপকল্পনা এবং সবার উপরে একটি বিশেষ ভাবাদর্শ, বাংলানাট্য ধারায় নতুন প্রাণাবেগ সৃষ্টি করল। হোমিওপ্যাথী, লেবরেটরী, আগুন, জবানবন্দী কিংবা নবজীবনের গান কিংবা ক্ষুধা ও মৃত্যুর ছায়ানৃত্য যখন পরপর হয়ে চলল, মানুষ তার মধ্যে নিজেদেরই প্রাণের সাড়া পেল। কৃষকজীবন, শ্রমিকজীবন, অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানবজীবন— এগুলিই তার সব বঞ্চনা ও শোষণ নিয়ে মঞ্চে হাজির হল। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, লড়াই, সংগঠন— তাও এসে গেল। নিজেদের বাঁচবার নিরন্তর লড়াইয়ের ছবি এবং তা থেকে উত্তীর্ণ হবার যে পথ তার নির্দেশ এই নাটক, গান বা নৃত্যের মধ্যে লাভ করে সাধারণ মানুষ নতুনকরে বাঁচবার প্রেরণা লাভ করল। নবান্নের সার্থকতা এগুলির সার্থকতারই যোগফল।

তদানীন্তন গণজীবনের দাবীর সঙ্গে এদের নাট্যপ্রয়াস মিলে গিয়েছিল বলেই তাদের প্রচেষ্টা এত আদৃত হচ্ছিল এবং নবান্ন যখন প্রথম অভিনীত হয় (২৪. ১০. ১৯৪৪) তখন স্বাভাবিক সাড়া পড়ে গিয়েছিল চতুর্দিকে। শুধু কলকাতার বা শহরতলীর কিছু বোদ্ধা রুচিশীলদর্শক নয়, গ্রামেগঞ্জে হাটে মাঠে সাধারণ জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এর সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।[৪] এইখানেই গণনাট্যের ক্ষেত্রে নবান্নের ও পূর্বসূরীদের সার্থকতা এবং। এদের আবির্ভাবে শাসক ইংরেজ ও তার ভারবাহী বুর্জোয়া পেশাদারী থিয়েটার কম্পিত হয়েছিল।

বিশেষ ভাবাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে এদের নাটকে সাংগঠনিক দায়িত্ব কাজ করল অনেক বেশি। এবং চিন্তায় নতুনত্ব দেখা দিল অনেক দিক দিয়ে। কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী মানুষের কথা এলো। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে সমষ্টি সত্তা এলো। বস্তুতান্ত্রিক জীবন-ভাবনা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে আস্থা, আবেগ-প্রাধান্য কর্মে বুদ্ধি ও যুক্তির ব্যবহার, শোষক ও শোষিতের শ্রেণী নির্দেশ, একনায়কের পরিবর্তে শোষিত শ্রেণীকে নায়ক করা, সমাজব্যবস্থা ও শাসনযন্ত্রকে খলনায়করূপে চিহ্নিত করা,— এগুলি স্বভাবতই নাটকে গৃহীত হল। সমসাময়িক সমাজ ও মানুষের কথা বলতে গিয়ে এদের সহানুভূতি ও মমত্ববোধ রইলো শোষিত জনগণের পক্ষে। বিষয়বস্তুর এই নতুনত্ব সে যুগে সাদরে গৃহীত হল। আর আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বাংলা নাটকের গতানুগতিক মঞ্চ-উপস্থাপনা ও প্রয়োগ পরিকল্পনার একঘেয়েমি দূর হল। মঞ্চব্যবস্থা, আলো, সাজ, রূপসজ্জা, অভিনয় সবকিছুর মধ্যে সাজুয্য আনা হল; মঞ্চব্যবস্থায় সরলীকরণ হল, ব্যক্তি অভিনয়ের পরিবর্তে দলগত অভিনয়,— সবকিছুর মধ্যে নাট্যনির্দেশকের পরিকল্পনা বিষয় ও আঙ্গিককে একসূত্রে বেঁধে নিয়ে মূল ভাবপ্রকাশের সহযোগী করে তুলতে সাহায্য করল। এবং এই সবকিছু প্রচেষ্টার মূলে তারা ব্রেশ্‌টের মতই বলতে পারতেন, **'Our audience must not hear only how Prometheus was set free, but also train themselves in the pleasure of freeing him.'**

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার (১৯৪২) পর থেকেই তার নাট্যোদ্যোগের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্য নিজেকে যুক্ত করেছেন। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের মে মাসে এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় তাঁর আগুন নাটক মঞ্চস্থ হয়। সেই সঙ্গে বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী' নাটিকাও হয়েছিল। সমাজব্যবস্থার যে পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করেছি তারই প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্যকে নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক অনুসন্ধান করতে হয়েছে। এই নাটকে পাঁচটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে পাঁচজন মানুষকে সেকালীন অবশ্যম্ভাবী রেশনের কিউতে হাজির করিয়েছেন। একটি তুচ্ছ রেশনের কিউতে এই সমাজের বিচিত্র কয়েকটি লোককে এনে সমগ্র সমাজের অসংলগ্ন রূপকে প্রকট করে তুলেছেন তিনি। এবং সেখানেই এই লোকগুলির বিচিত্রস্বভাব এবং সমাজের সঙ্কটের মুহূর্তে এই লোকগুলির কোনক্রমে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াসের তুচ্ছতাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কিন্তু ৫ম দৃশ্যে এসে এই সাধারণ লোকগুলিই জীবনের মুখোমুখি বাঁচবার সংগ্রামের হদিশ পায়। পারস্পরিক তুচ্ছ কলহ ভুলে গিয়ে তারা বলছে—

৩য় পুরুষ—আর মনে করাকরিই বা কেন। যথেষ্ট তো হয়েছে। এখন বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে মিলে মিশে থাকতে হবে ব্যাস্।
হরেকৃষ্ণ—(বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে) এই বুঝটাই এখন দরকার।
৩য় পুরুষ—তাছাড়া কোন উপায় নেই, কোন উপায় নেই।

চলমান কিউ'এর ওপর নাটক শেষ হচ্ছে।

আগুন নাটক থেকে বিজন ভট্টাচার্যের যে নাট্যরচনা শুরু সেটা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা বোঝবার জন্যই এতকথা বলতে হল। সাংবাদিকতার চাকরী ছেড়ে বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য সঙ্ঘে এসেছেন এবং সেখানে যে কতিপয় ব্যক্তি ফুল-টাইমার'-এর বেতনভুক্ত ছিলেন তিনি তাদের মধ্যে একজন। নাটকের মধ্য দিয়ে শ্রেণীসচেতন সমাজ বিশ্লেষণ এবং প্রতিবাদ ও সংগ্রামের জেহাদ ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ করতে চেয়েছিল, বিজনবাবু তারই ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নাট্যরচনায় কলমধারণ করলেন। বাংলাদেশর সেই দুর্যোগের দিনে তিনি বাংলার গ্রামে গঞ্জে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, মানুষের ব্যথা বেদনাকে আত্মস্থ করেছেন, তাদের প্রাণের কান্না কান পেতে শুনেছেন। একদিকে শোষণ, বঞ্চনা এবং অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার— তার জাঁতাকলে পড়ে সাধারণ মানুষের যে কি দুঃসহ জীবনযাত্রা তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। এবং সেগুলিকেই তিনি যখন নাটকে রূপ দিতে এলেন তখন শুধুমাত্র মানবতাবাদী নয় সাম্যবাদীআদর্শের অণুপ্রেরণা তাকে উজ্জীবিত করে তুলেছে। শুধু অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি নয়— একটি বিশেষ জীবনদর্শনও তাকে বিশিষ্ট ভাবনায় ভাবিত করেছে।

আগুনের কয়েকমাস পরেই অভিনীত হয় জবানবন্দী। এ সম্পর্কে নাট্যকারের উক্তি: 'সে-ও এক সোনা ধানের দুঃস্বপ্ন— মাঠের রাজা পরাণ মণ্ডল যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে কলকাতার ফুটপাতে না খেতে

পেয়ে হুমড়ি খেয়ে মরেছিল।' দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে এক গ্রাম্যকৃষকজীবনে এই নাটকের বিস্তার। মহামারী, মৃত্যু, ক্ষুধা, রোগ— নিঃসম্বল এই মানুষেগুলোকে ক্রমে গ্রামছাড়া করে। গ্রাম ছেড়ে আসার বেদনা এবং অভাবের তাড়না মানুষগুলিকে জান্তব করে তোলে। শহরে এসে শহুরে ভদ্দরলোকের নিস্পৃহ ঔদাসীন্য এবং লোভের লালসার শিকার তাদের হতে হয়। মনুষ্যত্বহীনতা, পারস্পরিক সম্পর্কের হানি, পারিবারিক স্নেহ বন্ধনের বিনাশ— মানবতাবোধের এই চরম সঙ্কটের মধ্যেই নাটকের যবনিকা। কিন্তু তাই সব নয়। শহরের ফুটপাতে মৃত্যুমুখী পরাণ মণ্ডল নতুন জীবনের জবানবন্দী করে গেল, যে জবানবন্দীর মধ্যে একটি মাত্র শপথই উচ্চারিত : 'আমার— আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি। সোনা, বেন্দা, সোনা ফলবে, সোনা ফলবে।…' নতুন করে বাঁচবার সংগ্রামে যে সোনাধানের স্বপ্ন নিয়ে পরাণ মণ্ডল মরল, তারই শপথ নিয়ে গ্রামের অন্য মানুষগুলো শক্তচোয়ালে ঘরে ফিরে যাবার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করল।

পরাণ মণ্ডলের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীই জীবনের তাগিদে 'নবান্ন' নাটকে আরো পরিণত রূপ পায়। নাটকের ভূমিকায় (নবান্ন, ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯) নাট্যকার সেকথা স্বীকার করেছেন। পরাণ ফুটপাতে পড়ে মারা গিয়েছিল সোনা ধানের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আর প্রধান সমাদ্দার কিন্তু মরেনি। সে ছিন্নমূল গ্রামবাসীদের আবার গ্রামে ফিরিয়ে এনেছে, সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ('গাঁতায় খেটে') ধান চাষ করে 'ধর্মগোলায়' রেখে সবাই ভাগ করে খেয়ে বাঁচবার নতুন জীবন শুরু করেছে। মন্বন্তর, বন্যা, মহামারী ও আগষ্ট আন্দোলনের বিভীষিকায় যে নাটকের শুরু, গ্রামে ফিরে এসে সেই মানুষগুলিরই আবার সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নতুন করে বাঁচবার প্রচেষ্টা 'নবান্ন' নাটককে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপিত করেছে। মরাগ্রামে আবার নবান্নের উৎসব শুরু হয়েছে। উৎসবের আনন্দ মত্ততার মাঝে কৃষক দয়াল শপথ উচ্চারণ করেছে নবজীবনের……'গতবারের মত এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে, আমার চোখের ওপর থেকে, আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমার বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের! কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।'

প্রস্তুতির ধারা বেয়ে বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' নাটকে গণচেতনার পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। সাধারণ মানুষ তার সুখদুঃখ, উৎসব আনন্দ· এসব নিয়ে থাকলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক চক্রান্তে মানুষের শোষণ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে এবং অসহায় হয়ে বিচ্ছিন্ন ঘুরে বেড়ালে সে অত্যাচার যে আরো মর্মান্তিক হয়ে ওঠে তা এ নাটকে যেমন আছে, তেমনি আছে জীবনের অভিজ্ঞতায় সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে সাধারণ মানুষও কি করে সোনাধানের স্বপ্নকে সত্য করে তুলতে পারে। এর জন্য কোন রাজনৈতিক শ্লোগানের দরকার নেই। বিজনবাবুর কৃতিত্ব, তিনি তৎকালীন সমাজজীবনের বাসনা ও কামনাকেই জীবনের অভিজ্ঞতায় রূপায়িত করেছেন। শোষিত জনগণের বাঁচবার অনুপ্রেরণা

নিয়েই তো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ গড়ে উঠেছে, সে তো জীবনেরই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্ট। এখন এই জীবনের তাগিদকে যদি কেউ রাজনৈতিক শ্লোগান সর্বস্ব বলে ঘোষণা করেন, তখন বুঝতে হবে তিনি নিঃসন্দেহে কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নাটককে মানুষের জীবন-বিমুখ করে তুলতে চাইছেন। এই নাটকগুলিতে বিজন ভট্টাচার্য কয়েকটি দিকে আমাদের আকৃষ্ট করছেন। বিদেশী শাসনের অত্যাচার, শোষণ, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণাম দুর্ভিক্ষ, তার ওপর দালাল, পাইকার, মহাজনদের লোভ-লালসা, চরম সঙ্কটে মধ্যবিত্ত শহরবাসীর আত্মসুখ সন্ধান ও ব্যক্তিস্বার্থরক্ষার সঙ্কীর্ণতা— এইসব মিলিয়েই সাধারণ মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণা ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং এর থেকে পরিত্রাণের একটিই পথ এবং তা হল ঐ 'জোর প্রতিরোধ'।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে দুটো ছোট নাটিকা বিজন ভট্টাচার্য লিখেছেন। কলঙ্ক ও মরাচাঁদ। 'কলঙ্কে' রয়েছে বাঁকুড়া অঞ্চলে সাঁওতাল জীবনের কাহিনী। যুদ্ধের সময়ে আগত গোরাসৈন্যের লালসার শিকার হতে হয়েছে মঙ্গলার বউ রত্নাকে। সদ্যোজাত সন্তানের গৌরবর্ণ সবাইকে এই অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিম ঐতিহ্যে সাঁওতাল পল্লীর সবাই এই সন্তানকে মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু তাদের মোড়ল তাদের কাছে নতুন কথা শোনায়, বলে, ছেলেটিকে মারলেই এর সমাধান নেই, বরং এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে হবে। জীবনের অভিজ্ঞতায় আবার সেই প্রতিরোধের কথা। বাঁচবার কথা। আর মরাচাঁদে রয়েছে বর্তমান সমাজ জীবনের দুর্বিসহ পরিবেশে ঐকান্তিক সঙ্গীত শিল্পীর বেদনা এবং তার থেকে উদ্ধারের কাহিনী। অন্ধ-শিল্পী পবন তার বউ রাধাকে নিয়ে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। পবনের মনে রয়েছে গানের বিষয়বস্তু ও সুরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। তাই সে যুগের হুজুগে কেতকদাসের মত পদাবলী কীর্তনকে স্থূল লালসার গানে পরিণত করতে পারে না, ফলে দুর্দশা আরও বাড়ে। রাধা নতুন হাতছানিতে পথ ভোলে। পবন হতাশায় আরও ভেঙে পড়ে। কিন্তু গ্রামের মানুষকে দুঃখ দারিদ্র্য থেকে বাঁচবার নতুন কথা যিনি শেখান, সেই শচীনবাবু তাকে খাদ্যের দাবীর সভায় গান গাইতে নিয়ে যায়; ব্যথাহত একক ব্যক্তিজীবনের গান তার বুভুক্ষু সাধারণ মানুষের প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে, তাকে নতুন জীবনে উদ্বুদ্ধ করে। এবং নতুন করে আমাদের মনে পড়ে যে, গণসংস্কৃতিকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সাম্যবাদী সংগঠন, ব্যক্তি প্রচেষ্টা নয়।

এর অনেকদিন বাদে 'গোত্রান্তর' লেখা হয় (প্রকাশ-১৯৬০)। যুদ্ধের পরবর্তী স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক চক্রান্তে দেশবিভাগ মানুষের জীবনের মর্মমূলকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিল। পূর্ব বাঙলার এই ছিন্নমূল মানুষগুলির হতাশা নিয়ে, জীবনবোধ নিয়ে, ব্যথা ও সংগ্রাম নিয়ে অনেক নাটক লেখা হতে থাকে। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা (১৯৪৭), ঋত্বিক ঘটকের দলিল, সলিল সেনের নতুন ইহুদী প্রভৃতি নাটকগুলি বাঙালীর সমাজজীবনের এই নতুন অভিসম্পাতের কার্যকারণ, তার বেদনা, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের নতুন অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকে। গোত্রান্তরে নাট্যকার উদ্বাস্তু হরেন মাস্টারের সংসারের বস্তীজীবন বর্ণনা করেছেন এবং কিভাবে কন্যা গৌরীর সঙ্গে শ্রমিক কানাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল তাও দেখিয়েছেন। কিন্তু তার উপরে রয়েছে মধ্যবিত্ত জীবনের নিজেকে বাঁচিয়ে চলার নির্মম চিত্র, বস্তীজীবনে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, নীচতা, মহত্ব, সহানুভূতি। এবং সবার উপরে রয়েছে

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে মধ্যবিত্ত মানসিকতা তার সব ঐতিহ্য সংস্কার ও জীবনবাদিতা থেকে সরে গিয়ে শ্রমিকের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে সব মানসিক বিভেদ ভুলে। এবং জীবন অভিজ্ঞতার কঠিন সংগ্রামে মধ্যবিত্ত হরেন মাস্টার বস্তীবাসীর উচ্ছেদের দিনে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এই জীবন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং ভাঙা বস্তীকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে : 'বিয়া গেছে কাইল, আইজ হইব বাসি বিয়া। কোন রাজার বেটার বিয়ায় এমন ধুম হইছে কইতে পার বুড়ি— এত বাজনা-এত বাইন্থ-হেই বিশ্বকর্মার পুতের দল, চুপ কইর‍্যা দাঁড়াইয়া আছস— হাত লাগাইতে পারস না তরা— হাত লাগাও কাম কর— উঠাও বস্তি।' —ঘর গড়ে উঠতে থাকে হাতে হাতে নতুন জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে।
'অবরোধ' নাটকে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক : মালিকের লীলা-বিলাসের জীবন এবং শ্রমিকের বিদ্রোহ চেতনা পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। 'দেবীগর্জন' নাটকে আবার গ্রামীণ জীবনের পরিবেশে জোতদারের অত্যাচার, কৃষকের অসহায়তা এবং শেষ অবধি কৃষকদের সম্মিলিত প্রতিরোধে অত্যাচারী জোতদারের পতন, বস্তুনিষ্ঠ জীবন-দর্শনের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। নাট্যকার শেষে কৃষকদের হাতে জোতদারের পতন একেবারে দেবীদুর্গার অসুরনিধনের কম্পোজিশানে ঐতিহ্য ও সংগ্রাম নতুন ডাইমেনশান লাভ করেছে। 'গর্ভবতী জননী' কিংবা 'চলো সাগরে' এবং 'হাঁসখালির হাঁস' নাটক তারই রচনা। তিনি এখনো সৃষ্টিশীল। নতুন নাটকের সম্ভাবনা তাঁর এখনো রয়েছে।

৩ ▭

কম্যুনিস্ট পার্টির আওতায় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ তার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের অংশ হিসেবে নাট্য প্রযোজনা করে এসেছে। বিজন ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাটক রচনা করেছেন এবং তাঁর নাটককে তিনি গণসংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মীরই তখন একই উদ্দেশ্য ছিল। তার জন্যে ত্যাগস্বীকার, কৃচ্ছ্রতাবরণ, দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ কোনটাকেই তারা বড় করে দেখেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি অবধি সময়কালে নাটক গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কৃষকের সাদর সম্বর্ধনা লাভ করেছে। এই দর্শকশ্রেণীর আরো কাছাকাছি আসবার প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে গেছে। সেই খানেই গণনাট্য এবং তার আন্দোলনের সার্থকতা। বিজন ভট্টাচার্য এর সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নতুন পরিস্থিতিতে এই নাট্যকর্মী দলের অনেকেরই মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কারণ অনেক। তবে কয়েকটি কারণ উল্লেখযোগ্য। এক, নাট্যকর্মীদলের অনেকেই রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন না, নাটকের শখেই এসেছিলেন। দুই, স্বাধীনতার পর কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল (১৯৪৮), ফলে রাজনৈতিক ভূমি কম্পিত হওয়ায়, তার সাংস্কৃতিক ওপরতলাও কেঁপে গেল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাধিক্যের ফলেই এটা সহজে হল। তিন, নতুনশাসক সরকার পুঁজিবাদী শাসনকে কায়েম করতে চাইল বলেই, সাম্যবাদী চিন্তা ও তার সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে আঘাত হানতে শুরু করল; নতুন সরকারের স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করতে অনেকেই সেদিকে ঝুঁকলেন। চার, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ল। পাঁচ, বাংলা নাটক কলকাতা

কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের দ্বারস্থ হয়েই খুশি থাকতে চাইল।

নাটকের শখে যারা নাটক করতে চান তারা স্বভাবতই বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শের আওতায় ঝাঁফিয়ে পড়বেন। তাদের কাছে শিল্প হচ্ছে শ্রেণী ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে। এমন একটা ভাব নিয়ে তারা নাটকের সামাজিক বৃহত্তর দায়িত্বকে এড়িয়ে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া সংস্কৃতির পক্ষেই কাজ করতে চান। বাংলা নাটকে আবার সেই সূক্ষ্মভাব ও রুচিশীল দর্শকের কথা এসে গেল। নাট্যশিল্প ক্রমেই আবার পেটিবুর্জোয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের রসভোগ্য পণ্যে পরিণত করার চেষ্টা হতে লাগল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নতুন শাসকদল এটিই চেয়েছিলেন এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কার্যকলাপকেও স্তিমিত করে দিতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনদেশে তাদের অনেক নাটকের অভিনয়ই বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন থেকেই সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে গণনাট্য কর্মীদের একাংশ নাটককে ললিতকলার ভাববাদী চিন্তায় কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী দর্শকের মানস উপযোগী করে তুলতে চাইলেন। গণ-আন্দোলন থেকে নাটক বিচ্যুত হল। বুদ্ধিচর্চার বিলাসে 'নবনাট্যে'র সূত্রপাত হল। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ভাবাবাদর্শে সেটা সম্ভব নয় বলেই তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন নাট্যদল খুলতে লাগলেন। পাশাপাশি পেশাদার থিয়েটার নিজেকে টিঁকিয়ে রাখতে পুরনো ধারারই জের টেনে রাখলেন। সুবিধে মত নবনাট্যের বিষয়কে তাদের নাটকেও আনলেন, ওখানকার অভিনেতা অভিনেত্রীকে পয়সা দিয়ে অভিনয় করিয়ে নিতে লাগলেন, অস্তিত্বের তাগিদে চলচ্চিত্রের গ্লামার সর্বস্ব অভিনেতা অভিনেত্রীদের আনা হল। পঞ্চাশের দশকে এসে দেখা গেল স্টার থিয়েটারের শ্যামলী নাটক পাঁচশো রজনী অভিনয় অতিক্রান্ত হল। অপেশাদার নবনাট্যের দলগুলির সঙ্গে পেশাদার মঞ্চের নাট্যচিন্তায় তফাৎ অনেক, কিন্তু অন্তর্লীন ভাবে সমাজচিন্তায় কোথায় যেন একটা মিল রয়ে গেল।

নবনাট্য আন্দোলন বৃহত্তর বাংলার প্রাণের সাহচর্য হারিয়ে ফেলল। সাম্যবাদীর খোলস চাপিয়ে এরা যতই চীৎকার করুক প্রকারান্তরে এরা বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে কাজ করে চলেছেন। অন্য দিকে গ্রাম বাংলায় শহরতলীতে জনগণের জন্যে গণনাট্য ভাবনায় যে নাট্যপ্রয়াস নিরন্তর চলেছে তার খবর রাখছে কে? নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গেলে তাদের কথা নতুন করে লিখতে হবে। কিন্তু লেখে কে? কেননা, যা কিছু প্রচার, সমালোচকের স্তুতি, এবং সরকারী আনুকূল্য ও সংবাদ পত্রের ভজনা, সব জুটছে অতি সুপরিকল্পিতভাবে এই নবনাট্য কিংবা সৎনাট্যের ধ্বজাধারী দলগুলির ভাগ্যে। 'জগন্নাথ' এবং 'Friends' দেখা যখন একই বুদ্ধিচর্চায় পাশাপাশি অবস্থান, তখন গণনাট্যের ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের মুখ লুকোবার জায়গা কোথায়? যে জনগণকে দর্শক করে আলোচনা শুরু করেছিলাম, বাংলার নবনাট্য ও সৎনাট্য-র ধারা তাদের থেকে আজ অনেক দূরে।

পিপলস্ থিয়েটারের ধর্ম ও জন-সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রমা রলাঁ কয়েকটি সূত্র বলেছিলেন। এক, এই শ্রেণীর নাটককে সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করতে হবে, তাতে বৈদগ্ধ্যগুণ ক্ষুণ্ন হলেও ক্ষতি নেই। সাধারণ জনগণের প্রাণের কথা তাদের সহজসাধ্য প্রমোদের মাধ্যমেই বলতে হবে। দুই, দর্শকদের উজ্জীবিত করে তাদের নতুন জীবনভাবনায় অনুপ্রাণিত করতে হবে।

বিভিন্ন শিল্পকলার দোহাই দিয়ে সেখান থেকে থিয়েটারকে সরে যাওয়া চলবে না। তিন, অবশ্যই এই থিয়েটারকে উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে, শিল্প উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে না— একথা পিপল্‌স্ থিয়েটারের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। জীবনের আনন্দের মাধ্যমে দর্শককে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় সচেতন করে তুলতে হবে। মোট কথা রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়েই আধুনিক থিয়েটার পিপল্‌স্ থিয়েটারে পরিণত হবে। সমাজতান্ত্রিক দেশে শহুরে নাট্যদলকে তাই বছরের নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামে গঞ্জে গিয়ে অভিনয় করে আসতে হয়। 'কল শো'য়ে গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে মোটা টাকা মুনাফা করে ফিরে এসে কলকাতায় নিশ্চিন্ত সুখে শীত তাপ-নিয়ন্ত্রিত মঞ্চে আরো অভিনয় করবার যে প্রয়াস এখনকার শহুরে নাট্যদলগুলির মধ্যে রয়েছে, তা নিশ্চয় ঐরকম ব্যাপার নয়।

এত কথা বলতে হল বিজন ভট্টাচার্যের তিনদশকের ওপর নাট্যরচনা প্রযোজনা ও অভিনয়ের কথা মনে রেখে-ই, তাকে পিপল্‌স্ থিয়েটারের প্রবক্তা ভেবেই। চল্লিশের দশক অবধি তিনি গণনাট্যে নিয়োজিত, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের আওতাতেই তাঁর বিকাশ। পঞ্চাশের দশক থেকে তিনি কি দ্বিধাগ্রস্ত। 'কমুনিস্টপার্টি আমাকে নাটকার করছে' এ কথা পরিবর্তন করতে তিনি কি আগ্রহী হয়ে পড়লেন। এবং এক সাক্ষাৎকারে বললেন, 'আমরা মানুষকে প্রস্তুত করে তুলেছিলাম মানবিকতার দৃষ্টিথেকে।'[৫] বেশ বোঝা যায় মানবিকতার দৃষ্টি শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিয় হলে যে পরিপূর্ণতা পায়, এবং তাঁর গোড়ার দিকের নাটকে তা পেয়েওছিল, এবারে সেটাকে তিনি অস্বীকার করতে চাইছেন। মানবিকতার মধ্যবিত্তসুলভ ভাবনায় তিনি নিয়োজিত হচ্ছেন। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি সেখানে ক্যালকাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন এবং নবনাট্যের প্রয়াসে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর পরিমণ্ডলে গিয়ে পড়লেন। সেখানে শুধু বিষয়বস্তু নয়, তার উপস্থাপন এবং অভিনয়রীতিও বিদগ্ধর দুয়ারে হাজির করলেন। ষাটের দশক থেকে আজ সাতাত্তর সাল অবধি বিজন ভট্টাচার্য এখনও সক্রিয় কিন্তু সে ঐ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর পরিমণ্ডলে। 'কবচ-কুণ্ডল' নাট্যদল করে ভাবাশ্রিত উর্ধ্বায়ণের প্রচেষ্টায় তিনি এখন মগ্ন। গণনাট্য থেকে আগেই সরেছিলেন, এবার প্রস্তুতির অভাবে বুদ্ধিজীবীদের থেকেও দূরে চলে যাচ্ছেন। তাই কি 'চলো সাগরে'র অভিনয়গুলিতে মঞ্চের ওপর যত লোক, অডিটোরিয়ামে তার চেয়ে কম লোক থাকে। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্নের, দেবী গর্জনের স্বতঃস্ফুর্ত জন সংশ্রব ও সম্বর্ধনা আজ যেন বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের বন্ধ্যামরুতে হারিয়ে যাচ্ছে; এঁকে বাঁচাতে গেলে একমাত্র গণনাট্যের নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য-ই পারেন আর কেউ নয়। পারেন, না কি বিজন ভট্টাচার্য নতুন করে পিপ্‌লস্ থিয়েটারে উঠে এসে বজ্রমুঠ হতে? ▭

নির্দেশিকা :

১। নাচঘর, ৩রা জুন, ১৯২৭। ২। দর্শন চৌধুরী—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকে দর্শকে প্রভাব, চতুষ্কোণ ১২ বর্ষ, সংখ্যা ৩-৪। ৩। IPTA Bulletin, No—I, 1943. ৪। সুধী প্রধান—নবসংস্কৃতি ও গণনাট্য প্রসঙ্গে, প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইস্তাহার, ১৯৩৫। ৫। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বহুরূপী—৩৪।

জনপদের জাগরণ : বিজন ভট্টাচার্যের উপন্যাস | সুবীর রায় চৌধুরী

'নবান্ন' (১৯৪৪)-র নাট্যকাররূপে বিজন ভট্টাচার্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হ'লো তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জনপদ'। লেখক হয়তো ভেবেছিলেন এর পর থেকে নাটক এবং উপন্যাস, দুটো শাখাকেই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার মাধ্যম করবেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'রাণী পালঙ্ক'র জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হলো দীর্ঘ পনেরো বছর। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'সোনালী মাছ' (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) বরং অপেক্ষাকৃত কম সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। 'জনপদ' প্রকাশের এক বছর পরে বেরোয় তাঁর গল্পসংগ্রহ 'জলসা' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) যেগুলির রচনাকাল ১৩৪৬ থেকে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ। 'জলসা'-র গল্প এবং স্কেচগুলির বিষয় প্রধানত শহুরে মধ্যবিত্ত জীবন। পটভূমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এক হিসেবে বিজন ভট্টাচার্যর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস নাটকের কালসীমা নির্দেশ করা যায় ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের শহর অথবা গ্রাম-বাঙলা। বিষয়ের বিবর্তনের দিক থেকে যেটি চোখে পড়ে তা হ'লো তিনি ক্রমশ শহর থেকে গ্রামে, মধ্যবিত্ত থেকে চাষী অথবা অন্যবৃত্তির গ্রামীণ মানুষের দিকে ঝুঁকছিলেন। অবশ্য 'সোনালী মাছ'-এ এসে আবার তাঁর বিষয়ের বদল হ'লো— তিনি বেছে নিলেন ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত নানা বিছিন্ন ব্যক্তিত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব। স্পষ্টতই এ-জগৎ বিজন ভট্টাচার্যের সাহিত্যের পরিচিত বৃত্তের বাইরে। অন্যদিকে 'জনপদ'-এর কাল তেভাগা আন্দোলনের কাছাকাছি আর 'রাণী পালঙ্ক'-র পটভূমি দেশ বিভাগের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। বিজন ভট্টাচার্যের উপন্যাসগুলি পড়লে তাঁর নাটকগুলির সঙ্গে কতকগুলি পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। নাটকে তাঁর প্রবণতা হ'লো ব্যক্তির শ্রেণীসত্তাকে প্রাধান্য দেওয়া, ব্যক্তিজীবনের চেয়ে গোষ্ঠী জীবনকে গুরুত্ব দেওয়া। 'মরাচাঁদ' (প্রকাশকাল ১৩৭৫ : রচনাকাল ১৯৪৬-৫২ খ্রী) নাটকেও অন্ধ গায়ক পবন শেষ পর্যন্ত হ'য়ে ওঠে প্রতিরোধের প্রতীক। ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতাকে বৃহত্তর যৌথজীবনের পটভূমিতে দেখানো তাঁর প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত তাঁর নাটকগুলিতে শাদা-কালোর ভেদরেখা খুব স্পষ্ট। তৃতীয়ত, নাটকে স্ত্রী চরিত্র রূপণে তিনি ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের চেয়ে নিপীড়ক নিপীড়িতের ভূমিকার ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেন। উপন্যাসে তাঁর মনোযোগ অনেক বেশি সংহত ব্যক্তির ওপর।

স্পষ্টই বোঝা যায়, বিজন ভট্টাচার্য নাটক থেকে উপন্যাস রচনায় মন দিয়েছিলেন শুধু বৈচিত্র্যের তাগিদে নয়, ব্যক্তিকে পূর্ণতরভাবে দেখা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, নাটকের মাধ্যমে ব্যক্তির চিত্রণ কি সম্ভব ছিলো না? বলা বাহুল্য বহু নাট্যকারই তা করেছেন এবং পেরেছেন। কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের কাছে নাটক বিশেষ অর্থে 'সমবেত শিল্প' আর হয়তো সেই কারণেই তাঁর নাটকে সমবেত জীবন অধিকতর প্রাধান্য পায়। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের আবির্ভাব। নাটকে তাঁর অংশগ্রহণ কেবল নাট্যকাররূপে নয়, অভিনেতা ও নির্দেশকরূপেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার নাটক। নাটক যখন অভিনীত হয় তখন অনেকে অংশগ্রহণ করেন, অনেক দর্শক একসঙ্গে থাকে। অন্যদিকে একটি উপন্যাসের অসংখ্য পাঠক থাকতে পারে, কিন্তু পড়ার অভিজ্ঞতা প্রত্যেক পাঠকের নিজস্ব। সেই কারণে বিজন ভট্টাচার্য দুটি ভিন্ন মাধ্যমকে ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছেন।

তবে যে রাজনৈতিক বোধ এবং সমাজচেতনা তাঁর নাটকের প্রধান লক্ষণ তা থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু নাটকীয়তার তুলনায় এখানে ঝোঁক উন-কথনের দিকে, আকস্মিকতার চেয়ে অনুপুঙ্খের দিকে। 'জনপদ' উপন্যাসটি প্রথমে আলোচনা করা যাক। নাম 'জনপদ' হ'লেও কাহিনী শুরু হয় পারিবারিক চিত্রণের মধ্য দিয়ে। সচ্ছল অম্বিকাচরণের সংসারে আছে দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা মালিনী, প্রথম পক্ষের পুত্র কালীচরণ। প্রথম পক্ষের কন্যা দুর্গার বিয়ে হ'য়ে গেছে গোবর্ধনের সঙ্গে। তা সত্ত্বেও সচ্ছলতা মানে পূর্ণতা নয়। আপাতভাবে তিনজনের নিরুপদ্রব সংসার কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। বৃদ্ধ অম্বিকাচরণের সঙ্গে স্ত্রী-পুত্রের সমান দূরত্ব। আর মালিনীর পতিদেবতা বিষয়ে অনুভূতি নিচের বর্ণনাতে স্পষ্ট:

> অম্বিকাচরণের উচ্ছিষ্ট থালায় কোনমতে দুইটা মুখে দিয়া উঠিতে মালিনীর কোনোদিন বেলা আড়াইটা-তিনটা বাজিয়া যায়। পতি পরম দেবতার থালায় খাইতে বসিয়া মালিনীর অন্নপ্রাসনের ভাত উঠিয়া আসিতে চায়। তবু খাওয়ার সময় প্রায়ই পাশের বাড়ির লাহিড়ীগিন্নী চপলাসুন্দরী কিংবা তাঁর আইবুড়ো মেয়ে সুনন্দা আসিয়া বসেন। মালিনীর অম্বিকাচরণের থালায় না খাইয়া উপায় কি। বিজ্ঞ চপলাসুন্দরী মনে-মনে তাহার অরুচির ব্যাখ্যা করেন ভিন্নরূপ। অকারণে তিনি চোখ দুটো বড়-বড় করিয়া মালিনীর সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করেন। আর মালিনী লজ্জা ও ক্ষোভে রাঙা হইয়া মরমে মরিয়া যায়। (পৃ: ৯-১০)

অথবা

> বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়া তন্দ্রাতুর মালিনীর সময় কাটে শুধু দাবনার উপর জঙ্গলের মশা মারিয়া আর পা চুলকাইয়া। কতদিন যে তাহার আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করে।
>
> (পৃ: ১২)

পুত্র কালীচরণকেও বুঝতে পারে না অম্বিকাচরণ। সংসারে নিস্পৃহ, বিষয়কর্মে উদাসীন— নিজেদের জমি-জায়গা সংরক্ষণে মন না দিয়ে চাষী-মঙ্গল এবং অন্যান্য সমাজসেবায় উৎসাহী। কিন্তু :

> অম্বিকাচরণের সঙ্কল্প, তিনি কালীচরণকে পুত্র হিসাবে তাহার অবশ্য করণীয় কর্তব্য সমঝাইয়া ছাড়িবেনই। আর কালীচরণেরও জিদ, চোখে আঙুল দিয়া পিতৃত্ব আর মালিকীস্বত্বটাই যে ঠিক এক জিনিস নহে তাহা দেখাইয়া দিবে। (পৃ: ১২)

পিতা-পুত্রের এই স্নায়বিক টানা-পোড়েনের মধ্যে অম্বিকাচরণ একদিন মারা যায়। কালীচরণ আরো বেশি ডুবে যায় কৃষক আন্দোলন ও চিকিৎসাব্রতে। তারপর পাঠকের সামনে ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয় ব্যক্তিগত সম্পর্কের নানা জটিলতা। পিতার মৃত্যু উপলক্ষে আসে দুর্গা এবং গোবর্ধন। গোবর্ধন শাশুড়ির নিঃসঙ্গতায় খুবই উদ্বিগ্ন— সে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়। বলা বাহুল্য এ-উদ্বেগ শাশুড়ির প্রতি জামাইয়ের বিষাদ কর্তব্যবোধ থেকে উদ্ভূত নয়, ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে তার অতি-মনোযোগই দুর্গার অস্বস্তি আর মালিনীর আশঙ্কার কারণ হ'য়ে ওঠে। এমনিতে মালিনী মিতভাষী, নিজের সুখ-দুঃখের ভাগ সহজে কাউকে দিতে চায় না। কিন্তু তার জীবনেও কি পিছুটান নেই, কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা ? সতিনপুত্র কালীচরণের সঙ্গে তার কথাবার্তা হয় ভাববাচ্যে, অবশ্য তার ভাবজগতের কোনো সন্ধান কালীচরণ রাখে না। নিরুপায় নিঃসঙ্গ মালিনী তাই খোঁজে অলৌকিক পথ— বশীকরণের। কালীচরণের প্রতি মালিনীর তীব্র অনুভূতি লেখক বর্ণনা করেন অত্যন্ত নিচু তারে :

> আর জাগিয়া থাকে মালিনী। শুইয়াছে সেই কখন, অথচ এত রাত হইয়া গেল ইহার মধ্যে দুই চোখের পাতা এক করিতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া একটু তন্দ্রার ঢল আসে কি অমনি কালীচরণের আড়বাঁশি বাজিয়া ওঠে। মালিনী আর ঘুমাইতে পারে না।
> শুইয়া শুইয়া মনের গহনে শুধু বাঁশির সুরের রেশ টানিয়া চলে।
> মালিনী ভাবে, কালীচরণের বাঁশি বাজাইবার তুলনা হয় না। অন্য সময় হইলে মালিনী তাহাকে 'পরাণ বধুঁয়া' গানটি বাজাইতে বলিত। (প: ৫১)

যে প্রেম লৌকিক নয়, যে প্রেম অব্যক্ত এবং ব্যর্থ, তার সার্থকতা সে খোঁজে অলৌকিক উপায়ে :

> পদ্মাবতী মন্ত্রপূত শিকড়টি মালিনীর হাতে দিয়া বলে, এই নে, থেঁতলে ডাল তরকারির সঙ্গে মিশিয়েই পারিস আর যেমন করেই পারিস এটা খাইয়ে দিস। আর এই ছাখ— পদ্মাবতী মালিনীর হাতে কালীচরণের কুশপুত্তলিটি দিয়া বলে, এটা কিন্তু কখখনো কাছ-ছাড়া করিসনি। শনের সুতোয় শক্ত করে বেঁধে কোমরে ধারণ করিস।
> —কতদিন ধারণ করতে হবে !
> —যতদিন না···
> —ও বুঝলাম। (পৃ: ১৩১)

তার এই ব্যর্থ প্রেমের একজন শরিকও আছে— সে পড়শির মেয়ে সুনন্দা। সুনন্দা যে কালীচরণকে জয় করেছে তা নয়। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মে, সমাজসেবায় সুনন্দা কালীচরণের অনেক কাছাকাছি।

ইতিমধ্যে ঘিওরের বিলে খালকাটা উপলক্ষে জমিদার-কৃষক সংঘর্ষে কালীচরণ গ্রেপ্তার হয়। মালিনী তখন কলকাতায় জামাতার গৃহে। জেলের মধ্যে কালীচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর সুনন্দার প্রেম বৃহত্তর জগতে সার্থকতা পায়— প্রেমিকের অকৃত কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব সে নেয়। অন্যদিকে মালিনী শতনামপুর গাঁয়ে ফিরে আরো শূন্য আরো নিঃসঙ্গ বোধ করে। সুনন্দা সম্পর্কে তার ঈর্ষা, কালীচরণ সম্পর্কে তার ব্যর্থতাবোধ। স্নায়বিক উত্তেজনায় তার প্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে— ভাবে আত্মহত্যাই তার পরিত্রাণের পথ। যে কোনো মানুষের সঙ্গ তার কাছে অসহ্য, অথচ একাকিত্বেও তার আতঙ্ক। ব্যর্থতাবোধ কি সুনন্দার জীবনে নেই? — কিন্তু সে মুক্তি পেয়েছে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে আত্মস্থীকরণে। তাই মালিনী তার শরিক নয়, সহকর্মী। সেই মুক্তির পথ সে দেখায় মালিনীকে:

> অনুকম্পা মালিনীর অসহ্য ঠেকে। মানুষ খালি ছি ছি করিবে, অথচ ভিখারীর মতো তাহাকে আবার সেই মানুষের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকিতে হইবে— এ অসম্ভব।
> অনিরুদ্ধ আবেগ হঠাৎ দারুণ আক্ষেপে টন টন করিয়া ওঠে মালিনীর কণ্ঠে, আমি তা হলে কি করবো তুই বলতে পারিস সুনি?
> জাগ্রত জনপদের হৃদপিণ্ডটা যেন দ্রুততালে নাচিয়া ওঠে সুনন্দার বুকের মাঝখানে। বলে, পারি। কিন্তু তুমি কি পারবে জেঠিমা?
> +
> ...বলে, সেই ঘিওরের খাল, শতনামপুরের কলঙ্ক!
> —জানি!
> —সুজা নদীর জলে আজ সেই কলঙ্ক ধুয়ে মুছে যাবে, জেঠিমা?
> —চল, আমরা হাত লাগাইগে।
> —চল। (পৃ: ২৬১-৬৩)

তারপর 'শত শত কোদালির তালে তাল রাখিয়া মালিনী দুইহাতে মাটি খুঁড়িয়া মুঠা মুঠা ধুলা খালের ডাইনে বামে ছিটাইয়া দিতেছে।' এমনিভাবে ব্যক্তি মিশে যায় দলে— ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে নয়, কিন্তু বৃহত্তর পরিধিতে মানবিক সম্পর্কগুলি সহজ হ'য়ে আসে। উপন্যাসের শুরুতে যে গানের কলি শুনি, 'জাগো জাগো নগরবাসী নিশি অবসান রে—,' তার একটা বিশেষ মানে যেন আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ব্যক্তিকে নিয়ে জনপদের জাগরণ হয়।

পাঠকের মনে থাকতে পারে 'জনপদ' এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'-র প্রকাশকাল একই বছর। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা 'জাগরী'— বহু বিতর্কিত কংগ্রেস কমিউনিস্ট সংঘর্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম এখানে ব্যক্তি এবং পারিবারিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে 'জনপদ'-এর সেই অর্থে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, যদিও এর কাহিনী সমসাময়িক কৃষক আন্দোলনকে মনে করিয়ে দেয়। দুজন লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ভিন্ন, কিন্তু একটি সামান্য লক্ষণ দুজনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়— দুজনেরই মাটি এবং মানুষের সঙ্গে

যোগ খুব নিবিড় ছিলো। এই বাস্তববোধ বাঙলা উপন্যাসের গৌরবময় ঐতিহ্য, যদিও স্বাধীনতার পরে ক্রমশ তা বিরল হ'য়ে উঠলো। যাই হোক, 'জাগরী' স্বাভাবিক গুণেই বিপুল সাড়া পেয়েছিল, কিন্তু 'জনপদ' সে তুলনায় উপেক্ষিত। তার একটা কারণ এই হ'তে পারে যে, নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের খ্যাতি তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয়কে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। কারণ যাই হোক, এরপর বহুদিন তিনি আর কোনো উপন্যাস প্রকাশ করেন নি। ঔপন্যাসিক রূপে তিনি যখন প্রায় বিস্মৃত, তখন প্রকাশিত হ'লো তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'রাণী পালঙ্ক'।

'রাণী পালঙ্ক'-র পটভূমি দেশবিভাগ। ছুতোর মিস্তিরি শিল্পী যোগীবর শুধু ভিটেছাড়া নয়, কর্মহারা। নিয়তির পরিহাসে যে কাঠের গোলায় সে ফুরনে কাজ করতে যায়, সেখানে গিয়ে দেখে তার অতীত জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি 'রাণী পালঙ্ক'ও পদ্মায় ভেসে অবশেষে সেই নামহীন গোলায় স্থান পেয়েছে। এই রাণী পালঙ্ক যোগীবরের জীবনে সবচেয়ে বড়ো গৌরব শুধু নয়, এর পেছনের আছে অতীত দিনের অনেক স্মৃতি, অনেক মর্যাদা। গাঁয়ের জমিদার রাণী পালঙ্ক তৈরির ভার প্রথমে দিয়েছিলেন কলকাতার বিখ্যাত চীনে ছুতোর মিস্তিরিদেব। তাদের সে কী অহঙ্কার! ব'সে ব'সে তাদের কাজ দেখবার অধিকারও নেই দেশী মিস্তিরিদের। দু-চারজন গাঁয়ের মিস্তিরি ওদের কাজ দেখবার অনুমতি চাইতেই

> ম্যানেজারবাবু খেঁকিয়ে উঠে বলেন,
> — বানাও তো স্রেফ পিঁড়ি আর পিলসুজ! আরাম কার ব'সে যে একটু স্নান করবো, তাও কাঁঠাল কাঠের একখানা জলচৌকী পর্যন্ত তৈরী করে দিতে পারলে না আজও কেউ, তার আবার···। পালঙ্কের কাজের বোঝ কি? দুখানা মাত্তর হাত অথচ পাল্টাপাল্টি করে অস্তর চালাচ্ছে দেখগে বিশখানা, ভাবতে পারো? কাজ দেখবো!— যাও যাও বাড়ী যাও। আগে বাটালি ধরতে শেখো, তারপর চীনে মিস্ত্রীর কাজ দেখতে এসো। যাও, তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। (পৃঃ ১২)

যে রাজনৈতিক বোধ এবং সমাজচেতনা তাঁর নাটকের প্রধান লক্ষণ তা থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি বিচ্ছিন্ন নয়।

কিন্তু একতারা গ্রামের জমিদার রায়ের মনের মতো রাণী পালঙ্ক তৈরি করতে ব্যর্থ হ'লো চীনা কারিগর ওয়াং থুং। অগত্যা ডাক পড়ে যোগীবরের। দুমাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে সে বানায় রাণী পালঙ্ক। জমিদার নিজে আসেন তার কুঁড়েতে অভিনন্দন জানাতে আর 'ওয়াং থুং শুধু মাথা নত করে রইল কারিগরের কাছে।' সেই অতীতকে কালীদহে ভাসিয়ে যোগীবর চ'লে এসেছে। কিন্তু সে-ভিটেও নড়বড়ে— জবরদখল জমি থেকে উৎখাত হ'য়ে ছত্রভঙ্গ যোগীবরের বন্ধু-আত্মীয় পরিজন। শুধু সে আর কোথাও নড়বে না। দেশছাড়া মানুষের কাছে সমবেত জীবনের মাহাত্ম্য আর নেই— যে যার নিজেকে শামলাতে ব্যস্ত। একে একে সবাই চ'লে যায়, চ'লে যেতে চায়। অসহায় যোগীবর অক্ষম আক্রোশে ক্ষিপ্ত, পাগল। সে চেঁচায় :

> কইল ব'লে পাউছ্যা। আরও পাউছ্যা। তো পাউছ্যালাম! ঘর দুয়ার, ক্ষেত খামার, সাধের নবাবনগরের কাঠগোলা, সব ফালাইয়া থুইয়া পাউছ্যালাম। পেরথমে নাও, পরে ইষ্টিমার।··· কালীদহ-ই তো, পদ্মা তো কমু না মুখে। হেই কালিদহেই না ডুবাইয়া আইলাম বেবাক স্বপ্ন। (পৃ: ২)

সেই যোগীবর পেটের জ্বালায় হাজির হয় গোবিন্দ পোদ্দারের গোলায়। তার নাম শুনেই পোদ্দার :

> হাঁক ছেড়ে বলে,
> — বাত্তি মার।
> আলো জ্বলে ওঠে কারুকাঠের রাজা— নবাবনগরে। সেই রাণী পালঙ্ক। পোদ্দার বলে,
> — মিস্ত্রী চিনতে পারো?···
> রাণী পালঙ্ক যেন একটা গোটা ঝাড়লণ্ঠন। চড়া পালিশের ওপর বৈদ্যুতিক আলোর বর্ণ বিচ্ছুরণে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ।
> ··· তোমার হাতের সেই রাণী পালঙ্ক!
> যোগীবর কোন কথা বলে না। গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। সৃষ্টির সামনে স্রষ্টা যেমন সুগম্ভীর। (পৃ: ৮৩)

এখানে কাজ পেয়ে যায় যোগীবর, তবে রাণী পালঙ্কের মতো কোনো শিল্পসৌধ তৈরির কাজ নয়, অতি কম সময়ের মধ্যে অনেকগুলি খাট তৈরির বায়না। সময়মতো না দিতে পারলে মালিকের প্রচুর ক্ষতি। সংখ্যাই এখানে জরুরি। নির্দিষ্ট দিনেই কাজ শেষ করে কারিগর, তারপর তার উত্থানশক্তি রহিত হ'য়ে যায়। যোগীবরের এবারের যাত্রা একা-একা : 'এক গণ-এ গেছে কারিগরীর সার্থক স্বাক্ষর রাণী পালঙ্ক। আর আজকের গণ-এ চলেছে কারিগর নিজে— যোগীবর সূত্রধর' (পৃ ১১০)।

'জনপদ' উপন্যাসের বিস্তার অথবা সংহতি, কোনোটাই 'রাণী পালঙ্ক'র নেই। কিন্তু এর থীমটি অসাধারণ। শিল্পীর সঙ্গে শিল্পও উদ্বাস্তু — তার কোনো সমাদর নেই, স্বীকৃতি নেই। কাঠের গোলার শস্তা-দামি, ভালো-মন্দ আশবাবের মধ্য সে আত্মগোপন ক'রে আছে। ব্যক্তির বিষাদ, শিল্পীর বেদনা যেন মূর্ত হ'য়ে ওঠে ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা পালঙ্কটির মধ্যে। শিল্পীর ওপরও তো চাপ আসে ক্যাম্পে থাকার জন্য!

'জনপদ' আর 'রাণী পালঙ্ক'-র প্রকাশকালের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও ঘটনাকালের দিক দিয়ে কাছাকাছি। এই অন্তর্বর্তী চার-পাঁচ বছরে দেশের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু লেখকের মনোযোগ গ্রামীণ মানুষের প্রতি। তাঁর নাটকের জগতেও প্রধানত এদেরই দেখি। 'সোনালী মাছ'-এ লক্ষ করা গেলো সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ — যাদের জীবনযাত্রা বিষয়ে কোনো কৌতূহল বা উৎসাহ আগের কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায় না। বড়লোক ব্যবসায়ীদের ইঁদুর-দৌড়ের রুদ্ধশ্বাস কাহিনী আর তার জাঁতাকলে প'ড়ে বিকৃত মূল্যবোধের ব্যক্তি আর বিপর্যস্ত পরিবার -- 'সোনালী মাছ'-এর বিষয়।

এক হিশেবে 'সোনালী মাছ'-ই লেখকের একমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক উপন্যাস। 'রাণী পালঙ্ক'-র ঘটনাস্থল অনুমান করা যায় কলকাতা, কিন্তু উপন্যাসটির মূল কাহিনী অতীতমুখী, সেটি হ'লো পদ্মাপারের গ্রাম। 'সোনালী মাছ'-এর প্রধান ঘটনাস্থল কলকাতা, চরিত্রগুলি কলকাতাবাসী। লেখকের এই বিষয়ান্তরে আগ্রহ অবশ্য পাঠকের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করে না। বিষয়-নির্বাচনের অধিকার লেখকের সব সময়ে আছে, তবে বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার দায় লেখকের। এই উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই কেতাবি ভাষায় যাকে বলে 'ফ্ল্যাট'। বিশ্বতোষের আত্মনাশী প্রেম আর ভণ্ড সত্যব্রতর চতুর প্রেমের মাঝখানে সতীর সারল্য প্রথমে মনে হ'তে পারে নিপুণ অভিনয় অথবা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা-প্রসূত। কিন্তু পরে পাঠক বুঝতে পারেন যে, ওটি নামমাহাত্ম্যর গুণে। 'পতি পরম গুরু' এই আদর্শে যে কোনো অবস্থাতেই সত্যব্রতকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং ক্ষমা করা সতীর দায়িত্ব, আর বিশ্বতোষ একদা সতার প্রেমে পড়েছিল ব'লে সত্যব্রতকে সর্ব অবস্থায় রক্ষা ক'রে তার মাশুল দিতে হবে। কেউ শহিদ হবার জন্য জন্মায়, আর কেউ বা পরের ওপর নির্ভর ক'রে সুখভোগের জন্য। একমাত্র এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই বিশ্বতোষ আর সত্যব্রতকে বোঝা যায়। উপন্যাসের উপসংহারে দেখি মধুপুরে গিয়েও সতীর নিস্তার নেই। কিন্তু সত্যব্রতকে ক্ষমাসুন্দর চোখের অভ্যর্থনায় কাহিনীর শেষ হয়। সত্যব্রতর মা স্বর্ণলতিকা বিষয়ে টীকা নিষ্প্রয়োজন।

পাঠক হিশেবে আমাদের আক্ষেপ, যে জনপদের জাগরণ দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন, 'সোনালী মাছ'-এ এসে তিনি বিভ্রান্ত হলেন। অথবা এটাও হ'তে পারে এই উপন্যাস তাঁর সাময়িক খেয়ালের সৃষ্টি কেননা এই পর্বের নাটকে দেখি তিনি স্বক্ষেত্র থেকে স'রে যাননি।

বিজন ভট্টাচার্য বিষয়ে প্রত্যাশা আমাদের বেশি ব'লে, আশাভঙ্গের বেদনাও তীব্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাঠকরূপে একটা অপরাধবোধও আছে। 'সোনালী মাছ' প্রকাশের পরেও তো পনেরো বছর কেটে গেলো। ইতিমধ্যে কোনো পাঠক সমালোচক প্রশ্ন করেননি ঔপন্যাসিক বিজন ভট্টাচার্য নীরব কেন? প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের গতি অনেকদিনই রুদ্ধ। একদিকে বিজ্ঞাপন-নির্ভর সাহিত্যের হুজুগ, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী সাহিত্যের নামে কমলকুমার মজুমদার প্রমুখ লেখকের পাঠককে বোকা-বানানো গোষ্ঠিকেন্দ্রিক এলিট সাহিত্য — এর মাঝখানে টিঁকে থাকা দুঃসাধ্য। কিন্তু 'গর্ভবতী জননী'র নাট্যকার কি উপন্যাসের ক্ষেত্রেও পারেন না আরেকবার বিদ্রোহ করতে? ▭

নাটক যাঁদের অধ্যাপনার বিষয় এই রকম বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিতে * * *

বিজন ভট্টাচার্য : রিয়্যালিটি ও মিথ-এর প্রেক্ষিতে | রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চল্লিশের দশকের শুরুতে বাংলার নাট্য জগতে বিজনে ভট্টাচার্যের দেখা মিলেছিল। তারপর তিনটি দশক পার হয়ে গেলেও সাম্প্রতিক বাংলা নাট্য আন্দোলনের আলোচনার গোড়াতেই যে নামটা এসে পড়ে সেটি বিজন ভট্টাচার্যেরই। ১৯৪৪ সালে তাঁর দুটি নাটক পর পর অভিনীত হয়, 'জবানবন্দী' এবং 'নবান্ন'। দ্বিতীয় নাটকটি ত' আধুনিক নাটকের পথনির্দেশিকা। যাইহোক সেই শুরু। ঐ নাটকে আগষ্ট আন্দোলন এবং দুর্ভিক্ষকে একেবারে সামনে নিয়ে আসা হল। সর্বহারা চাষী সমাজের রিয়্যালিটি যেমন পেলাম তেমনি এল যৌথ কৃষক আন্দোলনের শপথ। এরপর কলঙ্ক, মরাচাঁদ, গোত্রান্তর, অবরোধ, জীবনকন্যা, আজ বসন্ত, গর্ভবতী জননী, দেবীগর্জন, চলো সাগরে ইত্যাদি শিরোনামে এক এক করে বিজনবাবু নাটক লিখেছেন। নিজে অভিনয়ও করেছেন। এই সব নাটকের মধ্যে চল্লিশ থেকে সত্তরের দশকের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বরূপটি যতখানি স্পষ্ট তা আর কোন নাট্যকারের রচনায় আমরা পেয়েছি? দিগিন্দ্রচন্দ্র? সলিল সেন? তুলসী লাহিড়ী? বীরু, উমানাথ, ঋত্বিক, জোছন, উৎপল? এঁদের নাম ছাড়াও অন্য অনেক নাট্যকাররাই শাসক-শাসিত, শ্রমিক-মালিক জমিদার-চাষী, প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিশীল শক্তির শ্রেণীসংঘাতকে তাঁদের নাটকে প্রতিপাদ্য করেছেন? এঁদের সঙ্গে বিজনবাবুর সেই খানেই মিল। তবে তাঁর নাটকে 'রিয়্যালিটি' অনেক বেশী শাণিত, 'মিথে'র প্রয়োগ একেবারেই সাম্প্রতিক দৃষ্টিকোণ সঞ্জাত।

নাটকের মূল সোপান যে বাস্তবতা বা রিয়্যালিটি এবং তার উৎসভূমি যে সমকালীন সমাজ অর্থনীতি তা বিজনবাবুর আগে আর কোন নাট্যকারই বোঝেন নি (অন্যান্য নাট্যকারের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেই বলছি)। মন্মথ রায় এবং শচীন সেনগুপ্ত চল্লিশের দশকের আগে নাটকে রাজনৈতিক চিত্র ঈষৎ আনলেও তার উপস্থাপনায় যে কাহিনী ও আঙ্গিক গ্রহণ করা হয়েছে তাতে প্রশ্নের তীব্রতা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। বিজন ভট্টাচার্যই তাঁর নাটকে প্রথম এই পরিবেশকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ছিল স্বচ্ছ তেমনি বাস্তবকে ব্যাখ্যা করবার সাহসিকতাও ছিল। তদানীন্তন বাঙালীর বাস্তব জীবনটি তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন। 'নবান্ন' নাটকের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় লিখছেন: 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে

সমগ্র যে গণ অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে, তাতে ভারতেরও মোহভঙ্গ হয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন আর কোন সর্তই তার পক্ষে প্রযোজ্য নয়। জাগ্রত জনসাধারণের কড়া প্রহরায় উভয় পক্ষের উচ্চতন নেতৃবর্গের মধ্যে আপসরফার ধারাটাও খানিকটা ছুরিবাঘনখে পর্যবসিত। লক্ষ কোটি জনগণ-মনে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার সম্পর্কে 'কুইট ইণ্ডিয়া'ই তখন একমাত্র শ্লোগান। গান্ধীজীর সর্বশেষ 'মর কি বাঁচ' মন্ত্রই তখন প্রত্যেক ভারতীয়ের মনে একমাত্র গায়ত্রী। তাই ১৯৪২ সনের আগষ্ট মাসে দেশব্যাপী যখন প্রত্যক্ষ গণ-অভ্যুত্থান আরম্ভ হল, ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখবার শেষ প্রাণান্তিক চেষ্টায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিয়মতন্ত্র সম্মত ভাগ বাঁটোয়ারার পর নিরক্তের স্বাধীনতা এলো কালনেমীর অভিশাপ মাথায় করে। তাই বিনা রক্তপাতে অর্জিত স্বাধীনতার পাপস্খালন তোলো আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। নবান্ন নাটকের রচনাকাল এই রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্বে।' বলাই বাহুল্য চিহ্নিত এসব সমস্যা তাঁর নবান্ন নাটকেই সীমাবদ্ধ রইলো না— তা আরও প্রসারিত হল পরবর্তী নাটকগুলিতে। 'রিয়্যালিটি' বলতে যা বুঝি তার বলয়াকৃতি রূপ সে সব নাটকে আছে।

বাস্তবধর্মী বা রিয়্যাল নাটকে নাট্যকারের পরিবেশকে আত্মসাৎ করার একটি বিচিত্র দক্ষতা দেখা যায়। নাট্যকার যা কিছু দেখেন তাকে জীবন্ত করে তোলেন তাঁর রচনায়। একালের সমাজ এবং সভ্যতার সবটাই যেহেতু পরস্পরের ঘনিষ্ঠ তাই লেখক সামান্য জীবন-সচেতন হলেই ঘটনা, চরিত্র এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা উপস্থিত হতে পারে। একেই আমরা বলি নাট্যকারের বাস্তবতাবোধ। এই জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কতখানি ছিল তার প্রমাণ তাঁর নাট্যকাহিনীগুলি। 'নবান্ন' নাটকের আমিনপুর গ্রাম, 'কলঙ্ক' নাটকের বাঁকুড়ার সাঁওতাল অঞ্চল, 'গোত্রান্তর' নাটকের উদ্বাস্তু কলোনী, 'গর্ভবতী জননী'র বাদা অঞ্চল ইত্যাদি নাট্যকারের দৃষ্টিপাতের সুবিস্তৃত পরিধির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছে। লেখক বাংলার নানা প্রান্তে কেবল ঘুরেই বেড়ান নি, তার জনপদ সমূহের ছবি এঁকেই তৃপ্ত হননি, তিনি এঁকেছেন বাস্তব জীবনের মুখ। তাঁর নাটকের প্রধান-অপ্রধান চরিত্র তাঁরাই যারা গণ আন্দোলনে বিশ্বাসী, জীবন যাদের অগ্নিদগ্ধ। মনে পড়ে নবান্নর নিরঞ্জন ও দয়াল মণ্ডলকে যারা চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য শপথে নেতৃত্ব দিয়েছে, মরাচাঁদের অন্ধ গায়ক পবনকে যে উদ্বুদ্ধ করে সেই যুগসচেতন রাজনৈতিক কর্মী শচীনকে, গোত্রান্তরের বস্তিবাসী শ্রমিক যুবক কানাইকে। 'গোত্রান্তরের' ভূমিকায় বিজন বাবু লিখেছেন 'নীতিবাদের প্রশ্ন নয়— জীবনের ক্ষেত্রেই গোত্রান্তর আজ যুগ সত্য। আর জীবনের ক্ষেত্রে যে সত্য চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার মতোই সমুজ্জল— নাটকে তার অপলাপ করা কোন নাট্যকারের জীবনধর্ম হতে পারে না।' এই জীবন সত্য বিজনবাবুর সব নাটকেই অল্প-বিস্তর উপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে 'নবান্ন' যে বস্তুতান্ত্রিক নাট্যধারার গোড়াপত্তন করলো সেই পথ ধরেই 'পথিক' (তুলসী লাহিড়ী—১৯৫৮); তরঙ্গ, বাস্তুভিটা (দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৪৬, ১৯৪৭); এই স্বাধীনতা (শচীন সেনগুপ্ত ১৯৪৯); নতুন ইহুদী (সলিল সেন—১৯৫৩); দিনান্তের আগুন (শশিভূষণ দাশগুপ্ত—১৯৪৯); চোরাবালি (কিরণ মৈত্র—); কেরানীর জীবন

(ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৫২); এবং সংক্রান্তি (বীরু মুখোপাধ্যায়—১৯৫৯); নাটকের জন্ম। সাম্প্রতিকালের সৃষ্টি 'চলো সাগরে' এবং 'আজ বসন্ত' নাটক ঈষৎ ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়েও ঐ বাস্তবতার জোরেই সাফল্য পেয়েছে।

বিজনবাবুর নাটকে গণচেতনার প্রতি এই যে অতলান্ত ভালবাসা উপচে পড়েছে এর কারণ তাঁর সর্বহারার মতাদর্শের প্রতি অকৃপণ বিশ্বাস। একেবারে সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি 'আজ বসন্ত' নাটকের কথাই ধরা যাক। ষাটের দশক থেকেই বাঙালীর মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজে নৈরাশ্য এবং হতাশা দানা বাঁধতে থাকে, জীবনকে মূল্যহীন বলে মনে হতে থাকে। কিন্তু বিজনবাবু বিশ্বাস করেন সমাজসৃষ্ট এই নৈরাশ্যের কুয়াশাকে কাটিয়ে উঠে যথার্থ মানব-শক্তিতে বেঁচে থাকার যৌবন বসন্ত শক্তিই হল আসল কথা। দুটি সদ্য জাগ্রত যুব শক্তিকে নাট্যকার তাই আলোয় এনেছেন। অবশ্য এ অভিযোগ করা হয় যে উভয়ের এই নতুন জীবনবোধ তাদের কোথায় নিয়ে যাবে নাটকে তা অস্পষ্ট। তবু একথা ত' ঠিক যে বাস্তব-সচেতন নাট্যকারের কলম থেকে শ্রেণী নির্যাতন শোষণ ইত্যাদির নেপথ্য ধ্বনি এই নাটকেও এসে মিলেছে। অর্থাৎ সারা জীবন ধরে অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত এবং খেটে খাওয়া শ্রমিক কৃষকের, উপেক্ষিত যুবসমাজের সংগ্রামীরূপের পরিচয়ই তিনি প্রথম থেকে দিয়ে আসছেন।

এই সূত্রে তাঁর নাটকে 'মিথ' বা পুরাণের প্রয়োগের ব্যাপারে দু'একটি কথা বলা যাক। অতি আধুনিক বাংলা নাটকগুলির উপজীব্য যেমন বাস্তব জীবন তেমনি উনিশের শতকের নাটকের উপজীব্য ছিল প্রধানত পুরাণ কাহিনী। এই দুটি জগৎই সম্পূর্ণ পৃথক। সে যুগের নায়ক ছিল রাম-রাবণ-ভীষ্ম-নায়িকা সাবিত্র-সীতা-জনা—একালের নায়ক নাগরিক সমাজের যন্ত্রণাদগ্ধ তলদেশ থেকে উঠে এসেছে, তারা প্রায়ই কোন শ্রেণী প্রতিনিধি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিছিল, লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যুর মর্মন্তুদ ইতিহাস। বিংশ শতকের মানুষ এ জন্য পুরাণের দেবতাকে দায়ী করেনি, দেবতার সামনে নতজানু হয়নি কেন না সে জানে ঐ চিতাশয্যার উপরই কিছু মানুষ মনাফার পাহাড় গড়ে তুলেছে। তাই নাটকের নায়ক পুরাণকে ভুলল, দেবতাকে অস্বীকার করল— নির্ভর করল নিজের বাহুশক্তির উপর। অন্যান্য নাট্যকার যেমন তেমনি বিজনবাবুও পৌরাণিক নাটক লেখা দূরে থাক, তার প্রতিভাস পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন অবশ্য তাঁর নাটকের নামকরণে এবং চরিত্রনামে মাঝে মাঝে 'মিথ' বা পুরাণের স্পর্শ লেগেছে। যেমন লৌকিক পুরাণের ছায়ায় 'নবান্ন' 'দেবী গর্জন' 'চলো সাগরে' নামকরণ। অথবা চরিত্রের নাম রাঘব, ত্রিলোচন, উদ্ধব, রাধা, শ্যামাদাস, ব্রজবিলাস, নিরঞ্জন ইত্যাদি। কোন কোন নাটকে বাউল গানের মধ্যে লৌকিক পুরাণের ছায়া আছে যেমন—

তুমি তো নও অরূপ রতন
শিব সনাতন,
আমি তোমায় চিনি গো জানি গো

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। গানের পরের অংশে 'মিথ' পৌঁছেছে রিয়্যালিটির রাজ্যে :

'জান দিয়ে ধান গোলায় তোল
জেল হাজতে বাসর জাগো,
আমি তোমায় চিনি গো জানি গো।

এ নবপুরাণ। মরাচাঁদের নায়ক পবন নতুন 'মিথ' এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে—'কেন কি সেই নিরাকার পরমব্রহ্ম, যাঁর কোন রূপ নেই গুণ নেই রসরূপের রাজ্যে যিনি নির্গুণ; সেই নির্গুণ ব্রহ্মের বদলে

বিজনবাবুর নাটকে গণচেতনার প্রতি এই যে অতলান্ত ভালবাসা উপছে পড়ছে এর কারণ তাঁর সর্বহারার মতাদর্শের প্রতি অকৃপণ বিশ্বাস।

আমি দেহধারী জীব মানুষকে পিতিষ্ঠে দিলাম; কেন কি এই তুমি, আমি এই মানুষ, অখণ্ড নির্গুণ সেই ব্রহ্মেরই অংশ বিশেষ।— জয় হোক মানুষের যে মানুষ নিজ কর্মগুণে, স্বমহিমায় ধরাধামে পিতিষ্ঠিত।'

আশাকরি উদ্বৃত সংলাপটি পড়ার পর বিজন ভট্টাচার্যের 'নবমিথ' প্রয়োগ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা আমরা করে নিতে পারি। এককালে গণনাট্য সংঘের সর্বক্ষণের কর্মী ও পরবর্তীকালে ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা বিজন ভট্টাচার্য একাধারে নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, গীতিকার, সুরকার। তিনি যদি আজও এ দাবী করেন যে নাটক রচনায় চিরকালই তিনি শোষিত এবং নিপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে, তাহলে তার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কারও নেই। ▭

পুরানো কথা। চিন্মোহন সেহানবীশ

বিজনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় কবে, আজ আর তা ঠিক মনে নেই। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনকয়েক কৃতী ছাত্রদের নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা যখন Youth Cultural Institute গড়ি তখন সম্ভবত বিজনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটেনি, অন্তত তেমন জমে ওঠেনি। ঐ ইনস্টিটিউটের সদস্যেরাও নাটক অভিনয় করতেন— অনেক সময়েই ইংরেজীতে জলি কাউল বা দেবব্রত বসুর নাটক আর একেবারে শেষের দিকে সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কেরানী' বা সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের নাট্যরূপ 'অঞ্জন গড়' নাটক। বিজনের নাটক তখনো লেখা হয়নি একটিও।

যতদূর মনে পড়ে বিজনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় ১৯৪০-এর গোড়ার দিকে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা 'অগ্রণী' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করি। দেবকুমার গুপ্ত, প্রফুল্ল রায়, অদ্বৈত দত্ত, বীরেন মজুমদার আর আমি— এই পাঁচজন নিয়ে ছিল তার সম্পাদকমণ্ডলী। লেখা যোগাড় করার সূত্রে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তখনকার দিনের 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু প্রগতিপন্থী লেখকের। বিজন ভট্টাচার্য ছিল এঁদেরই একজন। যতদূর মনে পড়ে সে যোগাযোগ ঘটেছিল সরোজ দত্ত মারফৎ— একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই 'অগ্রণী'তে প্রকাশিত হচ্ছিল সরোজের কবিতা।

দেখতে পাচ্ছি 'অগ্রণীর' ১৯৪০ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বিজনের একটি ছোটগল্প— 'জাল স্বত্ব'। এর থেকেই তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগকালের হদিশ নেওয়ার এই চেষ্টা করছি।

যাই হোক, আলাপ হওয়ার পরেই দেখতে দেখতে জমে উঠল এক জমাট আড্ডা। স্থান— কার্জন পার্ক, কাল সন্ধ্যা থেকে প্রায় রাত দশটা অবধি আর পাত্র—

গোপাল হালদার, বিজন ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, সরোজ দত্ত, বিনয় ঘোষ, সুধী প্রধান, অনিল কাঞ্জিলাল, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়, মহাদেব প্রসাদ সাহা, অগ্নিহোত্রাজী, চিন্মোহন সেহানবীশ এবং আরো অনেকে।

বিজনের নাট্যরচনার বা অভিনয়ের কথা তখনো অবধি আমরা শুনিনি। তবে আলাপের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা টের পেয়েছিলাম মানুষের চলন-বলনকে নিখুঁত নকল করার তার আশ্চর্য ক্ষমতা। মুজফ্ফর আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জি, গোপাল হালদার, হীরেন মুখার্জী— এমন কি আমরা চুনোপুঁটিরাও রেহাই পাইনি তার সেই মারাত্মক অনুকরণের হাতে থেকে। মনে পড়ে একবার আমরা কয়েকজন কি একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সদলবলে যাচ্ছিলাম চুঁচুঁড়া না কোথায়। তার মধ্যে ছিলেন হীরেনবাবু, বিজন, সাধনা রায়চৌধুরী, সম্ভবত অমল দাশগুপ্ত আর আমি। ট্রেনে বিজন নকল করছিল বঙ্কিমদার বজ্রনির্ঘোষী বক্তৃতার— সেই উত্তেজনার মুহূর্তে পাঞ্জাবীর হাতা গোটানো এবং কোঁচা ঝেড়ে দু'পায়ের মধ্যে চেপে ধরা। হীরেনবাবু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি আমাকেও নকল করেন না কি? বিজন সলজ্জভাবে জানালো যে সে অমন কাজ করে না। আমরা বাকী সবাই বললাম— করে, আপনি সামনে রয়েছেন বলে লজ্জা পাচ্ছে। হীরেনবাবুর তখন ভীষণ কৌতূহল। অগত্যা বিজনকে দেখাতে হল হীরেনবাবুর বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী— এমন কি বক্তৃতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠলে তাঁর একটি কাঁধ ঈষৎ উপরে উঠে যাওয়া।

সেদিন চুঁচুড়ায় হীরেনবাবুর বক্তৃতা তেমন জমে নি। ফেরার পথে আমি সে-কথা তাঁকে একটু ইঙ্গিতে জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চটে উঠিলেন, কি করে জমবে? যেই একটু তেতে উঠছি অমনি মনে হচ্ছে কাঁধটা বুঝি উপরে উঠে গেল। অমন করে বক্তৃতা হয়।

মনে পড়ে ১৯৪৩ সনের মে মাসে আমরা মস্ত এক দল বোম্বাইয়ে গিয়েছিলাম প্রথম গণনাট্য সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানে পৌঁছোনোর আধ ঘণ্টার মধ্যে বিজন আর জর্জ (দেবব্রত বিশ্বাস) প্রবলবেগে গুজরাটি বলতে শুরু করল,— একে অন্যের রসিকতায় মজে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, উত্তেজিত হচ্ছে, রাগ করছে, কবিতা আবৃত্তি করছে, মায় গান অবধি গাইছে নিখুঁত (?) গুজরাটিতে! একদিন পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভবানীবাবু আলাপ শুনে আমায় ডেকে বললেন, এঁরা তো চমৎকার গুজরাটি বুলি আয়ত্ত করেছেন! বোম্বাইয়ের বন্ধুদের ডেকে শোনানোর একটা ব্যবস্থা করলে হয় না? বললাম, সর্বনাশ! তাহলে মার খেতে হবে নির্ঘাত। Intonation বাদে বাকি সবটাই যে gibberish।

তারপর ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে একে একে 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটক

পাঠ। বিজনের নাটক পড়ার কথা এতদিন পরেও স্পষ্ট মনে পড়ে কারণ প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার যাদু সে জানে। আর আমরা হাঁ করে বসে শুনতাম নাটকায় উৎকণ্ঠায় উৎকর্ণ হয়ে।

বিজনের অভিনয়ের কথা নতুন করে কি আর লিখব? তার চাইতে বরং আর একবার বলি যে কথা প্রায় বিশ বছর আগে লিখেছিলাম 'আন্তর্জাতিক' পত্রিকায়:

'নবান্ন অভিনয়ের কথা বলতে মনে পড়ে গেল বন্ধুবর সুধী প্রধান প্রায়ই তখন নালিশ জানাতেন যে প্রথম দৃশ্যে উত্তেজনাবশে বিজন নাকি রোজ তাঁর গলা এতো জোরে চেপে ধরেন যে তাঁর মনে হত মঞ্চের উপরেই তাঁর মৃত্যু অবধারিত। সত্যি অভিনয়কালে বিজন তাঁর ভূমিকার মধ্যে এমন ডুবে যেতেন যে তখন আর তাঁর জ্ঞান থাকত না বিচারের। আর ঠিক এর উল্টো বোধ হত আমার কাছে শম্ভুর অভিনয়। তিনি নামতেন দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের চরিত্রে— একদিকে চরিত্রবান গ্রাম্য মাতব্বর ও অন্যদিকে ঘৃণ্য নারী শিকারী দালাল। শম্ভু এর কোনটির মধ্যেই ডুব দিয়ে আত্মহারা হতেন না — ভূমিকার উপর পূর্ণ আধিপত্য বজায় রেখে তিনি ব্যাখ্যা করতেন চরিত্রের নিহিতার্থ। বিজনের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে ভেসে আমরা কূল হারাতাম তখনকার মতো — শম্ভুর শিল্প আমাদের সন্ধান দিত আনন্দময় উপকূলের।'

বিজনের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে ভেসে আমরা কূল হারাতাম তখনকার মতো শম্ভুর শিল্প আমাদের সন্ধান দিত আনন্দময় উপকূলের।

বাংলা নাটকের রাজনীতি ও নবান্ন | অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক সমকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিফলন করে। বস্তুত রাজনীতির কাজ হল রাষ্ট্রের নীতি গতিপ্রকৃতির নির্ধারণ। অর্থাৎ সমাজ কিভাবে শাসিত হবে তার নীতি উদ্‌ভাবন। রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চেতনার সাহায্যেই সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণার অবসান হওয়া সম্ভব। বাংলা নাটকের জন্ম এই রাজনীতির আবর্তে।

উনিশ শতকে বাংলায় আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত ঘটে। "ইংলণ্ডের অধিকারে আসাতেই এই পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। সমাজের ভিতরের লোক এই পরিবর্ত্তনের কারণ নয় সমাজের বাহিরের লোক উহার মূল কারণ।" মুসলমান শাসন ব্যবস্থায় দেশ এক মধ্যযুগীয় চিন্তা ধারণায় আচ্ছন্ন ছিল। ধর্মীয় অনুশাসনের কবলে সাধারণ জনজীবনে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে এক আত্মরক্ষামূলক নীতি প্রচলিত ছিল। 'ইংরাজদিগের জেতৃভাব পূর্ণমাত্রায় না থাকিলেও মুসলমানদের অপেক্ষা যতগুণে আছে তাই ইংরাজ আমাদের আদর্শ ও শিক্ষক।' প্রশ্ন ওঠে ইংরাজ আমাদের শিক্ষক কি করে হল উনিশ শতকে। আসলে মুনাফা বৃদ্ধির অবাধ স্বাধীনতাই হল উনিশ শতকের ব্যক্তিতত্ত্ববাদের প্রাথমিক প্রয়োজন, এরই নাম লিবারেলিজম্‌। স্বার্থ ও উদ্দেশ্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে যে বাবু-শ্রেণীর উদ্ভব হয় তাদের কাছে অর্থই একমাত্র বাইবেল ছিল না। Mathew Boulton ও James Watt-এর নেতৃত্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে Lunar Society-র মাধ্যমে গড়ে ওঠে Industrial aristrocracy. পরাধীন বাংলা দেশে এই industrial aristrocracy গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না, বৃটিশ শাসনে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল ছিন্নভিন্ন। ১৮৩৪-এ দেখি তাঁতিদের হাড়গোড়ে দেশের মাঠঘাট ছেয়ে গেছে—'। নবগঠিত আধুনিক বাবু শ্রেণীর কাছে ১৭৯৩-এর কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ছিল অধিকতর নিরাপদ অর্থ বিনিয়োগ। এই নব্য বাবু সম্প্রদায়ের মধ্যে idea'র তাড়ণা লক্ষ্য করি। আইডিয়ার তাড়ণায় নবগঠিত আধাবুর্জোয়া সমাজ সমাজ-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হলেন। বাংলা নাটকের জন্ম এই পটভূমিকায়। জনৈক মহাশয় জমিদার সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন: "ধর্ম কর্ম পবিত্রতা চরিত্র চিহ্নাদি বিষয়ে পতিব্রতোপাখ্যান নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবেন তাহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দিবেন—" কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের জন্ম হল এই অর্থপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায়।

নাট্যকে রামনারায়ণ প্রতিষ্ঠা পেলেন। যাত্রা, কবিগান, তর্জা, প্রভৃতি লোকশিল্পকে পরিত্যাগ করে নাটক কেন বাবুসম্প্রদায়ের মাধ্যম হয়ে উঠলো? এর উত্তর পেলাম উমেশচন্দ্র মিত্রের কথায় : 'বঙ্গদেশে যাত্রা নামে এক প্রকার অভিনয় সাধারণ জনগণের মনোনীত হইয়াছে বাস্তবিক মন্দ নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রচলিত ব্যবহার দ্বারা এই অভিনয় ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হেতু এই, যে যাত্রার গীত ও পয়ার রচকেরা অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি সুতরাং সমস্ত বিরস হইয়া উঠে।'

অর্থাৎ ইংরাজী সভ্যতার স্পর্শযুক্ত বাবু সম্প্রদায় তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কারণে 'বিলাতি নাটকের' ছায়ায় বাংলা নাটককে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলেন। এই স্বাতন্ত্র্য বোধকে প্রতিষ্ঠিত করে বাগান বাড়ীর নাট্যশালা। বাগান বাড়ীর নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাবু সম্প্রদায় এবং ইংরাজ রাজকর্মচারীবৃন্দ। নাটক দেখার অর্থ খানাপিনা এবং আমোদ প্রমোদ। সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে এর কোন সংযোগ ছিল না। তারা ছিলেন দূরে। এহেন পটভূমিকায় রাজনীতির প্রেরণা ছিল বেন্থামের হিতবাদী চিন্তায় তারা ভেবেছিলেন, 'greatest good of the greatest number—'। মিলের উক্তি তাদের প্রেরণা যুগিয়ে ছিল 'the ideas of the educated classes filter downwards and become the ideas of the masses' বেনোভেলণ্ট ডেসপটিজম্‌কে আবাহন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

'উনিশ শতকে আমরা তিনটি রাজনৈতিক সংঘাত লক্ষ্য কবি— রামমোহনের ধর্মবোধকে প্রতিষ্ঠা করা; বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদের সাহিত্যের সংগ্রাম, ন্যাশনাল বা জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। আমাদের স্মরণ আছে ইংলণ্ডকে আদর্শ রেখে সমস্ত মতবাদের এক স্বর'— সেটা আবেদন ও নিবেদনের। তারা বিপ্লব চায়নি, ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটুক এটাও তারা চাননি। চেয়েছিলেন বিদেশী শাসনের ছায়ায় সংস্কার। এই সংস্কার মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে, আবার নব্যশিক্ষিত অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধেও। মাইকেল মধুসূদনের 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ,' 'একেই কি বলে সভ্যতা' এই প্রহসন দুটি এই মতবাদের সাক্ষ্য দেয়। ওদিকে হিন্দু রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সতীদাহ প্রথার বিলোপ, হিন্দু ধর্মের rationalism এর তাগিদে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আন্দোলন এক তরঙ্গ সৃষ্টি করে যার ফলশ্রুতি করুণ রসাত্মক বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সপক্ষে একাধিক নাটক। ভলটেয়ারের ভাষায় : কুসংস্কারের আবর্জনা দূর করো—'। এটাই ছিল নব্যতন্ত্রীদের শ্লোগান।'

এদিকে ১৮৭৫-এ লর্ড সালিসবারি অভিমত দিলেন : "ভারতবর্ষের রক্ত আমাদের যখন বার করে নিতেই হবে, ছুরিটা এমনসব জায়গায় বেছে ঢোকাও যেখানে অনেক রক্ত জমে রয়েছে অন্তত যেখানে যথেষ্ট রক্ত চলাচল হয়। রক্তের অভাবে যে অঙ্গগুলো আগে থেকেই দুর্বল হয়ে আছে সেখানে ছুরি বিঁধিয়ে লাভ কী হবে—"। তাই বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় দেখি বিদেশী বাণিজ্যের আক্রমণে আমাদের বস্ত্রশিল্প সর্বপ্রথম বিনাশ প্রাপ্ত হল, ইংলণ্ডে যান্ত্রিক শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্পের পতন হল। ধাতুশিল্প বিনষ্ট হল। কাঁচ ও কাগজের ব্যবসা নষ্ট হল। এদিকে ব্রিটিশ কূটনীতির

ফলে দেশ উন্নতির পথে না এগিয়ে অবনতির পথে গেল। যেটুকু দেশজ শিল্প ছিল তাও জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতবর্ষ পুরোপুরি কৃষিজীবী দেশে পরিণত হল। ভারতবর্ষের আর্থিক চরিত্র হল কাঁচামাল ও রসদ সরবরাহের দেশ হিসাবে। এই আর্থিক শোষণের সহায়ক হলেন ভারতের নবগঠিত আধা সামন্ত্র-তান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজ।

এই কৃষিজীবীদের মধ্যে 'নীলকর প্রথা' এনে দিল এক হতাশা। জোর করে নীলের চাষ, তার আদায় এবং অত্যাচার-এর পটভূমিকায় জন্ম নিল নীলদর্পণ নাটক। নীলদর্পণের ভূমিকায় লেখা হল : "নীলকর নিকর করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্ক তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরো-পকার শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রমের সাফল্য নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখরক্ষা—"

'বিলাতের মুখরক্ষা' ও শাসকের হৃদয় পরিবর্তন এটাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু এ নাটক প্রত্যক্ষ রাজনীতি যা অর্থনীতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে জন্ম নিল তা সামগ্রিক জনসাধারণের মনে সাড়া জাগালো। কৃষি-জীবী 'তোরাপ' নেতৃত্ব নিল, অবশ্য তখনো সে শ্রেণী-চরিত্র নয়। বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত সাধারণ চরিত্রের মধ্যে একক বীরত্ব। রাজনীতির নাটকে এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলো বাংলা দেশ। বাগানবাড়ীর নাট্যশালা ভেঙে ন্যাশনাল থিয়েটার জন্ম নিলো সর্বসাধারণের জন্য। রাজনীতির নাটকের ওপর ভিত্তি করেই বনিয়াদ গড়ে উঠলো বাংলা নাটকের। আবেদন ও নিবেদন-এর রাজনীতিকে সম্বল করে'জমিদার দর্পণ' 'চা-করদর্পণ' প্রভৃতি নাটকের জন্ম প্রত্যক্ষ করলাম। একদিকে করুণরসাত্মক দর্পণ জাতীয় নাটক অপর দিকে সমাজ সংস্কারক বিষয়ে প্রহসন ; এই দুই নাটকের মাঝখানে প্রত্যক্ষ রাজ-নীতি জনসাধারণের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে তীব্রতর করে তোলে। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'সিপাহী বিদ্রোহ' সম্পর্কে তখন বাংলার চিন্তানায়করা নিশ্চুপ ছিলেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে কর্ণওয়ালিশের অভিমত 'Every native of Hindusthan, I verily believe, is corrupt' মেকলে যিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা জগতে ব্রিটিশের স্তাবক 'Indian in blood and colour but English in tastes, in opinion, in morals and in intellect' তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন 'বিদেশী পদাশ্রিত থাকার উপযোগী দৈহিক গঠন ও মানসিক গড়নের দিক থেকে বাঙ্গালীর মত এমন যোগ্য জাতি বিশ্বের কোথাও নেই—'

এইসব ঘৃণ্য উক্তির বিরুদ্ধে জন্ম নিল এক চরমপন্থী মনোভাব। 'রাজাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিবে যুদ্ধকালে সহায় হইবে' বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিক্ষা যেন ব্যর্থ হল 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকে। এই নাটকের পটভূমিকায় দেখি 'রাজপদ ও অধীনতা' প্রবন্ধে : 'একই পূর্ণচন্দ্রের প্রাণতোষিণী শান্তিময়ী কৌমুদী ধারায় ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ শান্তিসুখ সম্ভোগ করিয়া প্রাণ শীতল করিতেছে কিন্তু সেই কৌমুদী ইংলণ্ডে কেমন উদারশালিনী অমৃতময়ী ভারতে কেমন সঙ্কুচিতা বিষবর্ষিণী।' এই বিষবর্ষিণী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' প্রত্যক্ষ রাজনীতির নাটক। সুরেন্দ্র হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের বুকে লাথি মারে, বুকে আঘাত করে। এই আঘাত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে।

অশ্লীলতার অভিযোগ আসে ব্রিটিশ শাসকের কাছ থেকে; নাটকের বিরুদ্ধে Dramatic Performances Control আইন (১৮৭৬) চালু হল। নাটকের প্রচণ্ড শক্তিকে রুখবার জন্য এই আইন। এই আইন প্রমাণিত করলো নাটক একটি দুর্বার হাতিয়ার। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন্-এ যারা ছিলেন নাটকের পৃষ্ঠপোষক তারা দূরে সরে গেলেন। ক্রমাগত অত্যাচার, গ্রেপ্তারে স্তিমিত হয়ে এলো নাট্যকারের সমকালীন চিন্তা। উনিশ শতকের শেষ দুটি দশক বাংলা নাটকে এলো পৌরাণিক যুগ। ভারত সভার ন্যাশনাল কনফারেন্স (১৮৮৩) ও কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫) রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটালো। কিন্তু এর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে 'কোম্পানীর কাল', এসেছে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনে Dominion Status এর আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে তখন। সুতরাং উনিশ শতকের শেষ দুটি দশক পৌরাণিক ও টডের Annals of Rajasthan-এর অনুপ্রেরণায় ঐতিহাসিক নাটকের চর্চা শুরু হল। জাতীয়তাবাদ পুষ্টি নিল বঙ্কিমের আনন্দমঠ থেকে। দেশের রাজনৈতিক শ্লোগান হল 'বন্দেমাতরম'। ১৯০৩ সালে বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব এই শ্লোগানকে করলো বলীয়ান। স্বদেশ ও বিদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় —কংগ্রেসের নিরুত্তাপ কর্মপন্থা উদীয়মান জঙ্গী জাতীয়তাবাদ, টিলকের নেতৃত্বে মুক্তি আন্দোলন, বহির্বিশ্বে আবিসিনিয়ায় ইতালীর পরাজয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ, জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় ভারতীয় সংগ্রামীদের মনে ক্রমাগত রাজনীতির নূতন চেতনা উন্মোচিত করতে থাকে।

বিশ্ব রাজনীতির পটপরিবর্তন দ্রুত হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) এবং ১৯১৭-এর রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বরাজনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটালো। তারপরেই দেখি ভারতবর্ষের জালিয়ানাবাগ গণ হত্যা (১৯১৯) গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) পেশোয়ারে মস্কো ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২২-২৩) মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯-৩৩) জনমানসে নূতন রাজনীতির চেতনা এনে দিল। ১৯৩০ সালে হিজলীর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর গুলিবর্ষণ বাংলা দেশে এক তুমুল আন্দোলন এনে দিল— মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকে, নজরুলের কণ্ঠে এল 'লাথি মার ভাঙ্গরে তালা, যতসব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা।' সুরেন্দ্র বিনোদিনীর পর এই প্রথম আবার নিয়ে এলো প্রত্যক্ষ রাজনীতি। কারাগারের কংস যেন ব্রিটিশ শাসন। 'গজানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনে বৃটিশ শাসন হয়েছিল জনমানসে হেয়। আর কারাগার নাটকে এলো ঘৃণা। R. N. Reid সাহেব বন্ধ করলেন 'কারাগারের' অভিনয়। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সাঙ্কেতিকতার পরিচয় পেলেন বৃটিশ সরকার। অমৃতবাজার পত্রিকা ব্যঙ্গোক্তি করলো বৃটিশ আচরণের—'if germs of sedition can be discovered in this book then we believe very little in the ancient Epics and Purans of the Hindus can be considered safe by the authorities.'। 'দ্বাপর যুগের কারাগারের সঙ্গে এই কলিযুগের কারাগারের সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন' (আনন্দবাজার)। সুরু হল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের অত্যাচার, কমবিনেশন্ এ্যাক্ট, Dramatic performance control Act-এর দৌলতে শুরু হল বৃটিশ শাসনের সীমাহীন দম্ভ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর আস্তে আস্তে জন্ম নিল 'German truth'; বিশ্বরাজনীতিতে

মার্কসবাদকে রুখতে জন্ম নিল noble ও ignoble থিয়োরী।

১৯২১ সালে ১লা ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩৬-তম অধিবেশনে বিতড়িত হল ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম ইশ্‌তিহার। এর পটভূমিকা যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় শিল্পের বিকাশ উদীয়মান শিল্পপতিদের সঙ্গে কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলন। ইশ্‌তাহারে লেখা হল :

'এটা কি সত্য নয় যে ধনী ভারতীয় কলকারখানায় যে লক্ষ লক্ষ মজুর প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছে সেখানে তারা যে ব্যবহার পায় তাতে যে কোন মুহূর্তে বিক্ষোভে ফেটে পড়া উচিত। এই ধনী ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা আবার আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়। অসহযোগের উদ্‌গাতা ঘোষণা করেছেন : 'কারখানার মজুরকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বিপজ্জনক।'

কমিউনিষ্ট পার্টি চিন্তা করলেন শহরের মেহনতী মানুষ আর গ্রামের অগণিত নিরক্ষর জনসাধারণকে আন্দোলনে টেনে আনতে পারলেই সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। এই শিশু কমিউনিষ্ট পার্টি ধরে ফেলেছিলেন সেদিনকার সংগ্রামের রূপটিকে। "The quarrel between imperialism and the upper classes of Indian society is a quarrel over the booty'—কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি শুরু হল কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপ। ইতিমধ্যেই হিটলার হুঙ্কার দিলেন 'যে গণতন্ত্রের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মার্কসবাদের বীজানু'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই জন্ম নিল ১৯৪২ এর ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কালচারাল ফ্রন্ট। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে জন্ম নিল I. P. T. A. বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। Marx-এর কথাটা মেনে নিয়ে এরা programme নিলেন।

The worried poverty stricken man has no mind for the finest play, the dealer in metals sees only the market value, not the beauty and originality of the metals. মার্কসের এই থিয়োরীর উপর গড়ে উঠলো কমিউনিষ্ট পার্টির কালচারাল ফ্রন্ট। এই প্রথম আমরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত programme পেলাম। গণনাট্য সংঘ ঘোষণা করলেন "বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘা খেয়ে খেয়ে অসন্তোষে বিষিয়ে উঠেছে মানুষের মন, এই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েই গণনাট্য আন্দোলন নতুন সত্তায় সম্পদশালী হয়ে উঠতে প্রয়াস পেল। সেই দিক দিয়ে এই আবির্ভাব ঐতিহাসিক।

এই সংঘের কাজ হল যেমনি এক দিকে স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা তেমনি অন্য দিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা জনগণের ব্যাপ্তির মধ্যে টেনে এনে। এই গণসংযোগের মধ্য দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুন ভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। মানুষকে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে সংস্কৃতির দান অনস্বীকার্য। তাই এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে অগ্রসর চলেছে।"

এই অগ্রসরের মূলে আত্মপ্রকাশ 'নবান্ন' নাটকের। প্রসেনিয়ামের দেওয়াল ভেঙ্গে 'নবান্ন' নাটক নিয়ে

এলো স্টেজের মুক্তি। যে রাজনীতির নাটককে কেন্দ্র করে বাংলায় থিয়েটারের ভিত্তি রচনা হয়েছিল সেই পেশাদারী থিয়েটারের ভিত্তিটাই ভেঙে দিল 'নবান্ন' নাটক। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকের মূল বিষয়বস্তু সেই গ্রাম বাংলা। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত গ্রামবাংলার সমগ্র শ্রেণী সত্তা। এ নাটক যেন মার্কসের সংজ্ঞাকে রূপ দিল 'Objectivigation of human existence, both in a theoretical and practical way means making man's senses human as well as creating human senses corresponding to the vast richness of human and natural life'. নবান্ন নাটকের সামগ্রিক কাঠামো এই সংজ্ঞার ভিতরে। বিজন ভট্টাচার্যের কথায় 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন জমি চাষ করবে আর কমিউনিষ্ট পার্টি তাতে ফসল বুনবে।'

বিজন ভট্টাচার্যের নিজের কথা 'বাস্তববাদী হলেও আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি। উজ্জ্বল এক ভবিষ্যত জীবনের স্বপ্ন।' শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার সেই স্বপ্ন 'নবান্ন' নাটক। বিজন ভট্টাচার্যকে লেখা এক ভিনদেশীয় পাইলট লিখেছিলেন 'আঙুরের যন্ত্রণা থেকেই মদের গৌরবের উন্মেষ। জাতির যন্ত্রণা থেকেই জাতির গৌরবের উন্মেষ'। সেই গৌরবের উন্মেষ ঘটেছিল 'নবান্ন' নাটকে। বাংলা রাজনীতির নাটকের সেই হানিফ্, তোরাপ, সুরেন্দ্র, কৃষ্ণ, সব্যসাচী সবাই একত্রিত হলেন নবান্নের আশায়। মুক্তির এই স্বপ্ন এই সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি বাংলা নাটকের। ▭

গ্রন্থ নির্দেশ :

১। Contemporary Indian Philosophy (London 1936)। ২। বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। ৩। বিশ্বইতিহাস প্রসঙ্গ—জহরলাল নেহেরু। ৪। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন, (২য় খণ্ড) ৫। বক্তব্য—ধূর্জটিপ্রসাদ। ৬। আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্টপার্টি (১৯২১-৩৯) –মুজফ্ফর আমেদ। ৭। Left wing in India—L. P. Sinha। ৮। Marx on Literature and Art। ৯। The Ancestary of facism—B. Russell। ১০। বঙ্গদর্শন পত্রিকা। ১১। নবজীবন পত্রিকা। ভক্তি প্রবন্ধ পৃঃ ৪৯৩, রাজপদ ও অধীনতা পৃঃ ৫০৭ ও ৫১২। ১২। অভিনয় পত্রিকা। ১৩। এপিক থিয়েটার পত্রিকা। ১৪। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৫। অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৬। ব্রাহ্মসমাজ সংগ্রহ।

*** অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে একটি দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকার/পুনঃপ্রকাশ

কমিউনিস্ট আন্দোলনই আমাকে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তৈরী করেছে

কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংশ্রবে না এলে, কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য না হলে, আমি বিজন ভট্টাচার্য হতাম না, আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তা করাও সম্ভব হত না। খুব স্পষ্ট করেই এটা লিখবেন— উঠে আসার সময় বেশ জোর দিয়ে বললেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, আমাদের প্রিয় বিজনদা।

নাট্যকার হিসাবে বিজনদা, অভিনেত্রী মলিনা দেবী এবং সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে ইন্দুবালা দেবী অ্যাকাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন শুনে কালান্তর পত্রিকার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলাম বিজনদাকে ভবানীপুরের রাজেন্দ্র রোডে, শীতের দুপুর তখন শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে রয়েছে। তার চেয়েও প্রশান্ত ছায়া বিছান রয়েছে বিজনদার ঘরে। খাঁচায় পোষা রয়েছে তিনটে ঘুঘু, একটা কাঠবেড়ালী, একটি বুলবুলি, একটি টিয়া. আশপাশে তাদের নিয়ে খাটের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে কিউবার কমিউনিষ্ট পার্টির কাগজ 'প্রাণমা' পড়ছেন বিজনদা। এপাশের দেওয়ালে মার্কসের একটি বড় ছবি, কিছু অভিনন্দন আর অন্যান্য ছবিতে ঠাসা।

বিজনদা বললেন ৩০-৩৫ বছর এই বাড়িতে আছি। এ বাড়িতেই মা, বাবা মারা গেছেন। এখন বাড়িওয়ালা চাইছে উচ্ছেদ করতে। কিন্তু এত স্মৃতি ফেলে কোথায় যাব। লড়াই করে টিঁকে আছি।

আমার একটির পর একটি প্রশ্নে স্মৃতিচারণা করে চললেন বিজনদা। জন্ম ১৯১৭ সালের ১৭ জুলাই। বাড়ি ফরিদপুর জেলার খানখানাপুরে। দশ বছর পর্যন্ত ওখানেই কেটেছে। বাবা ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। নানান জায়গায় চাকরি করেছেন বাবা, সেই সূত্রে সেই বাল্যকালে ঘুরেছি মেদিনীপুর, বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চল। এইভাবে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত— পদ্মার পার থেকে পশ্চিমবাংলায় নানা এলাকায় বসবাস করার সুযোগ হয়েছে। তারপর এলাম কলকাতায় পড়তে। আশুতোষ কলেজ, রিপন কলেজে পড়েছি। বোর্ডিং-এ থাকতাম তখন। সেই সময় যোগ দিই ছাত্র আন্দোলনে। তারপর এস. এফ.-এ., পরে কমিউনিস্ট পার্টির সারাক্ষণের কর্মী।

আমার বড় মামা সত্যেন্দ্র মজুমদার ছিলেন তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। সেই সূত্রে তখন আনন্দবাজারে কিছুটা সাংবাদিকদের কাজ করতাম। সে সময় আনন্দবাজারে লিখেছি প্রবন্ধ, গল্প, এইসব। 'এ থেকে নাট্য আন্দোলনে কি করে এলেন'—আমার প্রশ্ন শুনে একটু চুপ করে রইলেন বিজনদা। তারপর বললেন 'আমি, চিনু, সুভাষ আমরা তখন ভাবতাম কি করা যায়। ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে তখন প্রগতি সংস্কৃতির জমজমাট আসর। সেখানে যেতে যেতে মনে হল নাট্য আন্দোলন শুরু করা দরকার। তাই লিখলাম 'জবানবন্দী' নাটক। সেটা সম্ভবত ১৯৪২-৪৩ সাল। প্রথম নাটক লেখার পর প্রচণ্ড ভয় ছিল মনে। ভেবেছিলাম লোকে হয়ত এ নাটক নেবে না।

কিন্তু দেখলাম লোকে নিল। এই নাটক থেকে পি.আর. সি. ফাণ্ডে প্রচুর টাকা উঠল।

এরপরে লিখলাম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন' এই নাটক একটা আলোড়ন এনে দিল সাংস্কৃতিক জগতে। মনে পড়ে একদিনের ঘটনা। শিশির ভাদুড়ী আর বিশ্বনাথ ভাদুড়ী দিনের পর দিন আসতেন এই নাটকের অভিনয় দেখতে। সেদিন যে উইংস দিয়ে আমি প্রস্থান করব তার মুখে দাঁড়িয়ে দুভাই তন্ময় হয়ে অভিনয় দেখছেন। আমি অভিনয়ের গতিতে ছুটে বেড়িয়ে যেতে গিয়ে শিশিরবাবুকে দিলাম এক ধাক্কা, বললাম, 'আক্কেল নেই। উইংস আটকে দাঁড়িয়ে আছেন।'

বলেই মুখ তুলে দেখি শিশির ভাদুড়ী। 'আমার তখন মা ধরিত্রী দ্বিধা হও' অবস্থা। বার বার ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু শিশিরবাবু আমায় সমর্থন করে বললেন, 'ঠিক বলেছ বিজন আই হ্যাভ ক্রেসড মাই লিমিট'। প্রগতি শিবিরে টেনেছিলাম তবে তিনি মেজাজে ছিলেন 'সম্রাট আলমগীর'। সাধারণের সঙ্গে পঙক্তি ভোজনে তাঁর আপত্তি ছিল।

আর একবারের ঘটনা। নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্য এবং তখনকার অবিভক্ত বাঙলার আইনসভার সব সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হল নাটক দেখতে। নাটক দেখে মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সারওয়ার্দিকে ডেকে বললেন, 'এই নাট্যকারকে এখনও গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হয় নি কেন?' এছাড়া প্রতিটি জেলায় ঘুরেছি এ নাটক নিয়ে। হাজার হাজার মানুষ এ নাটক দেখে প্রেরণা পেয়েছেন, আমাদের প্রেরণা দিয়েছেন।

এই নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারে আমি একজন কারো নাম করব না। আমরা সবাই মিলে প্রাণ ঢেলে অভিনয় করতাম তখন।

একটু থামলেন বিজনদা। তারপরে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, কুড়ি পঁচিশখানা কি তারও বেশী নাটক লিখেছি। সব নাটক ছাপা হয়নি এখনও। বন্ধুরা জোর করে যা ছেপেছেন তাই বই হয়েছে। চিন্মোহন না থাকলে এগুলোও বোধহয় বই হয়ে বেরুত না। এখন তৈরি করছি দুখানা নাটক। 'চল সাগরে' অর্থাৎ সব নদীকে শেষ পর্যন্ত সাগরে মিলতে হবে। অপরটি ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যার ওপর।

বিজনদা বললেন, 'একটা আপশোষ কি জানেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ত্রিশ বছর হয়ে গেল এখনও একটা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ হল না। আমরা সরকারের কাছে মাইনে চাই না। টাকা পয়সা চাই না। আমরা চাই একটা স্টেজ। সেখানে আমরা অভিনয় করে নিজেদের চালিয়ে নিতে পারব'।

'রবীন্দ্র সদন যখন হল তখন কথা ছিল এটা থেকে মুনাফা করা হবে না। কিন্তু এখন হচ্ছে। কাকে এ কথা বলব আর কেই বা শুনবে। একাডেমী পুরস্কার দু' একজন পেতে পারেন। কিন্তু নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব লোকদের একটি মাত্র দাবি 'a hay may be awarded with a stage.'

তন্ময় হয়ে বলে চললেন বিজনদা, 'মানুষের মাঝখানে যেতে চাই। মানুষ মাত্রেই শিল্পগত প্রাণ। যেখানে মানুষ সেখানেই শিল্প। কিন্তু আর্থিক এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্যে শিল্প বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।'

আরও দুচারটে কথা হল বিজনদার সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে কি মনে হয়?' বিজনদা বললেন, 'ষাট বছর বয়স হল এখনও স্বপ্ন দেখি এ ব্যবদ্ধ প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব বলে। প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন গড়ে না উঠলে প্রগতিশীল আন্দোলনও দানা বাঁধবে না। সেইযুগে আমি পি সি জোশীকে বলতাম, 'আই উইল সফন দি সয়েল অ্যাণ্ড ইউ উইল সো দি সিড।' আজও আমি তাই মনে করি। সাংস্কৃতিক আন্দোলন জমি চাষ করবে আর কমিউনিষ্ট পার্টি তাতে ফসল বুনবে। এমনিভাবেই এগুতে হবে আমাদের। আমার নাটক যেমন হাজার হাজার দর্শককে আকৃষ্ট করেছে তেমনি কমিউনিষ্ট আন্দোলনে না এলে নাট্যকার হতাম না। আমার পক্ষে নাটক লেখা সম্ভব হত না।'

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। বিজনদা বললেন, 'স্পষ্ট করে লিখবেন এটা। জানবেন আমি আজও স্বপ্ন দেখি প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার।'

— দৈনিক কালান্তর। ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৬

গণনাট্য আন্দোলনে সেকাল ও একাল। বিজন ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিকে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বোধোদয়ের কালাকাল বলা যেতে পারে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ভেতর দিয়ে যে বোধের শুভ উদ্বোধন হল দীর্ঘ বৎসর অবসানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আইনীকরণের পর ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে, সেই সমাজতান্ত্রিক চৈতন্য বোধের স্ফুরণ ও বিকাশ সম্ভব হলো। একটা গণতান্ত্রিক জীবনবোধ ন্যাশনাল সোশ্যালিজম বা ফ্যসিষ্টতন্ত্রের সঙ্গে পরোক্ষ-ভাবে মোকাবিলা করতে গিয়ে অনুন্নত এই উপনিবেশেও মূর্ত হয়ে উঠল নবজীবনের সজীবতায়। দৃষ্টিকোণে এল ডায়ালেকটিক্‌সবাদ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নতুন করে জীবনকে জানতে বুঝতে আরম্ভ করলাম।

আমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের কথা বলছি। তখনও ভরাডুবি হয় নি। ধূমাবতীর পদক্ষেপ শোনা গেছে, কিন্তু তখনও মহামন্বন্তর আসে নি। দেশভাগ হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির দ্বিমুখী রাজনীতির অভ্রান্ত চক্রান্তের ফলে রক্তগঙ্গায় চাঁদ বেনের স্বাধীনতার সপ্তডিঙ্গি তখনও ভেসে ওঠে নি। দুঃখ শোক তখনও ছিল অব্যাহত। হা অন্নের দেশে 'কুকুরের' অন্নমন্ত্র গান তখনও শাস্ত্রীয় প্রথায় উদ্‌গীথ হতো। কিন্তু রাজনৈতিক ধন্বন্তরীদের সম্পর্কে তখনও আমাদের সন্দিগ্ধ বিশ্বাস ছিল। তাই স্বাধীনতার অধিবাস পর্বে কংগ্রেসী সুবলের অভিষেকের আড়ালে গোটা দেশটাকে ভাগ করবার যে মুঘলী চক্রান্ত চলছিল, তখন ছয় পুত্র শোকে মূহ্যমান মা সনকাকে আমরা আশ্বাস দিয়ে বলেছি— মাগো, তুমি কেঁদো না। ময়ূর নকুল পরিবৃত— ভেষজ তাবৎ বিশল্যকরণীর একমাত্র সন্ধানী মহাশক্তিধর ধন্বন্তরীরা তোমার সহায়। তোমার ভয় কোথায়?

কিন্তু সান্ত্বনায় কোন কাজ হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অনিবার্য অভিশাপ ধুরন্ধর ধন্ব-ন্তরীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শেষ পর্যন্ত গোটা দেশটাকে ভাসানো ভেলায় জলাঞ্জলি দিয়েছে দুঃখ নিরাশার অথৈ পাথারে। আর উথাল-পাথাল সেই বিশাল পরিধির তটপ্রান্তে আমরা দেখেছি দুখিনী জননী মা সনকাকে; শত-ছিন্ন বসনে অধীর আগ্রহে সেই ভাসানো

ভেলার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন। মান্দাস ভেলা আজও ফিরে আসে নি। সাম্রাজ্যবাদী কোন ইন্দ্রপ্রস্থেই সতী বেহুলা আজও কোন ইন্দ্রদেবের মনোরঞ্জন করতে পারে নি। এদিকে ঝাড়ফুঁক-তন্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্রে বিশ্বাসী আমরা সেই ধন্বন্তরীদেরই মার্জিত উত্তরাধিকার; বহু বিচ্ছিন্ন। মা সনকার দুঃখ মোচনের চাইতে আজ দলগত স্বার্থ ও দলগত মন্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সাধনাযজ্ঞের কোন ভস্মই আজ আর আমাদের কোন ধন্বন্তরীকে অশিবনাশী নিরাসক্ত ত্রিশূলীর বৈপ্লবিক সমাহিতি দিতে পারছে না। কেন না মার্কস এঙ্গেলস লেনিন বিধৃত জাগতিক দুঃখশোকের নিরসনতন্ত্র একমাত্র নিরাসক্ত জ্ঞানবর্ত্মেই জনগণের সেবক ভক্তজন মনেই প্রতিভাত হতে পারে। আসক্তির পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত প্রবৃত্তিমার্গের ভ্রষ্ট যাজ্ঞিকদের এই সহজ সত্যটি জানবার বোঝবার কোন উপায় নেই।

তাই গান্ধীজী প্রবর্তিত "Do or die" আগষ্ট বিপ্লবে যে মা সনকাকে দেখেছি মেদিনীপুরে, সেই মাকেই দেখেছি পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরের কলকাতার রাস্তায় বাটি হাতে কাঁদতে। দাঙ্গার সময় সেই মায়েরই দেখেছি ছিন্নমস্তা রূপ। নিজের রুধির নিজেই পান করে বলাধান করে নিচ্ছেন মা। কাঁখে কোলে মা ষষ্ঠীর দান সেই মাকেই দেখেছি বাস্তু হারিয়ে এসেছেন দেশ ঘর ফেলে শিয়ালদহ ষ্টেশনে। পরণে ছিন্নবাস, আলুথালু বেশ,— স্বামীপুত্র খেয়ে ক্ষুধার্ত মায়ের তখনও আকণ্ঠ ভরে আছে। আবার সেই মা-ই হয়েছেন কাকদ্বীপে অহল্যা পাষাণী। মৃত্যুর সময় বলে গেছেন, আমি কোন রামচন্দ্রের জন্য এখানেই প্রতীক্ষা করে থাকবো। কোথায় কাকদ্বীপ, আর কোথায় তেলেঙ্গানা! মান্দাসভেলা ফিরে আসছে বলে দুঃখিনী মা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন উল্কার মত। সামনা সামনি পড়লে আমরা সেদিনও মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি— ভরসা রাখো, আমরা তোমার সোনার বেহুলা লক্ষীন্দরকে ফিরিয়ে এনে দেবো। মায়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলবার সততা ছিল না আমাদের। তাই দু-একটা আশ্বাসের কথা বলেই আমরা উধাও হয়ে গেছি সেই কালো জলাশয়ের মত ঠাণ্ডা দু-চোখের গভীরে প্রচ্ছন্ন একটা আগুন দেখে— যে আগুন আমরা জানি লুকিয়েছিল মায়ের অন্তরে অনেক, অনেক দিন থেকে।

তা এই ভাসানো ভেলা আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে মা সনকার সেই নিদারুণ দুঃখ বেদনার কাহিনী ধন্বন্তরীদের আশপাশে থেকে চারণ হিসেবে রূপ দিয়ে আসছিলাম আমরা অর্থাৎ গণনাট্য সঙ্ঘের কর্মীরা, বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালাকাল থেকে। এই চারণদের মধ্যে আজ অনেকেই বেঁচে বর্তে আছেন, কেউ সুখে, কেউ দুঃখে— আবার কেউ কেউ সুখ দুঃখের অতীত হয়ে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি আমার প্রিয়বন্ধু স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যকে যাঁর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও সাহচর্য আমার তদানান্তনকালীন নাট্যকর্মে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। বাস্তববাদী হলেও আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি— উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন। স্মৃতিকথার রোমন্থন আমার ঠিক স্বভাবে আসে না। তবু অতীতকে জড়িয়েই বর্তমান, ভবিষ্যৎ। প্রত্যক্ষ মহীরুহ ও তার অনাগত কিশলয়, নবমঞ্জরী, বিধৃত হয়ে থাকে মাটির

সুগভীর স্তরে সহস্রমুখী জটা ও শিকড়কে আশ্রয় করে,—যার বর্তমান ও ভবিষ্যতের গোটা সম্ভাবনাটাই প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়েছিল একদিন একটি বীজ-এর মধ্যে। স্মৃতি-কে ধরেই শ্রুতি। তাই বিগত সোনার খাঁচার দিনগুলির কথা হয়তো এখানে অবান্তর হবে না।

সমাজতান্ত্রিক রদবদলের দিনে আসরে সেদিন সবাই ছিল, সবাই বসতো। যুগ চেতনার সেই হ্লাদিনী শক্তির মানস সরোবরে গণ্ডুষে জলপান করতে যেমন আসতেন তদানীন্তনকালীন সাংস্কৃতিক জগতের দিকপালগণ, তেমনি আসতো জীবন যন্ত্রণার দাহ নিয়ে তরুণ যুবা, হয় তো বা নিষ্ফলভাবেই মাথা কুটতে। আমি প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রাথমিক কালাকালের কথা বলছি।

গ্রামীণ কোন 'মোচ্ছব' বা 'অষ্টপ্রহর' জাতীয় কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় যাঁদের আছে তাঁরা আমার কথার যাথার্থ্য অনুধাবন করতে পারবেন। ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিট-এর কার্যকরী দপ্তর খোলা কি বন্ধ, প্রাণোৎসবের সেই সাবলীল আবহ কখনই থামতো না। দপ্তর যখন বন্ধ সাংস্কৃতিক কর্মীরা তখন মাঠে ময়দানে অলি গলিতে রেস্তোরাঁ কাফেতে আসর জাঁকিয়ে বসতেন। সকলের মুখেই প্রাণোৎসবের কথা, জীবনের কথা, নাট্যের কথা। এ যেন সেই রোম্যানদের তাঁবে প্রাচীন প্যালেষ্টাইনের যু-দের মত আকাশের দিকে মুখ করে থাকা— একটা কিছু হবেই— কোন একটা miracle.

আমাদের দেখাদেখি সেদিন আমাদের অগ্রগামীরাও হাত দিয়ে সূর্য আড়াল করে আকাশের দিকে মুখ করে এসে দাঁড়ালেন। সংশয় ও মলিনতা সে দিন তাঁদেরও ধুয়ে মুছে গিয়েছিল আমাদের প্রাণস্ফূর্তিতে। প্রবীণ সাহিত্যিক তারাশঙ্করের চোখে পঞ্চগ্রাম ও গণদেবতা হয়তে বা সেদিন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহিষের দেবতা টাঁড় বাবার মত প্রতীয়মান হয়েছিল।

রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিল্পীর দায়ভার আজ গোটা দেশের মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা। রাজনীতিক দেখবেন এক চোখে। কেন না দু চোখ খুলে দেখবার ব্যাপারটা তাঁর ধর্মে বারণ আছে। কিন্তু শিল্পী দেখবেন তাঁর খোলা দুচোখে। সাধারণ মানুষের জান-এর লড়াই-এর সঙ্গে প্রাণের লড়াই-ও তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে। শিল্পী হিসেবে এই দায় আমি আজ সমধিক বলেই বিশ্বাস করি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ করি অপেক্ষাই করছিলেন। ছুটে এসে রাখী বাঁধলেন হাতে। চারণদের মধ্যে সব চেয়ে মনে পড়ে আজ যারা নেই। সকলের সন্ধান জানি না। তবে মনে পড়ে স্বর্ণকমল-কে। মনে পড়ে সুকান্ত-কে। কাঁটার মত এখনও যে বিঁধে আছে বুকে। 'অরণি' পত্রিকার অফিস থেকে ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে রোজ বৌবাজার গণনাট্যসঙ্ঘের অফিসে আসা আর সেই পয়সায় দু'জনের দু'খুরি দুধ খাওয়ার পরও আমি আছি অথচ সুকান্ত নেই, কথাটা যেন ভাবতে পারি না। পরে জেনেছিলাম অত দাহ নিয়ে বাঁচা যায় না। দাহ হয় দগ্ধায় নয় দগ্ধে। পোড়াতে গিয়েই পুড়ে মরে গেছে সুকান্ত। অগ্নিবর্ণ শায়কের মতই রেখে গেছে একগুচ্ছ কবিতা, সাগ্নিক চারণদের কাজে লাগবে যজ্ঞশালে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গণনাট্য-সঙ্ঘ ছিল প্রগতি লেখক সঙ্ঘেরই একটি শাখামাত্র। নাট্যের ক্ষেত্রে আজ যাঁরা অপরিজ্ঞাত বস্তুত তাঁরাই ছিলেন এই গণনাট্য সংঙ্ঘের পৃষ্টপোষক। প্রসঙ্গত এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সেক্রেটারী পূরণ চাঁদ যোশী ও চিন্মোহন সেহানবীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংগীতে কি নাটকে কোন দিনও অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু বেসুরো গলায় তাঁর সেই আন্তরিক অনধিকারচর্চা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টায় সর্বদাই রসদ যুগিয়েছে। রাত এগারোটার পর সঙ্ঘের কাজ কর্ম শেষ করে আমরা যখন শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরতাম গণনাট্য সঙ্ঘের সব জঙ্গী গান গাইতে গাইতে তাতে যোগ দিতেন কবি অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুভায তো থাকবেই, জোতিরন্দ্র মৈত্র শম্ভু মিত্র ও আরও অনেকে। অনেকদিন ট্রাম কণ্ডাকটর-রাও আমাদের সুরে সুর মেলাতেন। সমবেত সঙ্গীতে সবারই সমান অধিকার ছিল। বিনয় রায়, হারীন চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ করে বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান তখন সারা বাংলাদেশে কোরাস সঙ্গীতে এক নতুন প্রাণশক্তির জোয়ার এনেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের নাম উল্লেখ না করা অমার্জনীয় হবে। কেন না বন্ধুবর, দেবব্রত ওরফে জর্জ না থাকলে আমার ঐকতান অর্থাৎ দামুকদিয়ার চাচার গান কোনদিনই সার্থক হতো না। আমাদের তদানীন্তন সঙ্গীত অনুষ্ঠানে দেবব্রত ছিলেন স্থির ভরসা। রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে সুচিত্রা মিত্র আজকের মত সেদিনও ছিলেন মধ্যমণি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরাও গণনাট্যসঙ্ঘের বহু অনুষ্ঠানে অকৃপণভাবে অংশ গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে দেশের মধ্যে দশের মানসে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। অনুজপ্রতিম সুরশিল্পী সলিল চৌধুরী এই গাঙেই পরে বান ডাকিয়ে ছিলেন। সমবেত সঙ্গীতে গণনাট্যের এই ধারাই এখনও দেশের মধ্যে মোটামুটিভাবে প্রবহমান বলা যায়। নতুন কোন সুরকার এই প্রবহমান ধারায় যুগচেতনার কোন বলিষ্ঠ ছোঁয়াচ লাগাতে পারে নি।

সংগীতের ক্ষেত্রে যেমন, নাটকের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কেন না নকসালবাড়ীর আদিবাসী কৃষকরমণী খুন যদি কাকদ্বীপের মা অহল্যা হত্যা, কি মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরার স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে নাটকে সংগীতে তার প্রলয়ঙ্কর অনুরণন ঘুণাক্ষরেও

ধরাপড়ে না কেন ? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যেতে পারে হয় তো কঠিন আত্ম বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে। আশঙ্কা হয়, জিজ্ঞাসাই উপায় হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে মনের দরজায় আড়কাঠি হয়ে বিশ্লেষণের পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কঠিন একটা আত্মপ্রবঞ্চনা চলছে মনের আড়ালে। এই যদি রীতকানুন হয় সত্য বিশ্লেষণের তা হলে কী সংগীত, কী নাট্যকর্ম— যেটা একান্তই সৃষ্টিশীল, শিল্পকর্মের ধারে কাছে আসবে না। রবিনহুডী কায়দার এডভেঞ্চারী কোন শিল্পকর্মই আদিবাসী রক্তের ধার রক্তে শুধবে না।

গণনাট্য সঙ্ঘের কথা বলতে গিয়ে রাজনীতির কথা স্বতঃই এসে পড়ে। কেন না রাজনীতি-বিবর্জিত শিল্পকর্মের কথা, কী সংগীতে কী নাট্য চিন্তায়, ভাবনায়, অন্তত গণনাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবা যায় না। তাই বলে নিছক রাজনীতি প্রভাবিত কোন শিল্পকর্মই কিন্তু শিল্পের পর্যায়ে ওৎরাবে না। ইমোশান ও ভাবরাজ্যে যার আনাগোনা সেখানে সবসময় লাঠিবাজী চলে না। মুষ্টিবদ্ধ আস্ফালন অনেক সময়ই জ'লো বলে মনে হয়। আবেদন নিবেদন সাধারণ মানুষের অন্তরে পৌঁছায় না। প্রগতিশীল শিল্পকর্মে এই 'টাইপ রোপ ওয়াকিং' শিল্পীকে জনসাধারণের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে বহু আয়াসে আয়ত্ত করতে হয়। এই সজ্ঞান বোধের অন্য কোন 'শর্ট কাট' নেই। জনসাধারণের সঙ্গে থেকে তাদের চোখ দিয়ে দেখা, আবার শিল্পসৃষ্টির সময় জনসাধারণের বাইরে এসে শিল্পীর চোখে দেখা, যুগপৎ এই দর্শন প্রকরণের ভেতর দিয়েই সত্য নিরূপণ করা সম্ভব।

গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যকর্মে যখন ব্যস্ত ছিলাম, তখন এই ভাবেই আমরা দেখতে অভ্যাস করেছিলাম। বাংলাদেশের জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে আমরা যখন নাটক নিয়ে গিয়েছি, সংগীতের আসর বসিয়েছি তখন সাড়া যেটুকু পেয়েছিলাম আমরা, এই কর্মগুণেই। সে এক অভূতপূর্ব প্রাণস্পন্দন। কলকাতা ও বৃহত্তর বাংলাদেশে— যেখানেই আমরা নাটক নিয়ে গিয়েছি সেখানেই জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা অকুণ্ঠ সাধুবাদ পেয়েছি। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত

মানুষের কল্যাণে রুটির লড়াই-এর সঙ্গে প্রাণের লড়াইকে একসূত্রে বেঁধে নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই গণনাট্যের মর্মকথা। মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও শিল্পকর্মের প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাই গণনাট্য শিল্পকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা দিতে পারে।

মহল থেকে 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' সম্পর্কে আমরা প্রচণ্ড সমর্থন পেয়েছি। কৃষক সম্মেলনেও আমাদের নাট্যানুষ্ঠান অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। নাট্যানুষ্ঠান সেদিন সত্যিই প্রকৃত গণনাট্য আন্দোলনের দিকে সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেই নাট্য আন্দোলনকে পরে আর দুর্বার গতিতে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় নি। কিন্তু প্রাণোৎসবের সেই প্রবহমান ধারায় কোনদিন কিন্তু ছেদও পড়ে নি। নাটকের আন্দোলন তার পরেও বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে। সেই গণনাট্য সঙ্ঘই আজ বাংলা দেশের সমস্ত শহর গ্রামে রক্তবীজের মত ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু পরিমাণগত ব্যাপ্তি এখন অবশ্যই গুণগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অপেক্ষা রাখে। দৈহিক রসদ যোগান দেবার তাগিদে প্রাণের রসদ যোগাবার দায়িত্বের কথা অস্বীকার করা গণনাট্যের সংবিধান বহির্ভূত। এখানে রাজনীতিকের চাইতেও শিল্পীর দায়িত্ব সমধিক। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিল্পীর দায়ভার আজ গোটা দেশের মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা। রাজনীতিক দেখবেন এক চোখে। কেন না দু'চোখ খুলে দেখবার ব্যাপারটা তাঁর ধর্মে বারণ আছে। কিন্তু শিল্পী দেখবেন তাঁর খোলা দুচোখে। সাধারণ মানুষের জান-এর লড়াই-এর সঙ্গে প্রাণের লড়াই-ও তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে। শিল্পী হিসেবে এই দায় আমি আজ সমধিক বলেই বিশ্বাস করি।

প্রবচন আছে—চুরি বিদ্যা মহা বিদ্যা, যদি না পড় ধরা। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই কারচুপির রেওয়াজ আছে। অর্থাৎ যুগপৎ গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলে গৃহস্থের ঘরেই সিঁধকাঠি দাও; যতদিন না গৃহস্থের চৈতন্য হয়। শিল্পীকর্মে এই কারচুপি কিন্তু শিল্পেরই গলা টিপে মারে। সংগীত, নাটক, কি কাব্য—কোনটাই শিল্প হিসেবেই ওতরায় না।

প্রগতিশীল লেখক শিল্পীর কার্যালয়ে সেদিন আরও অনেকে আসতেন। প্রবীণদের মধ্যে আসতেন ডঃ ভূপেন দত্ত। একদিনের কথা মনে পড়ে। কথার ফাঁকে হঠাৎ করোটির মাপ নিয়ে বল্লেন, ভট্টাচার্য তুই কোন কালেই নোস। আদিতে তোরা ছিলি 'মোছলমান'। কুলুজী কোষ্ঠী নিয়ে টানাটানি করে ডঃ দত্ত অনেককেই বিব্রত করতেন। সবাইকেই কিন্তু নাচার হয়ে শুনতে হতো। অতবড় পণ্ডিত লোক। অথচ ধর্মতলায় এসে আড্ডা না দিলে তারও ভাল লাগতো না। প্রায়ই আসতেন।

একদিন দেখা হয়েছিল প্রফেসর নীডহ্যাম-এর সঙ্গে। বিজ্ঞানী প্রফেসর নীডহ্যাম! চোদ্দ বছর চীনে থাকার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছেন। শুনেছিলাম, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চীন থেকে ম্যালেরিয়া উৎখাত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি সুদীর্ঘ চোদ্দটি বছর।

নামী অনামী কতলোক কবে যে কোনদিন কোন সময় ঘুরে যেতেন তার কোন সীমাসংখ্যা নেই। মোট কথা আজ যাঁরা স্বনামধন্য শিল্পী, সাহিত্যিক, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বিজ্ঞানী কি রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয়— তাঁদের অনেকের সান্নিধ্যই আমরা প্রগতি লেখক শিল্পীর কার্যালয়ে লাভ করেছি। একদিন দেখি সোভিয়েত সুহৃৎ সঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রফেসর হীরেন মুখার্জীর সঙ্গে এসে খরতর একটি ছোট্ট মেয়ে রবীন্দ্রনাথের

'প্রশ্ন' কবিতাটি আবৃত্তি গলায় করছে। সুতীব্র জেহাদ শুনে দলে টানবো বলে উৎসাহিত বোধ করলাম। পরে শুনলাম, ছাত্রফ্রন্টেকাজ করে। গণনাট্য সঙ্ঘে টানা যাবে না। সবাই চিনবেন। ইনি গীতা মুখার্জি এল. এল. এ।

তখন যুদ্ধের কালাকাল। বিকেল হতেই অনেকদিন দলে দলে ইঙ্গমার্কিন বাহিনীর ছোট ছোট দল সঙ্ঘের অফিসে এসে ভিড় জমাতো। এঁদের অনেকেই ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা অনেকে বলতো, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমাদের ভুল বোঝানো হয়েছে। এখানে এসে দেখি তার কিছুই মিলছে না। রাস্তা ঘাটে বাঘ ভালুক সাপও নেই! আর তোমরাও দেখি শিক্ষিত মানুষের মতই চলাফেরা, কথাবার্তা বলো। দেশের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিত তারা আমাদের কাছে বার বার। একটা কথা এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এক কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন ছাড়া, কি ব্রিটিশ কি মার্কিন,— পারে তো এক জন আর একজনের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খায়। এত হিংসেহিংসি আত্মীয়তার সূত্রে অনাত্মীয় হলে যে বিদ্বেষ সচরাচর দেখা যায়, খানিকটা সেই রকমের আর কি! মারাত্মক শ্যোভানিজম্।

এই প্রসঙ্গে প্রগতি ভাবাপন্ন একজন বৃটিশ পাইলট-এর কথা মনে পড়ে। দল বেঁধে এরা 'নবান্ন' দেখেছে শ্রীরঙ্গমে। আমার সঙ্গে পরে আর দেখা হয় নি। তাই ফ্রন্ট থেকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছে! চিঠিখানার প্রতিলিপি দিলাম।
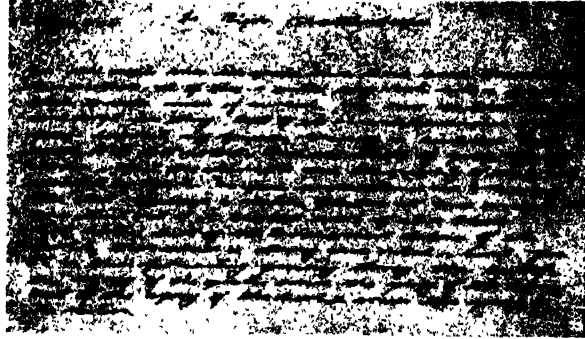
বিজন ভট্টাচার্যকে

২৭ শে মে, ১৯৪৫

আঙ্গুরের ক্ষেতে আঙ্গুরের মত মানুষকে পিষে ফেলা যায়, তাদের নিঙড়ে সমস্ত মাধুর্য কেড়ে নেওয়া যায়। শেষে তাদের দেখায় অন্তঃসারহীন নিষ্পেষিত জঞ্জালের মত। তুমি তা করতে পারো। কিন্তু একটা কথা ভুলো না। আঙ্গুলের ফসলের সেই দলিত অবশেষ থেকেই ব্র্যাণ্ডি চোলাই হয়! বেশী হয়ত নয়, কিন্তু প্রবল। এক চুমুক ভালো ব্র্যাণ্ডিতেই স্বাদ পাওয়া যায়

সমগ্র ধর্ষিত আঙ্গুরক্ষেতের চরিত্রের। আমার কথা বুঝতে পারছো? মানুষ ঐ রকমই। একটা জাতিকে নিঙড়ে নিতে পারো, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারো, তার শেষ রক্তবিন্দু নিঙড়ে নিতে পারো। কিন্তু শোন, মানুষের সেই নির্দিষ্ট ধ্বংসাবশেষ থেকেই এক সবল প্রাণবন্ত চেতনার উন্মেষ ঘটে। হ্যাঁ, ঐ মানুষের চেতনাই আলোড়িত হয়ে উঠছে, বাড়ছে, প্রবল হয়ে উঠছে। আঙ্গুরের যন্ত্রণা থেকেই মদের গৌরবের উন্মেষ। জাতির যন্ত্রণা থেকেই জাতির গৌরবের উন্মেষ। কাল রাত্রে যা দেখেছি, আমার নিজের কোন কথায় তা এতটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারব না। তোমার নাটকে ভারতের বেদনা ও প্রচ্ছন্ন চেতনার যে পরিচয় আমি পেয়েছি আগে কখনই তা এত স্পষ্ট ও প্রাণময়রূপে প্রত্যক্ষ করিনি। একজন ভারতীয় কমরেড আমাকে সবটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু অমন অভিনয়ে তার দরকার ছিল না। এই যুদ্ধের তীব্রতম ট্রাজেডি আমার চোখের সামনে উন্মোচিত হল দেখলাম। যন্ত্রণা, কষ্ট, অনাহার, দুর্নীতি, নৈতিক অধঃপতন, মৃত্যু সবই এমন স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমাকে যা আরো তিক্ত করে তুলল এই সব কিছুরই মূলে রয়েছে আমার নিজের জাতির ক্রূরতা। আমি শুধু বলব, তাদের ক্ষমা কর; তারা জানে না, তারা কি করছে। শেষে যে জাগ্রত চেতনার মূর্ত রূপ দেখলাম, সেই চেতনাই দেখছি ভারতে এসে।

ভারতে এসেছিলাম তিন বৎসর আগে। তখন আমি সাধারণ সৈনিক মাত্র, জীবনের প্রকৃত অর্থই তখনও বুঝিনি, মানবিকবাদ, যে ভারতীয় কমরেডরা আমাকে এত শিখিয়েছেন, আর ভারতবর্ষ আমার সমগ্র জীবনটাই পাল্টে দিয়েছে। মার্কস-এর কথায় বলতে গেলে, এই অভিজ্ঞতাই আমাকে স্পষ্টতা, চারিত্র্য, ও কাজ করার দৃষ্টিকোণ দিয়েছে; যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ভারতীয় কমরেডদের বুঝতে সাহায্য করেছে। শ্রেষ্ঠ যে সৈনিকদের পাশে দাঁড়িয়ে বা বিরুদ্ধে আমি লড়েছি, যুদ্ধ সেখানে তীব্রতম, তাদেরই মধ্যে আমি দেখেছি প্রাণপূর্ণ চেতনায় উদ্বেল ভারতীয় সৈনিকদের।

আমার ইচ্ছা, তোমার নাটক লণ্ডনে প্রযোজিত হোক। প্রত্যেক বৃটিশ নরনারী এই নাটক দেখুন। হাঁ, ইংরেজ জাতি ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু ভারতকে তার প্রকৃত সামর্থের পরিচয় দেবার সুযোগই দেওয়া হয় নি। ভারত যদি এক স্বাধীন জাতিরূপে তার সমূহ বৈষয়িক ও নৈতিক সম্পদ নিয়ে এক গণবাহিনী গঠন করে এই এই জনযুদ্ধে যোগ দিতে পারত, তবে অন্য এক চিত্র দেখা যেত।

আর একটা ইচ্ছা আমার আছে। বেভারলি নিকলস-এর উচিত তোমার নাটক দেখা, দেখে ভারতীয় কৃষিজীবী সম্পর্কে যে জঘন্য বিষাক্ত কথাগুলো তিনি বলেছিলেন, সেগুলি ফিরিয়ে নেওয়া।

ভারতের কাছে যে ঋণ হল, সে ঋণ কখনও সম্পূর্ণ শোধ করতে পারব না। আমার হৃদয়ে ভারত স্থান করে নিয়েছে। আমার ভাবতেও গর্ব হয়, আনন্দ হয় যে ভারতের হৃদয়েও স্থান আমার রয়েছে। আশা রাখি, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে, কামনা করি সেদিন শীঘ্র হোক স্বাধীন সমৃদ্ধ ভারতের কামনায়,

—বিল্ বাট্‌লার

ভিনদেশী এক পাইলটের চোখে নাটকের মাধ্যমে আমার দেশ ও জাতির সম্পর্কে এই উপলব্ধি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

নাটকের মাধ্যমে জীবনের আন্দোলনে আমরা কতকটা সার্থকতা লাভ করেছিলাম মাত্র। এবং এই আন্দোলনের ঢেউ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চকেও প্রভাবিত করেছিল। স্বয়ং শিশিরকুমার ভাদুড়িও এই নাট্য আন্দোলনের শরিক হতে চেয়েছিলেন সমসাময়িককালে শ্রীরঙ্গমে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' প্রযোজনা করে। শ্রীরঙ্গমে 'নবান্ন' প্রযোজনার সময়ে আমি রাতের পর রাত ভাদুড়ি মশাইকে অভিনয়ে উপস্থিত থাকতে দেখেছি। কথোপকথন ঐ সময়ে আমার তাঁর সঙ্গে যা হয়েছে তাতে বুঝেছি শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন দিতে চাইছেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও পরে পংক্তি ভোজন আর হয় তো তাঁর পক্ষে কার্যকারণে সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে রাজনীতির মোড় ঘুরতে আরম্ভ করেছে, মহামন্বন্তর ও আগষ্ট আন্দোলনের পর মাউন্ট-বেটন সাহেবের হাতে স্বাধীনতার রুটি ভাগের পালা চলেছে। মহাঅনর্থ ঘনায়মান হয়ে উঠেছে দেশে। ভ্রাতৃঘাতী আত্মহননের পালা সমাসন্ন হলো সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে। গান্ধীজী তখন কলকাতায় এসে বেলেঘাটায় আস্তানা ফেলেছেন মহাপাপ প্রতিরোধ করতে। দাঙ্গার তীব্রতা সাময়িক প্রশমিত হলো। গান্ধীজী তখন নোয়াখালী যাবেন। আমার তখন মনে হয়েছিল গান্ধীজীর এই সফরের সঙ্গে গণনাট্য সংঘেরও কর্তব্য আছে। আমি তখন আমাদের উচ্চতম কার্যকরী সভায় গান্ধীজীর সঙ্গে গণনাট্য সংঘের দল নিয়ে নোয়াখালী সফরের প্রস্তাব করেছিলাম। আট নম্বর ডেকার্স লেনের বাড়ীর ছাতে সেই সভায় ঐ প্রস্তাব আনায় আমাকে সেদিন অপদস্থ হতে হয়েছিল হঠকারিতার জন্যে। সভায় কে কি বলেছিলেন সে কথা অবান্তর। কিন্তু নাট্য আন্দোলনকে মর্যাদা দেওয়া ছাড়া ঐ প্রস্তাবে আমার মনে অন্য কোন কথা ছিল না। বিচ্ছিন্ন মানসিকতার এই কালাকালে আমি ব্যক্তিগত জীবনেই প্রতিশোধ নেই।

যাই হোক অনেকদিন নাটক লিখি না। অভিনয় করি না। ইতিমধ্যে নাট্য আন্দোলন কিন্তু এগিয়ে গেছে। গণনাট্য সংঘের 'শহীদের ডাক' সারা দেশে তুমুল উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। 'নয়ানপুর' বাংলার সীমা অতিক্রম করে আসামে ঝড় তুলেছে। নিবারণ পণ্ডিত, বিশু পণ্ডিত ও গুরুদাস পাল প্রাণের আসর বসিয়েছেন সংগীতে ও তর্জায়। দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' নাটকের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ সংযোজন।

আজও স্বপ্ন দেখি, খরা পোড়া ঊষর প্রান্তরের এক কোণে চুপ করে বসে সমুদ্যত সহস্র কাস্তের মুখে ধান কাটার গান শুনি। লে-অফ আর লক-আউট অভিশপ্ত ফ্যাক্টরী গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে যন্ত্রমন্ত্রে চৌতুনী উৎপাদনের অর্কেস্ট্রা বাজাই।
চারণের আর কী কাজ থাকতে পারে।

পরে দেশভাগ নিয়ে লেখা ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' পরবর্তী গণনাট্য আন্দোলনে আর একটি হাতিয়ার। বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' বাংলাদেশকে গণনাট্যের আসরে মুক্তির নিশানা দেখিয়েছে। 'বিশ-এ জুন' নাটকের রোজেনবার্গ দম্পতি মানুষের মনে চিরজীবী হয়ে থাকবেন। সংগীতে সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বলিষ্ঠ অবদান বাংলা দেশ কখনই ভুলবে না।

মানুষের কল্যাণে রুটির লড়াই-এর সঙ্গে প্রাণের লড়াইকে একসূত্রে বেঁধে নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই গণনাট্যের মর্মকথা। মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও শিল্পকর্মের প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাই গণনাট্যশিল্পীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। আত্মবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অপলাপ করে কমন ফ্যাক্টর জনসাধারণকে ধরতাই বুলি হিসেবে সুবিধেবাদী ব্যবহার করলে নাটকের দর্পণে জাতির প্রতিফলনকেই বিকৃত করা হবে। শিল্পীরও মর্যাদা বাড়বে না।

ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম— তোমার নাম আমার নাম। কবি মানসে যে সংগ্রামী সত্য প্রতিভাত হয়েছে তাকে আজ সত্যিকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। নিছক ধরতাই বুলি হিসেবে এই বীজমন্ত্রগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করলে মন্ত্রের জোর কমে যায়। শ্লোগান সব সময় মন্ত্র নয়। ভিয়েতনামেও হয়তো এত বেশী শ্লোগান নাই। যা আছে তাই বীজমন্ত্র আমাদের মত এত আক্ষেপ বিক্ষেপ বা নির্জ্জান পার্লামেণ্টারী সমাহিতি কোনটাই নেই। আছে শুধু অব্যাহত রক্তের অপচয়ে অমানুষিক সঞ্চয়। অবক্ষয় নয়, বলাধান।

তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিকে প্রাণের বাসরের মত করে দেশের দশের মঙ্গলে নতুন করে সাজাতে হবে। জান আর প্রাণ সমান শ্রদ্ধেয়। একমুঠো খেতে না পেলে জান বাঁচে না, কিন্তু এককলি সুর না ভাঁজলেও প্রাণ বাঁচবে না। জান্ জানবে প্রাণের চাহিদা। প্রাণ জানবে জান কী কতটুকু চায়। খাদ্য সঙ্কটে মানুষ প্রাণ সঙ্কটের কথা জানতে বুঝতে পারলো না— এও হবে আর এক মহাসঙ্কট। শিল্প কর্মীদের বিশেষ করে এই কথাটা আজ নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে। কারণ দুর্গত দেশে এদিক দিয়ে নেতৃত্বের একান্ত অভাব। রবীন্দ্রনাথের দেশে এ-ও আর এক প্রহসন। ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। প্রশ্ন-যা এক আমাদেরই ছিল। মহা মহাজিজ্ঞাসার মীমাংসা আছে আমাদের ভাবনার রাজ্যে।

ধান ভানতে শিবের গীত— অবান্তর যদি কিছু অবতারণা করে থাকি, সেও ঐ একই কারণে যে আমিও বিভ্রান্ত। নাট্যকর্ম ও নাট্য অনুষ্ঠানে কত কী করবার থাকলেও বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারছি না। গণনাট্যের দিনের প্রাণ চাঞ্চল্য একদিন উপলব্ধি করেছিলাম বলেই হয় তো এই যন্ত্রণা আরও দুঃসহ।

তাই কাজের ফাঁকে আজও স্বপ্ন দেখি, খরা পোড়া ঊষর প্রান্তরের এক কোণে চুপ করে বসে সমুদ্যত সহস্র কাস্তের মুখে ধান কাটার গান শুনি। লে-অফ আর লক-আউট অভিশপ্ত ফ্যাক্টরী গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে যন্ত্রমন্ত্রে চৌদুনী উৎপাদনের অর্কেষ্ট্রা বাজাই। চারণের আর কী কাজ থাকতে পারে। ▭

—শারদীয় কালান্তর, ১৩৭৪

"গণনাট্য তখনই সম্ভব হইবে যখন গণেরা নাট্যের অনুষ্ঠান করিবে।"

-বিজন ভট্টাচার্য

'যা হা অ মৃ ত ন হে তাহা লইয়া আমি কিতা করতাম রে ?' এ প্রশ্ন করেছিলেন 'সুবর্ণরেখা'র ছিন্নমূল শিক্ষক। এ প্রশ্ন সেদিন যেমন আজও তেমনি সত্য, বরং আরো তীব্রতর। অনাবৃত দেহ, তীব্রদৃষ্টি, জীবনমুখী-ভালবাসার মূর্ত প্রতীক বিজন ভট্টাচার্যকে ঘিরে রবিবারের এক সকাল। প্রত্যক্ষ করছিলাম সেই অমৃত অনুসন্ধানী স্কুল মাষ্টার যার কণ্ঠে 'রাইত কত হইল ?' এই অনন্ত জিজ্ঞাসা। আমরা বলেছিলাম নবনাট্য না গণনাট্য ? কি কোরেছিলেন ১৯৪৪ সালে ? কি চলছে এখন ? কোথায় পৌঁছবে এ ধারা ? কণ্ঠে তাঁর সমুদ্র দুলে উঠল, কখনো তুফান, কখনো তীব্র বিষ, কখনো অমৃতের আশ্বাস। বললেন---'নব নাট্য কিংবা গণনাট্য ও দুটোর মধ্যে একটা সাধারণ সত্যি থাকা চাই-ই চাই। আর তা হোল 'নাট্য'। আর এই নবনাট্যের গতিমুখেই একদিন জন্ম নেবে গণনাট্য। আজো অব্যাহত যে ধারা তা নব নাট্যের দাপাদাপি। এ একটা পর্যায়। একে গণযুক্ত কোরে কেউ কেউ শ্রদ্ধাবান কোরে তুলতে চান। কিন্তু আজো গণনাট্যে উত্তরণ ঘটে নি। গণের intervention ছাড়া গণনাট্য হয় না, হোতে পারে না'। গণনাট্য আন্দোলন তখনই সম্ভব যখন 'গণরা নাট্যের অনুষ্ঠান করবে'। নবনাট্যের বর্তমান প্রতিভূরাও থাকবেন। 'এ দেশে বিশেষ করে বাংলা নাটকে এখনও গণনাট্যের অধ্যায় পুরোপুরি আসেনি ;'বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করা গেলেও নবনাট্যের দাপাদাপির কাছে তা সিন্ধু মাঝে বিন্দু যথা। এবং 'এই দাপাদাপির আয়ুষ্কাল খুব বেশী দিন না হওয়াই নাট্যের পক্ষে, সমাজের পক্ষে মঙ্গল'। এছাড়া 'আমরা যা করেছি ৪৪-এ, তাতে কেবল গণের কথা ছিল নবনাট্য প্রয়াসীদের মুখে।' নবনাট্য প্রয়াসীদের

পুনঃপ্রকাশ

ভাবের জগতে গণনাট্যের ভাবমূর্তি লালিত পালিত হোয়েছে, তা কেউ অস্বীকার কোরবে না, যা কোরতে পারে না। সে চেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না, গণের ধ্যান ধারণাকে প্রতিফলিত করার মানসিকতা হয়তো তেমন মজবুত ছিল না, তাই উত্তরণ হ'লো না। 'সেদিনকার সেই প্রয়াসকে আর যে কেউ গণনাট্য বলুক, আমি তাকে গণনাট্য বলবো না। তবে সত্য যা তা হোচ্ছে সব নদীকেই একদিন সাগরে যেতে হয়। এই বিশ্বাসে বলা যায় আজকের এই বহুতর প্রচেষ্টাও একদিন গণনাট্যের সমুদ্রে একীভূত হবে। সেই হবে উত্তরণ, সেই আমাদের ক্রান্তি। সেদিন কোন প্রভেদ থাকবে না। বিজনদা বললেন 'গণনাট্যের মধ্যে আসবে Total aspiration of the people, mass aspiration for the conception of freedom, total conception of ourself' এই যে দাপাদাপির পর্ব, এ পর্ব তো অনিবার্য ছিল। যেমন অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক সামাজিক বিভ্রান্তি। সমস্ত নাট্য আবেগের মধ্যেও সেই একই বিভ্রান্তি। যেটা ভাবতে হবে, যেটা এর মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তা হোচ্ছে একটা গভীরতর সচেতন মানসিকতা না থাকলে being into something হয় না। নিজেকে এক জীবনমুখীন প্রজ্ঞার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তা না হলে এই যে পাগলামী, এই যে বাধাহীন, বন্ধহীন উন্মত্ততা এটা ঐ পাগলামীতেই শেষ হবে।' জাতীয় নাট্যশালার কথা উঠতে বললেন— জাতীয় জীবনে কোনো expressionই তো পাচ্ছি না। জাতীয় জীবনে কোন্ গান হবে আমার? তোমার গান, আমার গান, তার গান, ওর গান, কোন গান? আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভারতীয় জীবনের তো একটাই গান হবে। একটাই গান, একটাই অন্বেষা, একটাই মন। কিন্তু তা হোচ্ছে না। হোচ্ছে না, কারণ হয়তো সঠিক-ভাবে 'গাইডেড' হোচ্ছে না। নৈরাশ্য থেকেই যাচ্ছে, যে নৈরাশ্য গত পাঁচ সাত বছর ধরে উদ্বেল। হয়তে।এর মধ্যেই সেই ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তির উৎসব প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য: নাটকচর্চার একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে; তারই প্রতিফলন ঘটা উচিত শতবর্ষের উৎসব প্রাঙ্গনে। বাংলার লোকশিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—রবীন্দ্র সদনের ছৌ নাচের মুখোস পরা বাণিজ্যিক শিল্প নয়, মুখোসের আড়ালে ক্ষুধা কাতর বঞ্চনায় ম্লান যে ইতিহাস দিনের আলোয় তাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলার সংস্কৃতি চাই, চাই সংস্কৃতির ইজারাদার 'সদন' কর্তৃপক্ষের অদৃশ্য পেলব মসৃণ মুখোসটা ছেঁড়ার সংস্কৃতি।

বিজনদা শিল্পের সাময়িক মূল্যে আর চিরন্তন শাশ্বতমূল্যে পার্থক্য দেখেন না, যা সাময়িক তাই চির-কালীন, তাই রাজনীতি তাই সমাজনীতি। ভেদরেখা ভীরুর কারুশিল্প। মুখর হওয়াটা অমৃত অনুসন্ধানীর জড়ত্ব ভাঙ্গার গান। ছিন্নমূল শিক্ষক আজো সেই অমৃত প্রয়াসী, আজো তাই তার বুকে বাজে দেবীগর্জন, স্বর্ণকুম্ভ পূর্ণ করার প্রয়াস। যাহা অমৃত নয় তাহা বর্জনান্তে, যাহা অমৃত তাহাই গ্রহণের সচেতন জীবন চর্যা, শিল্প প্রয়াস, মাটির গভীরে মূল প্রবিষ্ট করার আত্যন্তিক ব্যাকুলতা। ▭

প্রতিক্ষণ

—পাক্ষিক অভিমত। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। অগাস্ট ১, ১৯৭২

আধুনিক নাটকে বিচ্ছিন্নতা | বিজন ভট্টাচার্য

আ ধু নি ক নাটকে বি চ্ছি ন্ন তা বা alienation-এর প্রতিফলন সম্পর্কে কিছু বলার আগে বিচ্ছিন্নতা কি সে সম্পর্কে একটু ভাবনা চিন্তার অবকাশ আছে। সত্তার বিযুক্তি অবস্থাটা কি? সত্তা— অর্থাৎ অখণ্ড আমি-র চৈতন্যসত্তা, যেটা মুখ্যত বস্তুসত্তাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে, না— নির্গুণ অবচেতন সত্তা, যেখানে মননে যে সত্তা অতীন্দ্রিয় মনোজগতে নির্জ্ঞানে ভাব সমাহিত।

প্রাচ্য দর্শনে তিন হাজার বছর আগে থেকেই পরম ব্রহ্মলীন মানুষের এই নির্জ্ঞান সত্তার অরূপ স্বরূপ বিশ্লেষণ বেদ-বেদান্ত দর্শন ও পুরাণগ্রন্থে বিবৃত আছে।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্তা
কেনেষিতং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেব যুনক্তি।

মনের আড়ালে কোন মন মনকে নিয়ন্ত্রণ করেন, প্রাণের আড়ালে কোন প্রাণ, প্রাণকে চালিত করেন, চক্ষু কর্ণকেই বা কোন দেবতা অলক্ষ্যে থেকে নিজ নিজ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করছেন?

আড়াই বছর আগে উপনিষদের এই জিজ্ঞাসাই একদিন আমাদের দেশের জ্ঞানী মুনি ঋষির জিজ্ঞাসা ছিল।

কঠোপনিষৎ-এ যম ও নচিকেতার প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এই আত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে নির্জ্ঞান-সত্তার সন্ধান আছে। দ্বিতীয় বল্লীর ২৩ সূক্তে বলা আছে—

ন্যায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহু না শ্রুতেন।

আত্মার এই আত্মবোধ বহু বেদাধ্যয়নের দ্বারা সম্ভব নয়, মেধা অর্থাৎ intellect-এর দ্বারাও জ্ঞেয় নয় যে সাধক শুধু আত্মার আত্মীয় হতে বাসনা করেন তিনিই এই আত্মাকে আত্মবোধের মধ্যে সমাহিত পেতে পারেন।

This awareness of one's own self চৈতন্যবুদ্ধির অগোচরে এই নির্জ্ঞানের জগতে

উপলভা— বিধ্বংসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তৃতীয় মহাযুদ্ধের শ্মশান উপান্তে বসে পাশ্চাত্য জ্ঞানী-গুণীরা আজ বিভ্রান্ত। আর একটা হিরোশিমা নাগাসিকার দুঃস্বপ্ন তাঁদেরকে চৈতন্যবুদ্ধির জগৎ থেকে সময় থাকতেই নির্জ্ঞান মননের গুহাকন্দরে তাড়না করে নিয়ে চলেছে। কেন না, ন্যাচারাল সায়েন্স্-এর আওতায় এঁরা জীবনের কোন সিকিউরিটি খুঁজে পাচ্ছেন না। **Monopoly Capitalism is bad, as bad as nuclear weapons, inasmuch as monopoly capitalism gave birth to ballistic missiles** কিন্তু free world-এর একচেটিয়া পুঁজিবাদে ফাটল ধরিয়ে missile গুলো অকেজো করে দিতে পারেন, এমন তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানে হতাশ হয়ে— পুঁজিবাদের তেলে জলে বেড়ে ওঠা পাশ্চাত্যের তথাকথিত intellectual বা আঁতে গ্রুপ মার্কস এঙ্গেলস প্রবর্তিত Dialectical Materialism বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পথে সমস্যার নিরাকরণ করবার চেষ্টা না করে thesis antithesis-এর ব্যাপারটা metaphsical world-এর বিষয়ীভূত করে life আর form-এর লড়াই সুরু করে দিয়েছেন। এ-ও সেই পরিমাণগত পরিবর্তনের পথে গুণগত পরিবর্তনে অতিক্রান্তির কথা from quantitative to qualitative change. আমাদের বেদান্ত দর্শনেও দুটি পথের সন্ধান আছে —একটি প্রবৃত্তি ও অন্যটি নিবৃত্তি মার্গ। বলা হয়েছে পরমব্রহ্মে লীন হবার পক্ষে জীবের এ দুটি-ই প্রকৃষ্ট পন্থা। জ্ঞানমার্গের পথ পাকা সড়ক। তবে প্রবৃত্তি মার্গেও মুক্তি হতে পারে। তবে কেন না একটু ঘুর পথে। পরিপূর্ণ ভোগের পর মানুষ আপনা থেকেই বিমুক্তি বা পরিত্রাণ পেতে চাইবে। সুতরাং ভোগও মুক্তির পথ। পাশ্চাত্যের অনুসন্ধানীরা সবাই একচেটে পুঁজিবাদের তেলে জলে সুখে আছেন, এমন কথা আমিও মনে করিনা। তবে আজ যাঁরা কার্যকারণে বিষণ্ণ, বিচ্ছিন্ন, alienation-এর হৃদরোগে ভুগছেন— সত্যাশ্রয়ী হলে তাঁরাও মুক্তির পথ খুঁজে পাবেন[1] এবং আজ যারা আমরা এখানে বিষণ্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মার অনাত্মীয় হয়ে রাহুগ্রস্ত র‍্যাশন কার্ড গলায় ঝুলিয়ে অন্নমন্ত্র গান করছি পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগুণীদের মোহভঙ্গে আমাদেরও নিঃসন্দেহে বিমুক্তি আসবে।

যাই হোক, life and form এর প্রশ্নেই ফিরে আসা যাক। স্পেঙ্গলারের পর আধুনিক ইউরোপীয়, বিশেষ করে মার্কিন দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের ওপর জর্জ সিমেল্ বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করেছেন। সিমেল বলেন, মানুষ নিজঘরে চিরকালই পরবাসী— তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। life এবং form-এর মধ্যে এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব মানুষের সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে। তাঁর মতে প্রাচীন গ্রীসে idea of being আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্নটাই মধ্যযুগে 'idea of god' ভগবৎতত্ত্ব রেনেসাঁর যুগে 'প্রকৃতি রহস্য' এবং সতেরো শতকে 'idea of natural law' প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার উত্তরণ হয়। আঠার শতকে ব্যক্তিই হয় বিশিষ্ট জিজ্ঞাসা। বিশ শতকের ধ্যান ধারণায় প্রবহমান জীবনই হয়ে ওঠে একমাত্র সত্য। কিন্তু এই form-এর কাঠামোর মধ্যে জীবনের কোনই সমঝোতা হতে পারে না। জীবন থেকে মানুষ সব সময়ই বিচ্ছিন্ন। তার কোনই মূল নেই।

ব্যক্তি সত্তার এই শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করে মানুষ স্বতঃই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে তাই কির্কেগার্ড বল্লেন, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-র (Knowledge of the

Known) মধ্যে এই বিচ্ছিন্ন অবস্থা দুঃসহ। অস্তিত্ববাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সমগ্র জ্ঞানবিজ্ঞানই মানুষের ধারণায় আসতে বাধ্য।

ফয়ারবাক আবার তার জবাবে বল্লেন, মানুষ হতে গিয়ে আবার দার্শনিক বনে যেও না— চিন্তাবিদদের মত ভেবো না— সত্যিকারের মানুষের মত ভাব— জ্যান্তে ভাব।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেঁয়র মধ্যে এই দুস্তর পার্থক্য দূরীকরণে ১৯ শতকে নীটশে এবং মার্কস যে যুক্তিবাদের অবতারণা করলেন— সাধারণ মানুষ তাতে করে আশ্বস্ত হলো না। সাধারণ মানুষের মনের এই ভ্যাকুয়াম ভরাট করবার তাগিদে এডমাণ্ড হাসরেল তখন Existential এবং Essential এই তত্ত্বের অবতারণা করলেন। নির্গলিতার্থ এবং তৎসম্পর্কে তোমার আমার সম্যক জ্ঞান— এই হলো তার প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতি দ্বারা এই জ্ঞান সম্ভব নয়। Intuition সহজাত বোধশক্তি দ্বারা একে বুঝতে হবে। দুরূহ ধ্যান ও মননের মধ্যে দিয়ে এই নির্গলিতার্থের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ মার্ক অঙ্কিত 'নাল ঘোড়ার' উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এখানে ঘোড়াটা বড় কথা নয়। ঘোড়ার ঘোড়াত্বটাই বড় কথা। সেইটেই আঁকতে হবে।

কিন্তু Existentialist philosopher-রা হাসরেলের এই মীমাংসাতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা বস্তুত বল্লেন, বিশ্বকে জয় করতে হবে না, তুমি তোমাকে জয় কর। নিজের ওপর পুরো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই তুমি সব কিছুর ওপর রাজত্ব করতে পারবে। এখানে alienation-এর চাইতে involvement-টাই বড় কথা। La Republique de Silence-এ সাত্র্ এক জায়গায় বলেছেন :

"We were never more free than during the German occupation. We had lost all our rights, begining with the right to talk. Everyday we were insulted to our faces and had to take it in silence. Under one pretext or another, as workers, Jews, or political prisoners we deported En Masse."

Page : 29.

Alienation বা বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটা যদি সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হয় তাহলে এই ভাবে দেখাই সমীচীন। জীবন বিষণ্ণ বিকেল, এ জীবনের কোন অর্থ নেই, সুতরাং নিজেই নিজের মাংস এক কোনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাই— মানুষের এই পরিণতি অকল্পনীয়।

সাত্র্-এর বিচ্ছিন্ন মানসিকতা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে ভাবীকালের মানুষের শ্রদ্ধেয় সংস্করণকেও ছাপিয়ে গেছে।

সাত্র্-এর জিজ্ঞাসা কিন্তু Thomas Wolfe, Arthur Miller বা Ionesco'র জীবন জিজ্ঞাসা নয়। Kafka-র মত এরাও মুখ্যতঃ বলতে চান "I am separated from all things by a hollow space and I do not even reach to its boundaries." —Kafka.

বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটা সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হয় তাহলে এই ভাবে দেখাই সমীচীন। জীবন বিষণ্ণ বিকেল, এ জীবনের কোন অর্থ নেই, সুতরাং নিজের মাংস এক কোণে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাই— মানুষের এই পরিণতি অকল্পনীয়।

Thomas Wolfe তাঁর 'Return of the Prodigal' গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র ইউজিন গ্যান্ট-এর মারফতে বলছেন— "What did you come home for ? You know now that you can't go home again." Arthur Miller-এর Death of a Salesman নাটকের প্রধান চরিত্র Willy Loman-কে দেখাচ্ছেন যে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে তার সংগ্রামের অন্ত নেই; কিন্তু স্বামীর সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর সংশয়— "To fall into his grave like an old dog"। Willy Loman-এর স্ত্রীর এই জিজ্ঞাসাই নাট্যকার Arthur Miller-এর জীবন জিজ্ঞাসা। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রশ্ন ভাববাদের জগতে টেনে নিয়ে গিয়ে নতুনত্বের সৃষ্টি করতে চাইছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে — সমালোচকরা যেমন ভাবে আমাদের চিনতে বুঝতে দিয়েছেন — তাঁদের মধ্যে

সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন Ionesco.

আধুনিক ইউরোপ বিশেষ করে আমেরিকায় Ionesco'র নাট্যসাহিত্য ও তাঁর পরিবেশনা বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। নাটকের ক্ষেত্রে ইনি এক বিশেষ ব্যতিক্রম। মৌলিকতা যদি কিছু থাকে তো সেটা আছে তাঁর অমৌলিকত্বে। কয়েকটা বিশেষ বিষয় Ionesco'র নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় — He believes in the clowning of man including himself. প্রজ্ঞার মৌলিকত্ব আছে অর্থহীনতার অর্থ বিশ্লেষণে। অর্থাৎ তিনি পেতে চাইছেন — সোনার পাথরে বাটি। তার স্বরূপ বিশ্লেষণেও তিনি অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর কোন কিছু বক্তব্য নেই। কোন উপদেশ নেই। ব্রেসট-এর নীতি আছে, কথা আছে। Ionesco এর ঘোরতর বিরোধী। কাজকর্মে তিনি একজন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি। আলজিরিয়ার যুদ্ধে একশ একুশ দফা ঘোষণাপত্রে প্রায় সবাই স্বাক্ষর দিয়ে ফ্রান্সের সামরিক রীতি-নীতির প্রতিবাদ করলেন, Ionesco স্বাক্ষর দিলেন না। এই মানসের স্বাক্ষর তাঁর নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক 'Killer' নাটকটি বাদে পূর্ণাঙ্গ অন্যান্য নাটকগুলি অসঙ্গতিপূর্ণ। তবে একাংক নাটকগুলির রচনাশৈলীতে মৌলিকতা আছে। যদিও নাট্যরচনার আঙ্গিক খানিকটা ইবসেন ও মলিয়ারের ধাঁচের। Ionesco-র The Bald Prima Donna, The Lesson, The Chair, The Victims, The Future Is In Eggs, Victims of Duty উল্লেখযোগ্য একাঙ্কিকা। পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে Killer'ই উল্লেখযোগ্য। তবে পরিবেশনার ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাঁটার contrast-এ নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি ব্যাহত হয়েছে নাটকটির দৈর্ঘ্যের জন্য।

'Victims of Duty'র কাহিনীগুলি ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্ব ও অবচেতন মনোবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। Rhinoceros,— Ionesco-র আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। Trade Union Rationalism-কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই নাটকে। কিন্তু এখানেও বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধ্যান-ধারণা না থাকার জন্যে নাটকটির আবেদন স্থানে স্থানে ব্যাহত হয়েছে। অবশ্য Ionescoর নিজেরই প্রত্যয় যে কথার মাধ্যমে একজন কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। এবং তদ্‌জনিত অসঙ্গতি তাঁর সমস্ত রচনায় সুস্পষ্ট। অথচ এই অস্পষ্টতার মধ্যেই Ionesco মনে করেন তিনি সোচ্চার। বুঝ জন যে জানো সন্ধান— এছাড়া এরপর আর কিছু বলবার থাকে না। Ionesco'র মত বেকেট, জারি, আরাবাল ও পিনটারের মত নাট্যকারেরা মনে করেন সভ্যজগত আজ চৈতন্যের শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছে। চলছে একটা অচৈতন্যের অবস্থা— যাকে বলা যায় একটা 'কোমাটিক স্টেজ'। এখন শুধু Total Negation. ধ্বংসই এখন একমাত্র সত্য। মৃত্যুই মানুষের মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং প্রলাপই হোক একমাত্র সংলাপ।

তবু Ionesco মনে করেন— যদিও এটা স্ববিরোধী মনে হয়— তাঁর Absurdism-এরও একটা Dynamism আছে। এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্বেরও প্রসঙ্গ টেনেছেন। কিন্তু শূন্যবাদের পরিক্রমায় রসের কাণ্ডারী হয়েও বুদ্ধদেবের মতে জড়-ভাণ্ডারই যে মানুষের একমাত্র অনুসন্ধেয়— এ তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। তবে মননের

পরিমণ্ডলে বস্তু নিরপেক্ষ যদি কোন সত্য থেকেও থাকে তবে সেটা বস্তুকে বাদ না দিয়ে বস্তুজ্ঞানকেই ভাব ভাবনার রাজ্যে বিদারণ করাই সম্ভব কিনা, তাও সাম্যের যুগে মানুষের গোচরেই সম্ভাব্য বলেই মনে হয়। অগোচরে হলেও গোচরীভূত কতকগুলি ক্রিয়া প্রক্রিয়ার অবকাশ সেখানেও থাকবে। সবটাই ম্যাজিক হলে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হতেন না, অতি আমেরিকান 'রোমানশক্তি গলগোথায়' ভিয়েত-নামের বীভৎসতা ঘটাতে পারতো না। এদিক দিয়ে স্যামুয়েল বেকেটের Waiting for Godot ও Endgame উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা। ধ্বংসের পরেও জীবনের অনুরণন সেখানে in terms of micro-organisms ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। অন্ধ হবার পর অয়িদিপাউস যখন দৃষ্টির বড়াই করে— বিস্মরণের পর Waiting for Godot-তেও সেই ধরণের একটা কথা সোচ্চার হয়ে ওঠে।

বিচ্ছিন্ন মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক নাটকের চিন্তাভাবনা ও তার সামগ্রিক বিস্তার বহুমুখী ও বহুবিস্তৃত। সব নাট্যকারকে আমি চিনিও না জানিও না। ব্রেসট্, সার্ত্র প্রমুখ নাট্যকারদের চিন্তাভাবনা পরিমাণে এতই বিরাট ও বিস্তৃত যে এখানে সামান্য আলোচনার মধ্যে তার উত্থাপন সমীচীন হবে না। এঁদের বাদ দিয়ে Genet, Osborne প্রভৃতি আর সব সমসাময়িক নাট্যকার যারা আধুনিক নাট্য সাহিত্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছেন, আধুনিক নাট্য-চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করেছেন, তাঁদের দানও অসামান্য। মোটকথা বিশ্বের নাট্য সাহিত্যে আজ এক ক্রান্তিকাল এসে গেছে। এই ক্রান্তিকালের দুঃসহ জীবন-যন্ত্রণা অদূর ভবিষ্যতে এক মহা জাগৃতির অকাল বোধনে কখনও বা শান্ত সমাহিত, কখনও বা মুষ্টিবদ্ধ কঠিন প্রতিবাদে সোচ্চার।

অসাম্যের যুগে যদিও বা বাঁচা গেল মরে মরে, means of production হাতে এলে সাম্যের যুগে এই দ্বন্দ্ব, এই জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে কি ভাবে বাঁচা যাবে। পেটের চিন্তা দূর হলে প্রাণচিন্তা কোন সমিধকে আশ্রয় করে কোনদিকে কি ভাবে প্রজ্জ্বলিত হবে— সেও আর এক যন্ত্রণা। সেও হবে তখন আর এক জীবন-যন্ত্রণা। সেই জীবন তখন কোন এক মহাজীবনের অন্বেষায় উল্কার মত ছুটে বেড়াবে আজ তা অনুমান করা যাবে না। স্বপ্নেও না। প্রতিফলনেরও কালাকাল আছে। ততদিন মোরচাই সত্যি। মোরচাই সম্বল। ▭

-- অভিনয় দর্পণ, ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৬৯

অসাম্যের যুগে যদিও বা বাঁচা গেল মরে মরে, means of production হাতে এলে সাম্যের যুগে এই দ্বন্দ্ব, এই জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে কি ভাবে বাঁচা যাবে। পেটের চিন্তা দূর হলে প্রাণচিন্তা কোন সমিধকে আশ্রয় করে কোনদিকে কি ভাবে প্রজ্জ্বলিত হবে— সেও আর এক যন্ত্রণা। সেও হবে তখন আর এক জীবন-যন্ত্রণা।

কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিজনের নাট্যকৃতি | দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো শিল্পস্রষ্টাকেই তাঁর যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় কি? বোধ হয় যায় না। বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে। ত্রিশের দশকের শেষ দিকে কিম্বা চল্লিশের দশকের গোড়ায়। সেখানে সে ছিল আমার সহকর্মী। তখনকার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রুতকীর্তি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রগতি লেখক আন্দোলনের এক স্তম্ভ। তাঁকে ঘিরে আনন্দবাজারেই প্রগতি মনোভাবাপন্ন যে গোষ্ঠীটি ছিল আমাদের, বিজনও ছিল তার মধ্যে। সম্পর্কেও বিজন ছিল সত্যেনদার ভাগ্নে। সুতরাং বিজনের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় চার দশকের। তার সৃষ্টির সঙ্গেও তাই।

চল্লিশের দশকের কাছাকাছি, সাল তারিখটা ঠিক মনে নেই, ছাত্র ফেডারেশন একটা নয়া সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে কাজ শুরু করে। তাদের একটা অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয় আমার। যতদূর মনে পড়ে জলি কাউলের লেখা একটি ইংরেজি নাটক অভিনীত হয় সেখানে। আমার 'অন্তরাল' নাটক লেখা তখন শেষ হয়েছে। শচীন সেনগুপ্ত ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য পাণ্ডুলিপি পড়ে খুশি হলেও বললেন পাবলিক বোর্ডে এ নাটক হবার সম্ভাবনা নেই; কারণ চিন্তার দিক দিয়ে থিয়েটার পরিচালকরা এখনো অনেক পিছিয়ে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যেরই পরামর্শে পাণ্ডুলিপি নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়িকে পড়তে দিই। শ্রীরঙ্গমে তখন শিশিরকুমারের সকালের আড্ডার আমিও একজন। নাটকের পর নাটক করে মার খাচ্ছেন তিনি। পাণ্ডুলিপি পড়ে বললেন তাঁর ভালো লেগেছে, এ নাটক তিনি করবেন 'মাইকেল' করার পরে। কারণ হিসেবে বললেন, এক্সপেরিমেণ্টাল ড্রামা নিয়ে নামলে আবারও মার খেতে হতে পারে।

বিজন তখন হাসির নকশা লিখত। মাঝে মাঝে বিজনকে বলতাম, একটা নাটকের যুগ আসছে মনে হয়, তুই নাটক লেখ। বিজন হেসে উড়িয়ে দিত। বলত, তার দ্বারা নাটক লেখা হবে না। নাটক কিভাবে লিখতে হয় জানেই না সে। সে কি তখন জানত যে বাংলা নাট্যজগতে একটা নতুন ধারার প্রবর্তকরূপে সেও একদিন চিহ্নিত হবে?

এদিকে হিটলারের বাহিনী কর্তৃক সোভিয়েত দেশ

আক্রান্ত হওয়ায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্ব-যুদ্ধকে জনযুদ্ধ আখ্যা দেয়। জোর দেয়া হয় ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার দিকে। প্রগতি লেখক সংঘ রূপান্তরিত হয় ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘে। আমিও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এই ফ্যাসিবিরোধী সংঘেরই একটি সাংস্কৃতিক শাখা গড়ে ওঠে যাকে কেন্দ্র করে সমাবেশ হয় নয়া শিল্পচেতনাসম্পন্ন নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী, যাতে ছিলেন সরোজিনী নাইডুর ভাই হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো বিশিষ্ট শিল্পীদ্বয়। গোড়ায় কমিউনিস্ট পার্টিরও একটি আলাদা সাংস্কৃতিক স্কোয়াড ছিল যার অধিনায়কত্বে ছিলেন বিনয় রায়। পরে অবশ্য তিনি গণনাট্য সংঘেই আসেন। পার্টির নিজস্ব স্কোয়াড তুলে দেয়া হয়।

ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলায় অর্থাৎ প্রগতি লেখক সংঘের কার্যালয়ে (তখন ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ) রোজ বিকেলে এসে হরীন চট্টোপাধ্যায় সবাইকে নিয়ে গানের তালিম দিতেন। বিজনের 'আগুন' নাটিকা এই সময়েই লেখা। সেই নাটকে আমিও দুচার-দিন তালিম দিয়েছিলাম। কিন্তু নাটকটা আমার ভালো লাগত না : সবটাই যেন স্টাণ্ট। কাজেই মহড়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম। হরীন চট্টোপাধ্যায়ের প্রোগ্রাম ও বিজনের 'আগুন' নাটিকা নিয়ে শ্রীরঙ্গমে একটা অনুষ্ঠান হলো। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' নাটিকাও সেই অনুষ্ঠানে হয়েছিল কিনা মনে নেই। আনন্দ-বাজার পত্রিকায় সেই অনুষ্ঠানকে অভিনন্দিত করে আলোচনা করেছিলাম আমি।

এর পরে বিজনের 'জবানবন্দী' অভিনীত হয়ে সবিশেষ প্রশংসা পায়। এখানেই নাটক লেখায় হাত খোলে বিজনের। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ওপর আমার লেখা 'দীপশিখা' নাটকও এই সময়ই অভিনীত হয় রঙমহলে দর্জিপাড়ার রবীন্দ্র সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা। 'দীপশিখার' প্রথম দুই দৃশ্য বিজনের আগুনের সমকালেই লিখিত হয়েছিল। রমেশ স্মৃতিভবনে তা অভিনয় করে-ছিল উক্ত সংগীত বিদ্যালয়েরই ছাত্রীরা। এই সময়েই আনন্দবাজার পত্রিকায় 'লোকশিক্ষায় গণনাট্যের স্থান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আমার, যেটি পরে 'দীপশিখা' নাটকে ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। তখন আমার মাথায় চীনের পিপলস্ থিয়েটার। দিল্লীর গণনাট্য সংঘ 'দীপ-শিখা' অভিনয় করতে উদ্যোগী হয়ে পুলিশের কাছে বাধা পায়। আমাদের কালে নাটকের ওপর পুলিশের হস্তক্ষেপ এই বোধ হয় প্রথম।

এর পরে আসে বিজনের 'নবান্ন'-এর পালা। এই নাটকই বিজনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আমি তখন আমার 'অন্তরাল' নিয়ে ব্যস্ত। 'মাইকেল'-এর সাফল্যের পর শিশিরকুমারের বন্ধুবান্ধবরা নতুন ধারার নাটক নিয়ে পরীক্ষা চালাবার ঘোর বিরোধিতা করায় নাট্যাচার্য কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বুঝতে পারি শ্রীরঙ্গমে আমার 'অন্তরাল' মঞ্চস্থ হবার আশা কম। মনে বিষম অস্বস্তি। 'প্রগতি শিল্পী সংঘ' নামে গড়ে তুললাম এক নাট-কের দল। এখানেও পুলিশের বাধা। বিস্তর ঝকমারি করার পর অভিনয়ের আগের দিন নাট-কের এমন অঙ্গচ্ছেদ করে পুলিশ অনুমতি দিল যে কহতব্য নয়। পরদিন কোমর বেঁধে জোড়াতালি দিয়ে শ্রীরঙ্গমেই 'অন্তরাল' অভিনীত হলো সেখানে —'নবান্ন' অভিনয়ের সাতদিন আগে। অভিনয় আমার মনোমত হলো না ; কিন্তু কাগজে কাগজে প্রশংসা বেরুল। প্রসঙ্গত বলা দরকার, এই সময়েই মনোজ বসুর 'নূতন প্রভাত' নাটক

অপেশাদার মহলে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। কয়েক বছর পরে শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হলেও তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' 'নবান্ন' এর প্রায় সম-কালেই লেখা।

এ কথাগুলো বলার প্রয়োজন এই কারণে যে চল্লিশের দশকে বাংলাদেশে যে নতুন শিল্পচেতনা এসেছিল তারই গর্ভে জন্ম নেয় এক নতুন নাট্যবোধও। এই পটভূমি বাদ দিয়ে 'নবান্ন'-এর সাফল্যের মূল্যায়ণ করলে আকস্মিকতায় বিশ্বাস করতে হয়। দশকের এই নবচেতনাই 'নবান্ন' কে সফল করে তুলবার জন্যে এক সংঘশক্তিকে প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত করেছিল যার ফলে 'নবান্ন' তখন ব্যবসায়িক থিয়েটারগুলিকে একটা চ্যালেঞ্জ দিতে পেরেছিল। 'নবান্ন'-এর সাফল্য প্রমাণ করে দিল, অবহেলিত লাঞ্ছিত মাটির মানুষগুলিকে নিয়েও ভালো নাটক হতে পারে আর ব্যবসায়িক থিয়েটারের স্টার আর্টিস্টদের বাইরেও এমন শিল্পী আছেন যাঁরা নিষ্ঠা ও শ্রমের দ্বারা এমন একটা নাট্য প্রযোজনা করতে সক্ষম যা দর্শকদের চমক লাগিয়ে দেবার মতো। 'নবান্ন' পেশাদার থিয়েটারের গতানুগতিকতার চৌহদ্দির বাইরে জনতার মধ্যে নিয়ে এলো নাটককে যাকে বলা যায় নাটকের সোস্যালাইজেশন বা সামাজিকীকরণ।

'নবান্ন' নাটকের মঞ্চ-সাফল্য বাস্তববাদী নাটকের একটা অভিনয়রীতিও নিরূপণ করে দিল যা তখন অব্যবসায়িক থিয়েটার মহলে নবাগত শিল্পীদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠলো। গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' মঞ্চে সফল না হলে শিশির কুমারের শ্রীরঙ্গমে 'দুঃখীর ইমান' পাদপ্রদীপের সামনে আদৌ আসত কিনা সন্দেহ। তাছাড়া নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে দর্শকদের মধ্যে একটা নতুন বোধ এলো। ব্যবসায়িক থিয়েটারে স্টার আর্টিস্টদের পাশে দাঁড়িয়ে খুচরো রোল না করেও যে প্রথম সারির অভিনয়শিল্পী হওয়া যায় এই প্রত্যয়টা এলো অভিনয়েচ্ছু নবাগতদের মধ্যে। দৃষ্টিটা বদলে গেল ঐতিহাসিক রোমান্টিকতা ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের গতানুগতিক ভাবালুতা থেকে বৃহত্তর সামাজিক সত্তার দিকে। নতুন ভাবনা এসে যুক্ত হলো নাটকে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' কি ভাবে অভিনীত হতো সে যুগে, সে সম্বন্ধে আমাদের কারো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই; যা আছে পুঁথিপড়া বিদ্যামাত্র। পরে যে আমরা 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করেছিলাম সেটা করেছিলাম আমাদের মতো করে। (শ্রীরঙ্গমে 'নবান্ন' অভিনীত হবার অব্যবহিত পরেই আমাদ্বারা 'নীলদর্পণ' সম্পাদিত হয়েছিল।) অর্ধেন্দু মুস্তফীদের অভিনয়ধারার সঙ্গে আমাদের অভিনয়ধারার কোনো মিল ছিল কি না বলার উপায় নেই। তবে প্রযোজনায় যে তফাৎ ছিল একথা বলা যায়। অর্ধেন্দু মুস্তফীরা অভিনয় করতেন গোটা নাটক ধরে। আমরা অভিনয় করেছিলাম 'নীলদর্পণ' এমন ভাবে সম্পাদনা করে, যাতে প্রযোজনা এ যুগের উপযোগী হয়। তাতে 'নীলদর্পণ'-এর দুর্বল ও বাহুল্য অংশগুলি যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হয়েছিল নাটকের মূল অংশ ও বক্তব্য অক্ষুণ্ণ রেখে। তাতেও নাটক সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয়েছিল এমন কথা বলা যায় না। 'নবান্ন'ও কোনদিন এভাবে নতুন করে প্রযোজিত হবে কি না কে বলবে।

নাট্যচক্র প্রযোজিত 'নীলদর্পণ' ছাড়া অন্য কোন নাটকে বিজনের সঙ্গে একত্র কাজ করার সুযোগ আমার হয়নি। 'নবান্ন' নাটকের পরে বিজন গণনাট্য সংঘ থেকে সরে যায়। সরে যাবার কারণ আমার জানা নেই। ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে চারুপ্রকাশ ঘোষ ও সুধী প্রধানের বিশেষ

অনুরোধে আমি গণনাট্য সংঘে যোগ দিই। তার আগে পর্যন্ত আমি ছিলাম গণনাট্য সংঘের ঘনিষ্ঠ দরদী সাথী। গণনাট্য সংঘে গিয়ে বিজনকে আমি পাশে পাইনি। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত গণনাট্য সংঘের সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবেই জড়িত ছিলাম: কিন্তু কোনদিনই বিজনকে গণনাট্য সংঘে দেখি নি। কোন্ তিক্ততা তাকে গণনাট্য সংঘ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা বিজনই জানে আর সেদিন যাঁরা তার সাথী ছিলেন তাঁদেরই জানার কথা। আমি গিয়ে বিজনহীন গণনাট্য সংঘই পাই।

গণনাট্য সংঘ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেও সংঘের শিল্পাদর্শ থেকে বিজন কিন্তু কখনো সরে যায় নি। সেই চেতনা থেকেই সে নাটকের পর নাটক দিয়ে গেছে আর নিজের দল গড়ে আপন ধ্যানধারণা অনুযায়ী সেগুলোর প্রযোজনাও করেছে। নিজে সুঅভিনেতা ও সুপ্রযোজক বলেই এটা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। অর্থের লোভে সে তার শিল্পাদর্শকে হারিয়ে ফেলে নি। এর জন্যে তাকে মূল্যও কম দিতে হয় নি। চলচ্চিত্র জগৎ থেকেও ডাক পেয়েছে সে। বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে সুখ্যাতিও না পেয়েছে এমন নয়। 'সাড়ে চুয়াত্তর' নামে তার একটি কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িতও হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্র জগৎ তাকে ধরে রাখতে পারে নি। মঞ্চগত প্রাণ তার। তাই বার বার ছুটে এসেছে মঞ্চের দিকে ; দিয়েছে 'মরাচাঁদ', 'গোত্রান্তর', 'গর্ভবতী জননী' 'দেবী গর্জন' প্রভৃতির মতো নাটক। এগুলো তার নবান্ন-পরবর্তী সাফল্যের একেকটি সোপান।

সংঘ শক্তি ও আন্দোলনের প্রশ্নে বিজনের মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার খানিকটা পার্থক্য আছে। বিজন শুধু নিজের সৃষ্টির মধ্যেই আপন কর্মশক্তিকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। গণনাট্য সংঘকে দেখতাম একটা আন্দোলন হিসেবে। কোন্ শিল্প-ধারণার বিরুদ্ধে গণনাট্য সংঘের মূল সংগ্রাম সে বিষয়ে আমার কোনো অস্পষ্ট চিন্তা ছিল না। তাই গণনাট্য সংঘের বাইরেও যাঁরা সেই শিল্প সংগ্রাম করছিলেন তাঁদেরও প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল। নিজের সাধ্যমত এই দু-এর মধ্যে সংযোগ ও অন্বয় সাধনের

গণনাট্য সংঘ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও সংঘের শিল্প-দর্শন থেকে বিজন কিন্তু কখনো সরে যায় নি।

চেষ্টাও করেছি। ট্র্যাডিশনের সঙ্গে নতুন ধারার সংযুক্তির দিকেও আমার দৃষ্টি ছিল। তাই এ যুগে 'নীলদর্পণ' পুনরুজ্জীবনে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম এবং তাতে সাফল্য লাভও করেছিলাম। এই দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল বলেই গণনাট্য সংঘের অভ্যন্তরে দুর্বলতা এবং কিছুটা ভেদবিভেদ থাকা সত্ত্বেও সংঘ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবার কথা ভাবি নি। দুর্বলতা ও ভেদাভেদের চেয়ে তার সংঘ শক্তি-টাকেই বড়ো করে দেখেছি। নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘই যে বৃহত্তম সংহত শক্তি ও ঐক্যের মঞ্চ এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। নাটক অনুমোদন ও তার প্রযোজনার ক্ষেত্রে সময় সময় গণনাট্য সংঘের প্রতিকূলতা বা অব-হেলার সম্মুখীন আমাকেও হতে হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করার চিন্তা কখনো আমার মাথায় আসে নি। বহু জন নিয়ে কাজ করতে গেলে এমন হয়। আঘাত পেয়ে অভিমানে সরে গেলে যে আদর্শ নিয়ে সংঘশক্তি গড়ে উঠেছে তারই প্রতি অবিচার করা হয়। বাধা পেয়ে কোনো কোনো নাটক আমাকে গণনাট্য সংঘের বাইরে নাট্যদল গড়ে প্রযোজনাও করতে হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে গণনাট্য সংঘের কোনো কোনো সদস্য তাতে অভিনয়ও করেছেন। পরে গণনাট্য সং-ঘেরই একাধিক শাখা কর্তৃক আমার সেসব নাটকের বহুল অভিনয় হয়েছে। এমনও দেখা গেছে কল-কাতায় গণনাট্য সংঘের প্রধান নাট্যগোষ্ঠীর কাছে আমার যে নাটকের পাণ্ডুলিপি উপেক্ষিত, বাইরের কোনো-গণনাট্য শাখা তার প্রথম অভিনয় করেছে। কলকাতার গোষ্ঠীর প্রতি অভিমানবশত আমি যদি গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করতাম তবে বাইরের এসব শাখার প্রতি অবিচার করা হতো। তা ছাড়া এসময় গণনাট্য সংঘের মধ্যেই নতুন নতুন নাট্য-কারও দেখা দিতে থাকেন। তাঁদের দিকে দৃষ্টি না রেখে শুধু নিজের সৃষ্টির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থাকলে আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। সৃষ্টির ব্যাপ্তির অর্থ আন্দো-লনেরই শক্তিবৃদ্ধি। গণনাট্য সংঘের শাখাগুলির সঙ্গে সংগঠক হিসেবে আমার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল বলেই আমার নাটকের প্রতি কোনো একটি বিশেষ শাখার উপেক্ষা বা অবহেলা আমাকে

মঞ্চগত প্রাণ তার। তাই বার বার ছুটে এসেছে মঞ্চের দিকে, দিয়েছে মরাচাঁদ, গোত্রান্তর, গর্ভবতী জননী, দেবী গর্জন প্রভৃতির মতো নাটক।

অভিমানভরে গোটা আন্দোলনের প্রতি অবিচার করতে কখনো প্ররোচিত করে নি। এরূপ কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতারই দরুণ বিজন অভিমান বশত (যে কোনো শিল্পীরই অভিমান অবশ্য থাকে) গণনাট্য সংঘ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কিনা আমার তা জানা নেই। এ সম্বন্ধে তাকে আমি কোনোদিন কিছু জিগ্যেসও করিনি। তবে এটা ভালো করেই জানি, গণনাট্য সংঘের দ্বার বিজনের জন্যে সর্বদাই খোলা ছিল। আমার বিশ্বাস, গণনাট্য সংঘ ছেড়ে না গিয়ে অভ্যন্তরে থেকেই বিজন যদি তার নিজস্ব ধ্যানধারণা অনুযায়ী স্বাধীনভাবেই নাট্যকর্ম চালাতো তবে 'নবান্ন'-এর ঐতিহ্যকেও সে যেমন আরো অনেক বেশি এগিয়ে দিতে পারতো তেমনি গণনাট্য আন্দোলনকেও আরো বেশি শক্তি যোগাতে সক্ষম হতো। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সংযুক্ত স্বতন্ত্র নাট্যদল গঠনে কোনো বাধা ছিল না।

বাংলা নাটক 'নবান্ন'-এর স্তরে পড়ে নেই। নতুন ভাবনা ও বিষয়বস্তু, নতুন আঙ্গিক ও প্রয়োগ কৌশল সংযুক্ত হয়ে গত তিন দশকে বাংলা নাটকের যেমন পরিমাণগত তেমনি গুণগত অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে। বিজনও 'নবান্ন'-এর ধাঁচেই সব নাটক লেখেনি। নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছে; যেমন তার 'আজ বসন্ত' ও 'চলো সাগরে' ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা। তবে যেখানে মাটির গন্ধ, সবুজের ছোঁয়া, জীর্ণ কুটীরেও প্রাণের তরঙ্গ, মাঠে ফসলের দোলা, সেখানেই যেন বিজনের কলম বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তার শিল্পীসত্তা সেই জীর্ণবস্ত্র শীর্ণকায় মানুষগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, তার মানবতাবোধ প্রকাশের যোগ্যতম ক্ষেত্র খুঁজে পায়।

যে দশকের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে আত্মসাৎ করে বিজন ও তার সমসাময়িকদের নাট্যবিকাশ সেই দশকটিকে উপলব্ধি না করলে বিজনের 'নবান্ন'-এর মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয়। চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধেই যুদ্ধ, নিষ্প্রদীপ, জাপ বিমান হানা, কালোবাজার এবং অবশেষে মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ বাংলার বুকে এমন এক মর্মান্তিক বিপর্যয় চাপিয়ে দিল যে পুরানো মূল্যবোধগুলির শিকড় ধরে টান পড়লো। মানবতা হাহাকার করে উঠলো। সে অবস্থায় কোনো সমাজসচেতন মানবতাবাদী লেখকেরই বিপর্যস্ত বাঙালী জীবনের চরম লাঞ্ছনার প্রতি উদাসীন থেকে রোমান্টিকতার সরোবরে প্রমোদতরণী ভাসানো সম্ভব ছিল না। সেই বিপন্ন মানুষগুলির দিকে তাকানো ও তাদের চরম দুর্গতির কারণ জানা ও তা সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরাই ছিল তখন সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকদের

তার শিল্পীসত্তা সেই জীর্ণবস্ত্র শীর্ণকায় মানুষগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, তার মানবতাবোধ প্রকাশের যোগ্যতম ক্ষেত্র খুঁজে পায়।

মানুষকে কাছে টানতে হবে। নিচের মানুষকে হাত বাড়িয়ে তুলে আনতে হবে। যারা এসেছে তাদের ধরে রাখতে হবে। লড়াইয়ের ময়দানে গড়ে তুলতে হবে নিবিড় সংহতি।

রাজনীতির হাত-ধরা সংস্কৃতি। সুতরাং কেউ কেউ তার ওপর খড়্গহস্ত হলেন। দক্ষিণপন্থীরা তো বটেই, 'বামপন্থী'দেরও একাংশ (যার মধ্যে ছিল সোমেন চন্দের হত্যাকারী)। হিটলার প্রীতি আর কমিউনিস্টবিদ্বেষ তাঁদের এক মঞ্চে মিলিয়ে দিয়েছিল।

যে রাজনীতির হাতে সেদিন সংস্কৃতি রাখী বেঁধেছিল, সে রাজনীতি কুচক্করে দলাদলির রাজনীতি ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ আর শ্রেণীশোষণের বিরুদ্ধে ছিল তার উদাত্ত ডাক। মানবিকতার ভিত্তিতে সংস্কৃতিকে দাঁড় করানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাই শিল্পীদের মনে সে আন্দোলন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

সাধারণ মানুষের দিকে সংস্কৃতির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার ফলে, স্বভাবতই পড়ার চেয়ে একই সঙ্গে চোখে-দেখা আর কানে-শোনার ওপর জোর পড়েছিল। লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে লিখিয়ে আর আঁকিয়েদের চেয়ে দলে ভারী হয়ে উঠলেন গান নাচ নাটকের শিল্পীরা।

বিজনদার লেখকসত্তার চেয়েও ঢের বড় ছিল তাঁর শিল্পীসত্তা। সুযোগ পেয়ে তাঁর প্রতিভা বাংলা নাট্যজগতের ভোল ফিরিয়ে দিল। রাজনীতির টান না থাকলে এ জিনিস সম্ভব হত না।

১৯৪৩ সালে বোম্বাইতে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্মেলন হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন শিল্পী। বোম্বাইয়ের বামপন্থী একদল কমিউনিস্টবিদ্বেষী লেখক সম্মেলন পণ্ড করবার চেষ্টা করেছিলেন। না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সংগঠন থেকে বেরিয়ে যান। অন্যদিকে ঠিক তখনই জন্ম নিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ।

শিল্পীরা ছেড়ে চলে যাওয়ায় আমাদের সঙ্ঘ কাণা হয়ে গেল। অবশ্য আমাদের দপ্তর একই থাকল।

বিজনদার 'আগুন' মঞ্চস্থ হয়েছিল সম্ভবত গণনাট্য সঙ্ঘ হওয়ার আগে। সেই ধারাতেই এসেছিল 'জবানবন্দী'। বিনয় রায়ের গান আর বিজনদার নাটক গণনাট্য সঙ্ঘকে সংস্কৃতির জগতে অবিসম্বাদী নেতার আসনে বসিয়েছিল।

আমি ইতিহাসের মধ্যে যাব না। কিন্তু সেইসঙ্গে এও ঠিক যে, বিজনদার প্রসঙ্গ উঠলে পুরনো সেইসব দিনগুলোর কথা মনে না হয়ে উপায় নেই।

'জবানবন্দী' নিয়ে নাট্যজগতে যখন তোলপাড় চলছে, তখন বিজনদার সঙ্গে আমার নিত্য দেখা হত। হয় ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে, নয় অরুণ মিত্রের বাসায়।

বলতে গেলে প্রায় রোজই আমরা সদলবলে ফিরতাম এসপ্ল্যানেড থেকে দক্ষিণ মুখো ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে। সারা রাস্তা আমরা গান গাইতে গাইতে যেতাম। আমার গলা ছিল না। তবু গাইতাম।

আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, অত নাম হওয়া সত্ত্বেও বিজনদার পোশাক আশাকে চলন বলনে কোনো পরিবর্তন দেখি নি। এটা নিছক ব্যক্তিগত স্বভাবের ব্যাপার নয়। আসলে তার পেছনে ছিল আদর্শের টান, নিজেকে দলের একজন ব'লে ভাবা আর সেইসঙ্গে দেশের মানুষের মধ্যে নিজেকে চারিয়ে দেওয়ার সানন্দ অনুভূতি।

বিজনদার ছেলেবেলার কথা জানি না। কিন্তু তাঁর কথা বলা, অভিনয় করা, গান গাওয়া থেকে মনে হয় বাংলাদেশের গ্রাম্য প্রকৃতি আর মানুষের ভেতর বদ্ধমূল তাঁর শেকড়। লোকসংস্কৃতি সব সময়ই তাঁর প্রস্থানভূমি। বিজনদাকে তাই সব অর্থেই বলা যায় মাটি রমানুষ।

দেনাপাওনার কথা তুলে লাভ নেই। বিজনদা আমাদের যা দিয়েছেন, তার শতাংশের একাংশও আমরা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি। সমাজতন্ত্র করে ফেলতে পারলেই যে তা আপনা আপনি হয়ে যেত, এই সরল বিশ্বাসে আমার মন ওঠে না।

এদেশে শ্রমিক কৃষক কর্মচারীর এত বড় বড় সংগঠন থাকতেও সৃষ্টির কাজে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিজনদার মত শিল্পীদের হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়, এই অক্ষমতা কবে আমাদের লজ্জা দেবে?

শরীরের সঙ্গে মনের অচ্ছেদ্য যোগের কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। ধনতন্ত্রের বাজারে মন বাঁধা রেখে শুধু শরীরটাকে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের মধ্যে চালান করার মূঢ়তা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে।

বিজনদা সারা জীবন আঙুল তুলে সেই রাস্তাটাই মরি বাঁচি ক'রে আমাদের দেখিয়ে চলেছেন। ▭

এ দেশে শ্রমিক কৃষক কর্মচারীর এত বড় বড় সংগঠন থাকতেও সৃষ্টির কাজে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিজনদার মত শিল্পীদের হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়, এই অক্ষমতা কবে আমাদের লজ্জা দেবে?

সমূহ দায়িত্ব, যেমন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর কালের দায়িত্ব পালন করেছিলেন 'নীল দর্পণ' লিখে। 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' দিয়ে বিজন সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বই পালন করেছে।

কানাঘুষা শোনা যায়, এখন আর সেই মন্বন্তরের অবস্থা নেই; কাজেই 'নবান্ন' নাটকের আবেদন ও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, এখন তা ইতিহাসের ছিন্নপত্র মাত্র। এভাবে কালবিধৃত কোনো সাহিত্যের বিচার করলে বলতে হয়, তা হচ্ছে নিত্যভোজ্য বাজার-পণ্যেরই মতো সাহিত্যেরও মূল্যকে এক করে দেখার মূল্যবোধ। তাৎক্ষণিক সাহিত্য না থাকে এমন নয়; কিন্তু একেকটা জাতির উত্থান-পতনের ঐতিহাসিক মর্মবস্তু বিশেষ কালের সাহিত্যে বিধৃত থাকলে সেটা কেবল সেই কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, কালোত্তীর্ণ হয়ে সেটা ভাবী-কালের মানুষেরও সম্পদ হয়ে ওঠে। তার কারণ জীবন প্রবহমান, সে কোনো ঘটনা বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিচার্য বিষয়, 'নবান্ন' নাটকে বিজন সেই বিপর্যয়ের ঘূর্ণাবর্তে নিজেকেও হারিয়ে ফেলেছিল কি না, না সে জীবনের প্রবাহ-মানতা ও ইতিহাসের চলিষ্ণুতার প্রতি দৃষ্টি রেখে বিপন্ন মানুষগুলির মধ্যে তীব্র জীবনতৃষ্ণা দেখাতে পেরেছে। তা যদি পেরে থাকে তবে 'নবান্ন' নাটকের আবেদন আজো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তার মূল্যও ফুরিয়ে যায় নি।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় আমরা যখন 'নীল দর্পণ' মঞ্চস্থ করি তখন এ যুগের দর্শকরা উনবিংশ শতকের সেই নীল বিদ্রোহের কালের মানুষ ছিলেন না। কিন্তু আমাদের তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে যে নাট্যচক্র প্রযোজিত 'নীলদর্পণ' এ যুগের দর্শক-দেরও কিভাবে আলোড়িত করেছিল। প্রসঙ্গত বেরটোল্ট ব্রেখ্‌টের একটি কথা মনে পড়ে। গোর্কির 'মাদার' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, ইতিহাসের এমন একেকটা অধ্যায় আছে যার আবেদন সর্বকালেই থাকে। গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসে রুশ জাতির ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায় বিধৃত যা সর্বকালে সর্বদেশের মানুষকেই অন্যায় ও পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণা যোগায় ও যোগাবে।

বিজনের 'নবান্ন' ও অন্যান্য নাটকের বিচারও এই মানদণ্ডেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপাত মূল্য দিয়ে কোনো শিল্প-সাহিত্যেরই প্রকৃত বিচার হতে পারে না। বিজনের নাটকের দোষগুণ বিচারে আমি যাব না। একই লক্ষ্য নিয়ে আমরা সহযাত্রী, যদিও নাট্যকর্মে আমরা স্বতন্ত্র এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক। সে তার নিজের ধ্যানধারণা অনুযায়ী নাটক দিয়েছে, আমি দিয়েছি আমার মতো করে। কিন্তু জীবনের মূল্যবোধে, মূল চিন্তায় ও আদর্শে আমরা সতীর্থ। বিশেষত বিজন আমার বন্ধু। বন্ধু-বাৎসল্য বশত তার নাটকের ত্রুটিগুলো আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। আবার নাটকের ক্ষেত্রে সে আমার স্বগোত্র বলে তার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার দ্বারা অজ্ঞাতসারে তার নাটকের অবমূল্যায়ণ হওয়াও অসম্ভব নয়। দু'দিকে ভয় আছে বলেই এ কাজে আমার নিবৃত্ত থাকাই সঙ্গত। যাঁরা পক্ষপাতশূন্য হয়ে তুলনামূলকভাবে বিজনের নাটকগুলোর দোষগুণ বিচার করতে পারবেন তাঁদের হাতে সেই দায়িত্ব ছেড়ে দেয়াই ভালো।

তবে বিজন আমার কাছে একটা ব্যক্তি বা শুধু একজন নাট্যকারই নয়, সে নিজেই একটা ইনস্টি-টিউশন, আর একটা যুগের প্রতীক। তাই যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই তার সম্বন্ধে দু চার কথা বলতে হলো। ▭

মাটির মানুষ । সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বিজনদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ কবে?
আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর বিজনদা তখন আনন্দবাজারে কাজ করেন।
ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ গড়বার পর্বে।
যতদূর মনে পড়ছে, বিজনদা তখন গল্প লিখতেন। কে আমাকে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন? অরুণ মিত্র না স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য? ঠিক মনে করতে পারছি না।

বিজনদা বাইরের লোকের কাছে মুখচোরা হলেও নিজস্ব বন্ধুমহলে ছিলেন বেশ সপ্রতিভ। চোখদুটো ছিল ভাসা ভাসা। মানুষের মন জয় করতেন সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে। গলার স্বর নিচু পর্দায় বাঁধা থাকলেও মাঝে মাঝে হঠাৎ আবেগে উঠত নামত।

আমাদের সঙ্গে বিজনদা যোগ দিয়েছিলেন গল্প লেখার সূত্রে— নাট্যকার হিসেবে তো নয়ই, এমন কি শিল্পী হিসেবেও নয়। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল, 'শিল্পী' বলতে গোড়ায় আমরা হিসেবের মধ্যে ধরতাম যাঁরা চিত্রকর বা ভাস্কর শুধু তাঁদেরই। কিন্তু আমাদের আন্দোলনের মধ্যে আস্তে আস্তে এসে গেলেন নাচগান নাটকের জগতের অনেকে। তার জন্যে সঙ্ঘের নাম বদলাবার দরকার হয় নি। 'শিল্পী' শব্দের অর্থটা শুধু আরেকটু ব্যাপ্তি পেল।
তখনকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুধু লেখা আর পড়ার মধ্যে কেন বাঁধা থাকে নি, তার কারণ খুব স্পষ্ট। ইয়ুথ কালচারাল লীগের চিন্তাশীল বক্তৃতামালার কথা ক'জন আজ মনে রেখেছে? কিন্তু 'কেরানি' নাটক বা সমবেত কণ্ঠের গানগুলো ভোলার নয়। তেমনি ভোলার নয় ছাত্র ফেডারেশনের ইংরিজি পোস্টার ড্রামা কিংবা সারা বাংলা সফরকারী তাদের সাংস্কৃতিক বাহিনীর গান নাটক।

আসলে এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল রাজনীতিরই গরজে। দূরের

তারপরে 'জবানবন্দী' লিখল গোষ্ঠদা। নবান্নর আগে জবানবন্দী। জবানবন্দী নাটক হিসেবে একটা অন্যরকম তো বটেই, কি বলব' একেবারে চাষাদের নিয়ে তো— মানে, এটা তখনকার চিন্তায় নয়, অনেক পরের চিন্তায় বলছি— নীলদর্পণ নাটক লেখা হয়েছিল চাষা-দের সম্পর্কে, চাষাদের নিয়ে ঠিক নয়। সেখানে নায়ক ছিল নবীনমাধব বা বিন্দুমাধব— তাদের সঙ্গে জড়িত একটা আন্দোলনের ব্যাপার দেখানো হয়েছিল, এখানে নবান্ন বা জবানবন্দীতে যেটা সবচেয়ে আমার চিন্তাকে নাড়া দেয় সেটা হল— চাষা নায়ক। এ নিয়ে তার আগে কোন নাটক লেখা হয়নি মনে হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা মোড় ফিরিয়ে দিল। সেটা ও কি বুদ্ধিতে কি ভেবে লিখেছিল আমি জানি না। কিন্তু দেশ যেটা পেল ওর কাছ থেকে সেটা বলব যে একটা একেবারে মোড় ঘোরানোর ব্যাপারই। ও যদি না লিখত, তাহলে এই বাংলার নাট্য আন্দোলনই বলি বা গণনাট্যআন্দোলন বা তখন সেটা যে নামই থাক না, এই মোড়টা ফিরত কিনা জানি না। প্রফেশনাল থিয়েটারগুলো সেই সময় প্রায় একটা স্ট্যাটিক জায়গায় পৌঁছেছিল। শূন্যতা কোনভাবে পূরণ হতই। নিশ্চয়ই হত। কিন্তু কি ভাবে? জবানবন্দী লেখার একবছর পরই বোধ হয় নবান্ন লেখা হয় বা ছ'মাসও হতে পারে। পরিচালনা করলেন একসঙ্গে শম্ভু মিত্র এবং বিজন ভট্টাচার্য— ১৯৪৪ সাল সেটা। ততদিনে ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে আলাদা হয়ে জন্ম নিয়েছে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। 'নবান্ন' ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নামেই প্রযোজনা হয়। এই একটি নাটকের মাধ্যমে এই সংস্থা অস্বাভাবিক খ্যাতি অর্জন করে বাংলা দেশে তথা সারা ভারতে। এই নাটকের ওপর প্রধানতঃ নির্ভর করেই আই. পি. টি-এর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'ধরতী কে লাল' তৈরী হয়।

১৯৪৭-৪৮ সালে আমাদের আই. পি. টি.-এ ছাড়তে হয়। গোষ্ঠদাও ছেড়ে দেয়। আমাদের কারণ আর ওর কারণ আলাদা হতে পারে হয় তো কিন্তু ছাড়তে হয়। তারপর আমরা একসঙ্গে মিলে 'নবান্ন' আর একবার অভিনয় করি রংমহলে। তারপর গোষ্ঠদার সঙ্গে আর এক সঙ্গে কাজ করা হয়নি।

এরপর আরও দু'একটা নাটকের পর ও 'জীয়ন কন্যা' লেখে। গানের নাটক। অপেরা করবার মত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ নাটক তেমন করে প্রযোজনা হয়নি। না হলে আমার মনে হয় এটাও একটা দারুণ গীতিনাট্য বলে চিহ্নিত হত।

আর 'আজ বসন্ত' নাটকটি? সংলাপগুলো কাব্যের মতই লাগে।

এবার বিজনদার অভিনয়ের কথা একটু বলি। 'নবান্ন'তে একটা দৃশ্য ছিল গ্রাম ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত চাষারা এসেছে কলকাতায় একটু খাদ্য সংগ্রহের আশায় যদি টিঁকে থাকা যায়। এক বুড়ো, যার স্ত্রী '৪২-এর আন্দোলনে ইংরেজের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে— দুটি ছেলেও। ভাইপোদের নিয়ে যার সংসার ছিল। তাদের সঙ্গে কলকাতায় এসে হারিয়ে ফেলেছে তাদেরও। তার নাকি ব্যথা সর্বাঙ্গে। এক খয়রাতি চিকিৎসালয় দেখে ঢুকে

পড়ে সেখানে। ডাক্তারকে বলে, 'আমার ব্যথা সারিয়ে দাও'। ডাক্তার বলে, 'কোথায় তোমার ব্যথা'? একবার শরীরের এখানে আর একবার ওখানে, নানা জায়গা দেখাতে থাকে। ডাক্তার বোঝে মাথার গোলমাল, বলে— 'তোমার ব্যথা-ট্যথা কিছু নেই— ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা।' বুড়ো বলে— 'ভুলে যাব?' তারপর 'ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা, ভুলে যাও' এই কথাটা ক্রমাগত আবৃত্তি করতে করতে সেই বুড়ো বেরিয়ে যায় মঞ্চ থেকে। বুড়োর নাম প্রধান সমাদ্দার আর ভূমিকা অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য। সে যে কি অভিনয় যারা না দেখেছে তাদের বোঝান সম্ভব নয়। চলবার ভঙ্গী, বলবার ভঙ্গী। আর কারো দ্বারা কখনও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। প্রতিটি দর্শক বিচলিত। উইংসের পাশে আমরাও অভিভূত। আরও অনেক— অনেক দিন পর দেখেছিলাম 'মরাচাঁদ' নাটকে ওর অভিনয়। অন্ধ গায়ক পবন। দোতারা বাজিয়ে গান গায়। রাজনৈতিক সভায়ও গান গাইতে নিয়ে যায় বাবুরা কখনও-সখনও। তার সুন্দরী বৌ প্রেমে পড়ল এক বৈষ্ণব ভেকধারী ভণ্ডের। তারপর একদিন তার সঙ্গে চলে গেল। আমি যে অভিনয়টি দেখেছিলাম তাতে দুটি চরিত্রেই গোষ্ঠদা অভিনয় করেছিল। দুটিই অসাধারণ অভিনয়। তার মধ্যে বিশেষ করে পবন। বৌ চলে গেছে— বিমূঢ় পবন একলা বসে আছে। এমন সময় রাজনৈতিক কর্মী এসে বলে যে, 'পবন আজকের মিটিং-এ তোমাকে গান গাইতে হবে…।' পবন হঠাৎ বলে, 'আমি গান গাইতে পারব না বাবু, আমার সব ভেঙ্গে গেছে' এই জায়গাটায় সেদিন এমন একটা অভিনয় করেছিল! চড়া জায়গা থেকে সুরু করে আরও চড়া জায়গায় গলা নিয়ে গিয়ে প্রায় আর্তনাদের জায়গায় পৌঁছেই কোন ছেদ না দিয়েই একটা বুক ফাটা গান ধরল। দর্শক ফেটে পড়ল সেদিন। এও না দেখলে বোঝান অসম্ভব।

বিজনদা আমার আত্মীয়, আমার দাদা, ওর সম্পর্কে বেশী বলতে গেলে কেমন শোনাবে জানি না। তবে অনেক গুণের অধিকারী ও। এক সময়ে আই. পি. টি. এর জন্যে অনেক গানও বেঁধেছিল। 'ও হোসেন ভাই দামুক দিয়ার চাচা…' খুবই বিখ্যাত হয়েছিল সে সময়। আর একটা কথাও না বলে পারছি না। অপূর্ব ভঙ্গীতে ওর নিজের নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়া। প্রত্যেকটা ঘটনা এবং চরিত্র জ্যান্ত হয়ে চোখের সামনে যেন ফুটে উঠত। এর স্বাদ হয়তো এখনও অনেকে পেতে পারেন। বিশেষ করে মনে পড়ছে 'আজ বসন্ত' নাটকটা পড়বার কথা।

দুঃখ হয় অ্যাকাডেমী পুরস্কার ও পেল কিন্তু অনেক পরে। আরও অনেক আগে ওর এই পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল। তবু ইংরেজী প্রবাদের 'বেটার লেট দ্যান নেভার' প্রবাদটা মনে করে একটু সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে। নবান্ন, কৃষ্ণপক্ষ, দেবীগর্জন, এই সব পড়লে মনে হয় ওর নাটকে মাটির গন্ধ লেগে আছে। মাটির কাছাকাছি মানুষের নাট্যকার ও। ▭

* * * তাঁর আগুনে-ই আজকের শ্রেষ্ঠা মঞ্চাভিনেত্রীর অভিনয় জীবনের শুরু

মাটির কাছাকাছি মানুষের নাট্যকার ও । তৃপ্তি মিত্র

বিজন ভট্টাচার্য হচ্ছেন আমার আপন মাসতুতো ভাই। অবশ্য অনেক জায়গায় অনেক লেখাতে একথা আগে বলাও হয়ে গেছে। মানে, ওর মা আর আমার মা আপন সহোদরা বোন। কাজেই অনেক আগের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু এসব কথা বলতে গেলে ব্যক্তিগতই হয়ে পড়ে।

১৯৩৯ সালে আমি কলকাতায় এসেছিলাম পড়াশোনা করবার জন্যে। থাকতাম আমার মামা বাড়িতে। মামা, মানে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আমারও মামা, ওরও মামা— বড়মামা আমাদের। সেখানে দেখতাম ও খুব আসত। আমার দিদিও থাকতেন। আমার দিদিকে ও দিদি বলত, মানে, সাধারণভাবে তো মাসতুতো বোনদের দিদি বলে না, আমার দিদিকে সবাই দিদি বলত। আমার জামাইবাবুর নাম অরুণ মিত্র, কবি। কাজেই অরুণদার সঙ্গে ওর খুব জমত। এসে নানারকম সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করতে ও উৎসাহ বোধ করত। আমি তখন খুব ছোট, ক্লাস সিক্স পাশ করে কলকাতায় এসেছিলাম পড়তে, কারণ আমাদের ওখানে তখন মাইনর স্কুল ছিল, তার বেশী ছিল না। আমার যতদূর মনে পড়ে, ও বি. এ. পরীক্ষা দিতে দিতে উঠে চলে এসেছিল, ভাল লাগেনি, দিল না পরীক্ষা এই গোছের আর কি। মানে ও এইরকমই ছিল, একটু খেয়ালি গোছের।

তারপর তো যুদ্ধ শুরু হল এবং ৪২-এর শেষে যখন ব্রিটেন জড়িয়ে পড়ল যুদ্ধে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরাও জড়িয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়িতে খুব আলোচনা হত এসব নিয়ে, সাংবাদিকের বাড়ি তো, অনেক সাংবাদিকও আসতেন এবং অনেক রকম আলোচনা হত। সেখানে এসে ও অংশগ্রহণ করত। তখন থেকেই ও লিখবার চেষ্টা করত।

তারপর আমি ম্যাট্রিকুলেশন দিলাম, আর ঠিক ঠিক তারিখ বলতে পারব না, সেই সময় ও একটা নাটিকা লিখেছিল, সেটা আমাদের বাড়িতেই বোধ হয় প্রথম পড়েছিল যতদূর মনে পড়ছে; কারণ ও কিছু লিখলেই দিদি আর খোকাদাকে (অরুণ মিত্র) শোনাতে চেষ্টা করত। সেই নাটকটার নাম ছিল 'আগুন'। নাটক না নাটিকা তখন আমার অত জানাও ছিল না, 'অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স্ এণ্ড আর্টিস্টস্ এসোসিয়েশন' বলে একটা সংস্থা গড়ে উঠেছিল। সেখানে ও এবং আমার জামাইবাবুও মেম্বার ছিলেন। সেইখান

থেকে ওর নাটিকাটি করবার কথা হয়।

নাটিকাটির নাম -- ঐ 'আগুন'। পটভূমিকা বস্তি জীবন— না খেতে পেয়ে স্বামী স্ত্রীকে ধরে মারছে। স্ত্রী বলছে চাল নেই আমি রাঁধব কি? ইত্যাদি। আমি শুনলাম, অরুণদারা বেশ প্রশংসা করছে— বাঃ বেশ তো তুই লিখেছিস, বেশ তো তুমি লিখেছ— এইরকম। তা আমি ওর মধ্যে থাকছি বলে ভাবিওনি কোনদিন, এমন সময় একদিন হন্তদন্ত হয়ে গোষ্ঠদা (বিজন ভট্টাচার্য), এসে বলল, মণি, (আমার ডাক নাম মণি) তোকে একটা পার্ট করে দিতে হবে, কারণ খুব সম্ভব যিনি এটি করছিলেন তিনি চলে গেছেন। তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে অভিনেত্রী পাওয়া সহজ ছিল না। এখন সাত দিন পরে নাটক, কি করে নাটক হবে, করে দিতেই হবে। বললাম— না বাবা, আমি পারব-টারব না। প্রথমতঃ ছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করা সম্ভব বলে আমার মাথায়ই ঢুকত না তখন। তা, ও-ও আমাকে জোড় করতে লাগল। দিদি বলল 'যা না করে দে না, বেচারা প্রথম নাটক লিখল, নইলে ওর নাটকটা হবে না।'

এটা যখন বলছি তখন ৪৩ সাল হবে। তখন সবে দুর্ভিক্ষটা শুরু হয়েছে। সব লোক আসতে শুরু করেছে। তার জন্যে টাকা তোলা দরকার। শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বোধ হয় স্কুল জীবন থেকেই ওর পরিচয় ছিল। এবং বিনয় ঘোষই বোধ হয় শম্ভু মিত্রকে নিয়ে যান অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স এণ্ড আর্টিস্টস্ এসোসিয়েশনে। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি অনেকেই ছিলেন ঐ এসোসিয়েশনে।

গোষ্ঠদার যে নাট্যকার হিসেবে আর একটা পরিচিতি সেটা ওখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম। যাই হোক, ওর নাটকটা আমাকে করতে হয়েছিল। বিচিত্রানুষ্ঠান হয় না? সে রকমই হয়েছিল। জর্জ, দেবব্রত বিশ্বাস গান গাইলেন। প্রথমে বিনয় রায় কিছু গান লিখেছিলেন আই. পি. টি. এর জন্যে, কাস্তেটারে দিও জোড়ে শান কিষাণভাই গোছের, এরকম আরো, মনে পড়ছে না, তখন সেগুলো খুব গাওয়া হত, সেসব দিয়ে কিছু নাচ তৈরী করা হল, আয়রে মোরা ফসল কাটি-টা নাচ হল, সুচিত্রা (মিত্র)-ও গান গাইল। তখন সুচিত্রাও সবে শান্তিনিকেতন থেকে পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। আর বিজন ভট্টাচার্যের আগুন নাটিকাটি অভিনয় হল। আর একটি নাটিকা বোধ হয় হয়েছিল বিনয় ঘোষের ল্যাবরেটরী। তাতে শম্ভু মিত্র অভিনয় করেন, পরিচালনাও করেন।

ওর, বিজনদার কাজ সম্পর্কে আমার একটা ধারণা হল। একজনের অনুপস্থিতিতে আমাকে একটা কাজ করে দিতে বলা হয়েছিল। করে দেওয়ার পর আর যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, তাই যাইওনি। যাই হোক, ব্যক্তিগত ব্যাপারটা এই রকম ছিল। তারপর মাঝখানে অনেক ব্যাপার হল, সেটা আমার ব্যাপার। পড়াশোনা ইত্যাদি নিয়ে। আবার আর একজনের অনুপস্থিতিতে ঐ ল্যাবরেটরী নাটকেই বোধহয় আবার অভিনয় করে দিয়ে আসতে হল।

শিল্পী তিনি কিন্তু অভাব শৃঙ্খলার । শোভা সেন

১ ৯ ৪ ৩ সা লে গ ণ না ট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে 'নবান্ন' নাটকের প্রস্তুতি চলছে। হ্যারিসন রোডের তিনতলায় জীর্ণ বাড়িতে একটি বিরাট হল। চাটাই বেছান মেঝে। এক ভদ্রলোক বসে আছেন, সুন্দর চেহারা, মুখে স্মিত হাসি। পরিচয়ের পালা শেষ হলো। ইনিই শ্রদ্ধেয় বিজন ভট্টাচার্য। পরে আমাদের সকলের বিজনদা। শুনেছি আনন্দবাজারের চাকরী ছেড়ে পার্টির কাজে যোগ দিয়েছেন। অরণি কাগজে নিয়মিত লেখেন। 'নবান্ন' নাটক ধারাবাহিকভাবে ঐ কাগজেই বেরিয়েছে।

আমাদের বলা হলো ইনিই তোমাদের নাট্যগুরু বা শিক্ষক। পার্টি বলে দিয়েছেন গুরু তাই নির্দ্বিধায় গুরু বলে নিয়েছিলাম। পরে আরেক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি থাকেন চারতলায়, নাম শম্ভু মিত্র। গুরুগম্ভীর রাশভারী মানুষ। ইনিও শিক্ষক। বিজনবাবু অভিনয়, সংলাপ শেখাবেন ; শম্ভুবাবু মঞ্চ, সংগীত ইত্যাদি।

বিজনবাবু অরণি থেকে একপাতা সংলাপ পড়তে দিলেন। মাত্র বি. এ পরীক্ষা কয়েকদিন আগে দিয়ে কোন রকমে পাশ করেছি। আবার পরীক্ষা! সেরেছে! যাক বলে গেলাম সাধ্যমত। চাষীর বৌ। দুর্ভিক্ষের করালছায়া সংসারকে ছেয়ে ফেলেছে। নম্র, স্নেহময়ী বধূ পরিণত হয়েছে খিটখিটে, রূঢ় ভাষিণী, পোড় খাওয়া মেয়েমানুষে।

কিছুক্ষণ পর রায় এল— 'কাল থেকে রোজ বিকেল ৪ টেয় এখানে আসবে।' বাব্বা : হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আস্তে আস্তে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ হলো। তৃপ্তি, আমাদের মণি, বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট, করছে আমার জায়ের চরিত্র। বিজনবাবু করবেন আমার শ্বশুরের পার্ট। বহু চরিত্র। জড়ো হতে লাগলো গণনাট্যের ছত্রছায়ায়।

বিজনবাবু রোজ মহড়া নেন। প্রথমে সংলাপ যশুরে টানে বলতে শেখান। কত স্নেহবশে সেই মানুষটি আমাদের শিখিয়েছেন তা আজও স্মৃতির মণিকোঠায় জাজ্জ্বল্যমান হয়ে আছে। কিছু-দিনের মধ্যেই গোটা নবান্ন শিল্পীগোষ্ঠী এক নবান্ন পরিবারে পরিণত হয়েছিলাম। বিকেল হতে না হতেই সেই হ্যারিসন রোডের বাড়িটা হাতছানি দেয়।

শিক্ষক-ও কখন যেন বড় ভাইয়ের আসন গ্রহণ করে বসে আছেন টেরও পাইনি। শুনেছি

বিজনবাবু অসুস্থ টি বি রোগী ছিলেন। একটা ফুসফুস তার বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাস করিনি। এক ফুসফুস নিয়ে অত চীৎকার কেউ করতে পারে? প্রথম দৃশ্যে সেই ধানের গোলায় আগুন লাগতে দেখে বৃদ্ধ প্রধানের আর্তচিৎকার ও রোদন আজ ৩৪ বছর বাদেও কানে বাজছে। কি অমানুষিক পরিশ্রম করতেন।

'নবান্ন'-এর সাফল্য যেন আমাদের আদর্শের চ্যালেঞ্জ। তাই নবান্ন হয়ে আছে ইতিহাসে অমর। তার বিষয়বস্তু, দলগত অভিনয়, তার মঞ্চসজ্জা, প্রযোজনা সবই যেন এক চিরাচরিত বাংলা নাট্যজগতের বিদ্রোহের প্রতীক।

এর অভিনয় ও নাটকের পুরো কৃতিত্ব বিজনবাবুর। এতবড় সাফল্যের পর আমাদের ও দেশবাসীর বিরাট প্রত্যাশা থাকে সেই নাট্যকারের কাছে। তাই দিনের পর দিন অপেক্ষা করে-ছিলাম আরেকটি বিদ্রোহের গান শুনতে।

এল 'জীয়নকন্যা'। পড়া হলো। এও এক অভিনব সৃষ্টি, পরীক্ষামূলক গীতিনাট্য, কিন্তু বাস্তবরূপ দেওয়া কঠিন। বিজনবাবু চিরদিনই সৃষ্টিছাড়া। বাঁধাধরা গৎ-এ ওঁকে বিচার করা যায় না। যে নাটক অভিনয়, নাচ, গান তিনের সমষ্টির ফল, তাকি আমাদের দলের পক্ষে সম্ভব? কোথায় আছে একদলে ন্যূন পক্ষে ১৫ জন শিল্পী এই তিনটি কলাতেই পারদর্শী। তাই অবাস্তব স্বপ্ন বাস্তবে কোনদিনই রূপ পেল না।

ভেসে বেড়াতে লাগলাম স্রোতে খড় কুটোর মত। বিজনদা কিন্তু সেরকম নাটক তাড়াতাড়ি দিতে পারলেন না। অগত্যা গণনাট্যের অতি উৎসাহী ছেলেমেয়েগুলো তখন যা পেল তাতেই মেতে থাকতে চাইল।

তার কিছুদিন পর শ্রদ্ধেয় জ্ঞান মজুমদার জড়ো করলেন আমাদের সকলকে 'নীলদর্পণ' নাটকের মহড়ায়। 'নাট্যচক্র' নতুন দল হলো। পুরোনো অনেকে এবং নতুন কিছু ছেলেমেয়ে নিয়ে কাজ শুরু হলো। দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'নীলদর্পণ' কেটেছেঁটে একটা রূপ দিলেন। পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য তার ওপর কিছু অদলবদল করে নাটক পরিচালনা করলেন। সেখানেও খুব সাফল্যের সঙ্গে এ নাটক চললো কিছুদিন। 'নবান্ন'-র বিরুদ্ধে অন্য পেশাদারী মঞ্চগুলি জোট বেঁধে মঞ্চস্থ করতে বাধা দিয়েছিল। ই. বি. আর ম্যানসন ইনস্টিটিউটে কিছুদিন অভিনয় করার পর সে নাটকে দর্শক কমতে লাগলো। তাই 'নীলদর্পণে' প্রথমেই কালিকা থিয়েটারের সঙ্গে চুক্তি হলো। নাটকও রমরম করে চলতে লাগলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার বন্ধ। সেও বোধ হয় মালিকের সুবিধাবাদী সর্তে আমরা রাজি হতে পারিনি বলে।

এবার আমরা অল্প কয়েকজন শিল্পী বিজনবাবুর ডাকে জড়ো হলাম 'কলঙ্ক' নাটকের মহড়ায়। বিজনবাবুর দু'টি নাটিকা 'কলঙ্ক' ও 'মরাচাঁদ'। 'জবানবন্দী'-র পর এত শক্তিশালী একাঙ্কিকা চোখে পড়েনি।

'কলঙ্ক' নাটকে আমি বিজনবাবুকে প্রস্তাব দিলাম বৃদ্ধা (আমার শাশুড়ী)-র চরিত্রে যেমন করে হোক প্রভা দেবীকে আনতে হবে। আমি তখন সবেমাত্র চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেছি।

নবান্নের সাফল্য যেন আমাদের আদর্শের চ্যালেঞ্জ। তাই নবান্ন হয়ে আছে ইতিহাসে অমর। তার বিষয়বস্তু দলগত অভিনয়, তার মঞ্চসজ্জা প্রযোজনা সবই যেন এক চিরাচরিত বাংলা নাট্যজগতের বিদ্রোহের প্রতীক।

তখনকার নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতের অদ্বিতীয়া সম্রাজ্ঞী এবং আমি মনে করি প্রভা দেবী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতমা। তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে 'বামুনের মেয়ে' ছবিতে কাজ করতে গিয়ে। কত স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে শিখিয়েছেন এই কাঁচা শিল্পীটিকে। অভিনয়ের কিছুই জানতাম না। 'নবান্ন' রক্ষাকবচ। কিন্তু তা দিয়ে অভিজ্ঞ পেশাদারী শিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা।

সাহস করে গেলাম প্রভা দেবীর কাছে। প্রস্তাব করলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম এককথায় সম্মতি জানালেন। আকাশের চাঁদ পেলাম হাতে। বিজনবাবুও অবিশ্বাস্য এই কৃতিত্বের জন্য আমাকে বাহবা দিলেন। আর প্রভা দেবীকে আমার বাড়িতে আনবার ব্যবস্থা করতে বললেন। গোয়াবাগানের বাড়িতে এলেন আমাদের প্রভা-মা। ছাতে মহড়া শুরু হলো। নতুন পরিবেশ, নতুন পদ্ধতি, সবকিছুই নতুন। কিন্তু জাতশিল্পী। প্রথমটা একটু ধাতস্থ হবার সময় নিলেন। চরিত্র ও সংলাপ বিজনবাবুর কাছে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন।

সবসময় ভয়ে ভয়ে আছি কখন বলবেন, 'এ আমি পারবো না বাপু!' কিন্তু না! একদিনও এতটুকু বিরক্ত বা ক্লান্ত হতে দেখিনি। ওঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিল। বিজনবাবুও নিজগুণে ওঁকে নিজের দিদির আসনে বসিয়ে শেখাতে লাগলেন। দু'জনের সেই মহড়া শিক্ষার দিনগুলি আমার কাছে চিরদিনই অমলিন হয়ে থাকবে।

আমরা গণনাট্যের শিল্পীরা প্রথম থেকেই আঞ্চলিক ডায়ালেক্টে পারদর্শী। গাঁয়ের ভাষা চট করে আমরা রপ্ত করতে পারি। বিজনবাবুও এ ব্যাপারে অদ্বিতীয়। আজ পর্যন্ত এত সুন্দর ডায়ালেক্ট আর কাউকে শেখাতে আমি দেখিনি। তাই কলঙ্কের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে আমার বিশেষ অসুবিধে হয় নি। প্রভা দেবীর এই অক্লান্ত পরিশ্রম দেখে সহানুভূতি জাগত। সেও ম্যানসন ইনস্টিটিউটে। প্রথম অভিনয় হবে। শুরু হলো অভিনয়। নাটক শুরু হতেই বুঝলাম এই শক্তিশালী অভিনেত্রীটি কোন পর্যায়ে চলে গিয়েছেন। নিজেদের ছোট বলে মনে হলো। সত্যিই! ওঁর কাছে শিশু, নগণ্য। কোন ফাঁকে চরিত্রটি পুরো আয়ত্ত করে আমাদের

বিজনবাবু এখনও নাটকে সমান উৎসাহী। এখনও কোন সংগঠন থেকে ওঁকে পুরো সহায়তা দিলে উনি অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

মেরে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন থেকে শিক্ষা হলো অহঙ্কার করবো না কোনদিন। এঁদের পদ-নখ-যোগ্যতা যার নেই সে গর্ব করে কিসের জোরে?

প্রভা দেবীও বিজনবাবুর শিক্ষকতার তারিফ করে গেছেন যতদিন বেঁচে ছিলেন।

তখন স্টুডিওতে আমাদের দলে খুব কম শিল্পীই ছিলেন। গণনাট্যের আদর্শে আমরা দু'চারজন ঢুকেছি মাত্র। কিন্তু প্রভা দেবী চারদিকে আমাদের নিষ্ঠা ও আদর্শের প্রশংসা করে বেড়াতে লাগলেন। আমাদেরও সাহস বাড়লো।

বিজনবাবুর জীবনেও এমন শিষ্যা আর এসেছে বলে জানা নেই।

এরপর যেন নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন নানাভাবে। ক্যালকাটা থিয়েটার ওঁর দল। অনেক নাটক করতে চেয়েছেন। কিছু হয়েছে, কিছু হতে পারেনি নানা কারণে। শিল্পী তিনি কিন্তু তাঁর মধ্যে শৃঙ্খলা বস্তুটির ছিল অভাব। তাই ওঁর মত নাট্যকার ও শিক্ষকের যে আসনে ওঠার শক্তি ছিল তা তিনি পারলেন না। শারীরিক, পারিবারিক নানা বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মানুষটি চিরদিনই খেয়ালি, চিরদিনই পাগল। বিজনবাবু এখনও নাটকে সমান উৎসাহী। এখনও কোন সংগঠন থেকে ওঁকে পুরো সহায়তা দিলে উনি অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

গ্রাম্যচরিত্রে বিজনবাবুর অভিনয় কত উচ্চপর্যায়ের হতে পারে তা দর্শকমাত্রেই পরিচয় পেয়েছেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' যখন নাট্যরূপ পেল ও মঞ্চস্থ করার জন্য তৈরী, তখন এই বৃদ্ধ মালোর পার্ট কে করবে এই হলো সমস্যা।

আমাদের দলে তো কেউ নেই। মনে পড়লো একজনেরই কথা— সে বিজনদা। আমি ও উৎপল গেলাম প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাব কেন, বলা যায় দাবি। প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। এতদিন ছিলেন পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য, আজ এলেন অভিনেতা হয়ে।

ভয়ঙ্কর কড়া পরিচালক উৎপল দত্ত। সেও কুঁকড়ে আছে এই বিরাট অভিনেতার কাছে। কি করে ওঁকে আমাদের দলের মধ্যে এক করে ফেলা যায় :এই সমস্যা। প্রম্পটিং নেই। নেই

একমুহূর্তের ভুলের অবকাশ। মেশিনের মত সব যন্ত্রে বাঁধা। প্রতিটি কম্পোজিশন, প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সংলাপের কিউ চলবে ঘড়ির কাঁটায়। এ জায়গায় এই পাগল কখন কি করে বসে। বয়সও হয়েছে, অসুস্থ। এক থলি ওষুধ নিয়ে আসেন একটা কাঁধেঝোলা ব্যাগে। এর থেকে একটা বড়ি, ওর থেকে একটা চ্যবন-প্রাশ। এই চলছে। সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখি। কারণ ওঁর কোনো ত্রুটি তো আমাকেই সবচেয়ে আঘাত দেবে।

রাতের পর রাত জেগে চলে মহড়া। পরিচালকের ক্লান্তি নেই। আমাদেরও নেই একটু অবকাশ। বিজনবাবু আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন? কিন্তু আশ্চর্য, নানা খোশগল্পে, খিস্তির রসিকতায় সবাইর ক্লান্তি আপনোদন করে যাচ্ছেন মানুষটি। উৎপলের উপাধি দিলেন— 'কর্মবীর আলামোহন দাস'। চললো মহড়া। শেষদিন পর্যন্ত ডায়লগ মুখস্ত হতে চায় না ওঁর। আমাদেরই ভাবনা। তার মাঝে নীলিমা গিয়ে তাঁর নিজের ডায়লগ শিখছে বিজনদার কাছে। মালোদের উচ্চারণ আর খাঁটি বিশুদ্ধ কলকাতার ভাষা— আসমান জমিন ফারাক। নীলিমা এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। আছেন বিজনদা। অগতির গতি।

কিন্তু ঐ যে বললাম উনি এক অসহায় মানুষ। ওঁকে কেউ চালালে উনি সচল নৈলে অচল।

একদিনের ঘটনা বলি। পূজোর সময়। 'তিতাস' চলছে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। অষ্টমীর দিন। তু'টো শো হাউস ফুল। আমাদের কয়েকজনের (উৎপল, আমি ও নীলিমার) নেমন্তন্ন ছিল হাওড়ায় আমাদের বন্ধু টকাইবাবুর বাড়িতে। কথা আছে ওখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে সোজা চলে যাবো থিয়েটারে।

এদিকে নীলিমার ওপর ভার রোজ বিজনদাকে থিয়েটারে তুলে নিয়ে যাওয়ার। নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সে তার কর্তব্য বেমালুম হজম করে ফেলেছে। থিয়েটারে যথাসময়ে এসে সব মেকআপ নিয়ে রেডি। হঠাৎ খেয়াল হলো বিজনদা তো এখনো আসেন নি। তখন ফার্স্ট বেল পড়ে গেছে। অর্থাৎ নাটক শুরু হতে ১৫ মি বাকি। কি হবে! সকলের মাথায় হাত। একজন ছুটলো ট্যাক্সি নিয়ে তাঁর বাড়িতে।

উৎপল দরজায় এক লাথি মেরে মেয়েদের দোতলার মেকআপরুমে ঢুকে নীলিমাকে জিজ্ঞাসা করলো, বিজনবাবুকে আনার কি ব্যবস্থা সে করেছে? নীলিমার মুখের সে কি অবর্ণনীয় অবস্থা! ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। কি হবে!

ঠিক হলো ইন্দ্রজিৎ একটা শো করে দেবে। ওর ছিল আশ্চর্য ক্ষমতা। সকলের পাট মুখস্থ থাকতো। কোনরকমে কাজ চালিয়ে দেবেই, সে বিশ্বাস আছে।

এদিকে পুজোর ভীড় ঠেলে বিজনবাবুকে নিয়ে ট্যাক্সি যখন ফিরলো দেখি নির্বিকার মানুষ। কোনো ভাবপরিবর্তন নেই! জিজ্ঞাসা করলাম, আসেন নি কেন? জবাব এল, 'তৈরী হয়ে তো বারান্দায় বসেছিলাম। নীলিমা এলো না, তাই আসি কি করে?' বললাম, 'একটা নির্দিষ্ট সময় দেখে ট্যাক্সি-তে চলে আসতে পারলেন না?' কোনো জবাব নেই। অর্থাৎ সেটা করতে তিনি অপারগ। এমনিই আমাদের বিজনদা। ▭

তাঁর অভিনয় দক্ষতার কোন তুলনা হয় না | গীতা সেন

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে আমারও একসময় কিছু যোগাযোগ ছিল। শুধু যে অভিনয়ই করেছি তা নয়, নানা ভাবে জড়িয়ে ছিলাম গণনাট্য সংঘের আন্দোলনের সঙ্গে, প্রতিদিনের মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে, প্রতিদিনের কাজের মধ্যে, কত ছোটবড়ো ঘটনার ভিতরে গণনাট্যের কতকীই না দেখেছি, দেখেছি গভীর বিশ্বাস, অচঞ্চল আবেগ। কতো মানুষের মত মানুষ দেখেছি, চরম দুর্দশার মধ্যে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় দেখেছি। কি অসীম মানসিক শক্তি ছিল এঁদের। কতো জ্বালা পোড়া মন নিয়ে, কত কিছু সহ্য করে হাজার অভাবকে দুপাশে ঠেকিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি অনেককে। শুধুই আদর্শের জন্য, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে যে-আদর্শের জন্ম। আজ এঁদের অনেকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই, দেখা হয় খুব কম। তবু বলবো যে, একদিন এঁদের ত্যাগ, বিশ্বাস, আদর্শের লড়াই আমার মতো একজন সাধারণ মেয়েকেও টেনে এনেছিলো অভাব, অসুস্থতা, হতাশার জগৎ ভুলে পাঁচজনের সঙ্গে মিশে যেতে। আজ অনেকদিন পর তাই পুরনো দিনের কথা মনে পড়লে স্বভাবতই এঁরা আমার চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়ান— এই বিশেষ মানুষেরা। এবং এই বিশেষ মানুষদের মধ্যে যাঁর ব্যক্তিত্ব আমার কাছে পাহাড় প্রমাণ তাঁর নাম বিজনদা, যখন শুনলাম সেই বিজনদাকে নিয়ে কিছু লিখতে হবে আমাকে, সত্যই প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলাম। কারণ আমি কখনও কিছুই লিখিনি।

কি লিখবো? সামান্য দুচার কথায় সাজিয়ে গুছিয়ে কি করে বিজনদাকে অপরের কাছে তুলে ধরবো? এতো বিরাট যিনি, যিনি অসামান্য ভারী তাঁর ওজন ভাষায় বোঝাবো সে সাধ্য আমার নেই। বিজনদার প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা সে নিতান্ত আমার আপনার। সেকথা বোধ হয় বিজনদাও জানেন না। অপরকে বোঝানো বড়োই কঠিন।

তাঁর নাটকের সমালোচনা করা বা তাঁর লেখার ভালোমন্দ বিচার করার স্পর্দ্ধা বা ক্ষমতা আমার নেই, শুধু এইটুকু বলতে পারি যে তাঁর অভিনয় দক্ষতার কোনো তুলনা হয় না। অপরকে অভিনয় দেখানো বুঝি তারও চেয়ে বেশি।

নিজের চোখে, নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিজনদার প্রতিভার নানা পরিচয় পেয়েছি। তাছাড়া

নানা জনের মুখে শুনেছিও অনেক। টুকরো টাকরা অনেক কথা মনে পড়ে। একটা ঘটনার কথা বলি।

তখন আমি গণনাট্যের কথা, নবান্নর কথা দূর থেকে ভাসা ভাসা শুনেছি, কিন্তু সেই নবান্ন দেখার সুযোগ আমার ঘটেনি।

সেই সময় একটি ছবিতে অভিনয় করার জন্য আমাকে প্রায়ই টালিগঞ্জ পাড়ার স্টুডিওতে যেতে হতো। একদিন স্টুডিওর ফ্লোরে বসে আছি, ক্যামেরাম্যান এবং কর্মীরা সবাই আলো নিয়ে ব্যস্ত, তখনও আমাদের কয়েকজনের নানা গল্পের মধ্যে মলিনা দেবী বললেন, একটা নাটক দেখলাম। দলের নাম জানি না, অসাধারণ। বলতে বলতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

মলিনা দেবী অভিনয় করতে শুরু করে দিলেন— সেই অচেনা অভিনেতার 'অসাধারণ' অভিনয়। সেই অভিনেতাটি ডাক্তারের কাছে দাঁড়িয়ে। ডাক্তার বলছেন, তোমার ব্যথা কোথায়? অভিনেতা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর বলে ওঠেন: ব্যথা এখানে, ব্যথা ওখানে, ব্যথা ঘুরে বেড়ায়, ব্যথা, ব্যথা, ব্যথা………। অভিনেতাকে অনুকরণ করতে গিয়ে মলিনা দেবী শেষ করতে পারলেন না, দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। সেদিন মলিনা দেবীর মুখে ঐ কথা শুনে আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, এই অভিনেতাটি কে? একদিন মৃণাল সেনের সঙ্গে দেখা হতে কথায় কথায় স্টুডিওর ঘটনাটা বললাম। মৃণালবাবুর কাছেই শুনলাম ইনিই হ'চ্ছেন নবান্ন নাটকের 'প্রধান', নাম বিজন ভট্টাচার্য। তখনই আমি নবান্ন না দেখেও নবান্ন-র সবকিছুর সঙ্গেই পরিচিত হই। পরে বিজনদার সঙ্গে আলাপ হতে, এবং বিজনদার অভিনয় দেখে মলিনা দেবীর সেই কথাগুলো আবার মনে পড়লো, বুঝলাম কেন সেদিন মলিনা দেবীর মতো অভিনেত্রীও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

বিজনদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ওঁর লেখা নাটক মরাচাঁদ-কে জড়িয়ে। বিজনদার সঙ্গে আমার প্রথম অভিনয়ও ঐ নাটকেই। যখন শুনলাম অন্ধ পবনের স্ত্রীর চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে হবে এবং বেশির ভাগ অভিনয়ই হবে বিজনদার সঙ্গে এবং তার ওপর আমার শাশুড়ির অভিনয়

ডাক্তার বলছেন, তোমার ব্যথা কোথায়? অভিনেতা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর বলে ওঠেন: ব্যথা এখানে, ব্যথা ওখানে, ব্যথা ঘুরে বেড়ায়, ব্যথা ব্যথা, ব্যথা……

করেছেন শোভাদি, তখন ভয়ে এতোটুকু হয়ে গেলাম। ভাবলাম আমি তো ডুববোই, বিজনদাকেও ডোবাব। বিজনদাকে বললাম, অমি বোধ হয় পারবো না বিজনদা, জবাব দিলেন বিজনদা, সে ভার আমার। এর সঙ্গে সাহস যোগালেন শোভা সেন, তাপস সেন, ঋত্বিক ঘটক, জ্ঞান মজুমদার, মৃণাল সেন। সকলেরই এক কথা : বিজনবাবুর ব্যাপার উনিই বুঝে নেবেন, লেগে যাও।

এরপর প্রতিদিন বেলা বারোটা থেকে রাত প্রায় সাতটা অবধি আমাকে নিয়ে খাটতেন বিজনদা। তারপর শুরু হত সকলের সঙ্গে রিহার্সাল দেওয়া ভালো নাটক করবার জন্য কি প্রচণ্ড খাটতেন তিনি। কেমন সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন চরিত্রের সবটুকু।

আস্তে আস্তে আমার মনের জোর বাড়লো, সাহসী হলাম। হয়তো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বিজনদার পরিশ্রম পণ্ড হ'তে দেব না।

প্রথম শো হয়েছিলো নিউ এম্পায়ার মঞ্চে, বুঝতে পারছিলাম দর্শকের উচ্ছ্বাস। অভিনয়ের শেষে চেনা অচেনা মানুষে ভরে গেল স্টেজ। বিজনদাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সবাই। কেমন শান্ত, নির্লিপ্ত, পবিত্র বিজনদার মুখ, যেন যা আসে আসুক, যা যায় যাক। অন্ধ পবনের চরিত্রে কি অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন বিজনদা। শোভাদিরও তুলনা হয় না। আমিও বোধ হয় খারাপ করিনি। কারণ বিজনদা আমাকে হেসে বলেছিলেন, কি গীতা, তুমি না অভিনয় করবে না বলেছিলে ? বিজনদার কাছে ঐটুকু শোনাতেই আমার চোখে জল এসে গিয়েছিলো। এই নাটকের কথায় আর একজনের কথা সহজেই এসে পড়ে, তিনি তাপস সেন। তাঁর আলোয় এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যাতে আমার মনে হচ্ছিল আমি অভিনয় করছি না।

ঠিক এমনি করেই নীলদর্পণ নাটকে যখন ক্ষেত্রমণির চরিত্র আমাকে দেওয়া হলো তখন অনেকেই বললেন, গীতা পশ্চিম বাংলার মেয়ে, ভাষাটা রপ্ত করা কঠিন হবে। আবার সেই বিজনদা : পারবে না আবার কি ? খাটলেই পারবে। বললেন, সকাল সকাল চলে আসবে।

বারবার টুকরো টুকরো করে ডায়ালগ পড়াতে লাগলেন বিজনদা। যেদিন উনি ব্যস্ত থাকতেন সেদিন ঋত্বিকবাবুর দায়িত্ব ছিল আমাকে তৈরী করার। নীলদর্পণ নাটক হলো, হৈ চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। অনেকের মতো আমারও প্রশংসা জুটলো অনেক। যতটুকু সুনাম পেলাম, তা শুধু বিজনদার জন্য। নীলদর্পণ নাটকে বিজনদার তোরাপ আর কোনদিন কারো অভিনয়ে সেই রূপ পাবে কিনা আমার জানা নেই। সেই অভিনয়, সেকি আমি জীবনে ভুলবো ? নাকি ব্যক্তি জীবনে আপনজন বিজনদাকে কখনো দূরে রাখতে পারবো ?

আমার দেশ উত্তরপাড়া। সেখানে কিছু নাটক পাগল ছেলেমেয়েদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলাম। নানা নাটকের মধ্যে যে নাটকটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল তার নাম জবানবন্দী। বিজনদারই লেখা নাটক। তখন ১৯৫০ সাল। জবানবন্দী নাটকে আমি উদ্বাস্তু বুড়িটির চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। গ্রামে গঞ্জে শহরে মফঃস্বলে যেখানেই এই নাটক আমরা করেছি সেখানেই প্রশংসা পেয়েছি প্রচুর। এর অনেকটাই বিজনদার প্রাপ্য।

আগে বলেছি, আবারও বলছি, বিজনদা আমার জীবনে এক বিশেষ ঘটনা। ▭

স্বাধীনতা লাভের কালে শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে সম্ভবতঃ প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক যা আজ দুর্লভ

অবরোধ | বিজন ভট্টাচার্য

প্রথম অঙ্ক / প্রথম দৃশ্য
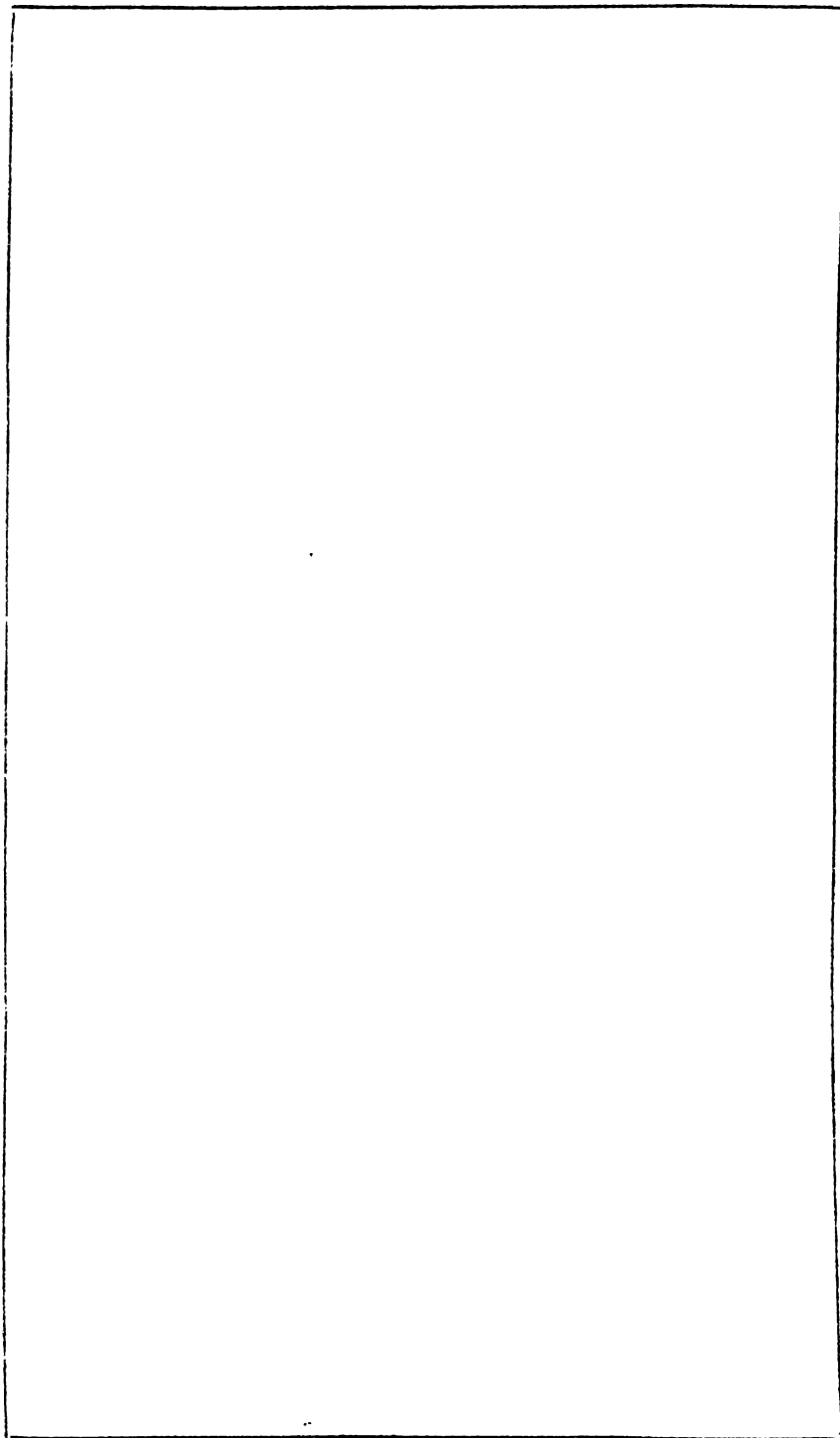
যান্ত্রিক অর্কেস্ট্রার আবহ রণবণিযে উঠল মঞ্চের গহীনে। ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে কাজ চলছে পুরোদমে। ছায়াভিনয় আরম্ভ হয়। দৃশ্যপট অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে কলের চিমনি। চিমনির মুখ দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে বেরুচ্ছে। একটু পরেই দেখা যায় কারখানার ভেতরটা— মেশিন চলেছে, চাকা ঘুরছে। মেশিনম্যান ও মেকানিকরা ইতস্তত চলাফেরা করছে। ঘূর্ণায়মান চাকার আশপাশ দিয়ে ফুলকি উড়ছে আগুনের। পরিশ্রান্ত যন্ত্র থেকে থেকে ধোঁয়া উগরে দিচ্ছে সশব্দে। মেশিনের সঙ্গে তাল ঠুকতে ঠুকতে মানুষগুলোও হাঁপিয়ে উঠছে যেন। সঘন শ্বাস প্রশ্বাসে পাঁজরাগুলো তাদের ফুলে ফুলে উঠছে।

পাশেই দেখা যায় উঁচু একটা জায়গায়, সাহেবী পোশাক পরা উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী কারখানার শ্রমিকদের ওপর খবরদারী করছেন তর্জনী উঁচিয়ে। তিরস্কৃত শ্রমিকরা মেশিনের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের জামার ওপর বড় বড় ইস্পাতের হরফে 'ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ' নামটা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আছে।

একটু পরেই গোটা যান্ত্রিক অর্কেস্ট্রাটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শুধু ঘড়ির কাঁটার আন্দোলনে একঘেয়ে একটা টক্‌টক্ শব্দে বাজতে থাকে। পেছনের আলোগুলো ইতিমধ্যে গুটিয়ে নিয়ে সামনের সমস্ত আলোগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ সেনের আপিসঘর। ফাইল ফোন ও খাতাপত্রে ঠাসা টেবিল সমুখ করে বসে আছেন মিঃ সেন ডেক-চেয়ারে আর কোম্পানীর সব কাগজপত্তর দেখছেন। ডাইনে বামে দরজার পর্দা ঠেলে মাঝে মাঝে ঢুকছেন কোটপ্যাণ্ট পরা উচ্চপদস্থ কর্মচারী, দরকারী কাগজ ও বিল দেখিয়ে সই নিয়ে যাচ্ছেন মালিকের।

মি. সেন : Hullo Miss, I have'nt got the connection yet. No. Cal 32500...thankyou.

বেয়ারার প্রবেশ। ঘাড় নেড়ে স্লিপ অনুমোদন করলে বেয়ারার প্রস্থান।

মিঃ রেবতী ঘোষের প্রবেশ।

কর্মচারী মিঃ ঘোষ এসে মিঃ সেনের হাতে বড় এক সিট কাগজ দিল।

মি. সেন : (কাগজ দেখে) এ quotation cancel করতে হবে immediately, নয়তো order secure করবার কোন সম্ভাবনা নেই।...কী আশ্চর্য...silly! ভাবলে বেশী করে quotation ফেললেই বুঝি কোম্পানীর খুব স্বার্থ দেখা হল। Cancel করে দিতে বলুন এটা immediately. আবার নতুন করে quotation পাঠাতে হবে। এ কে, করেছে কে এটা, নিশ্চয়ই মুখুজ্জো...আচ্ছা, আপনিই বলুন তো যে এটা quotation হয়েছে না তার গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে। Insufferable ব্যাপার ঘটছে সব আপিসে। কী যে সব আপনাদের...

কাগজসহ মিঃ ঘোষের প্রস্থান।

(রিং বাজতেই) Hullo, yes speaking! কে সরকার! আরে ভাই সে এক কাণ্ড...কেন! না না না! হ্যাঁ, তবে কথা হচ্ছে...হ্যাঁ না সে তো ঠিকই...না কক্ষনো না...আরে তাই কি পারে না কি! ...ঐ রকম...কিছু না কিছু না...বলছিল! উঁ... আচ্ছা বলে দেব, আচ্ছা, আচ্ছা। তারপর হ্যাঁ শোন, immediately আমায় সাড়ে চার হাজার piece কম্বল ভাই তোমায় ব্যবস্থা করে দিতে হবে— হ্যাঁ হ্যাঁ any damn stuff হলেই চলবে। কুলীরা বড্ড জ্বালাতন করতে শুরু করেছে। Contract এর কাজ, কুলী ভাগতে আরম্ভ করলে তো ...বুঝতেই পারছ। হ্যাঁ...হ্যাঁ আর শোন, আমার কিছু লণ্ঠন চাই। I mean হ্যারিকেন! Can you manage? কে...তোমার জামাইবাবু...বেশ তো তা হলে তো ভালই হল। ...ঐ সাড়ে চার হাজারের মতই...ও, ও...তাই নাকি! জানতুমই না। যাক ভালই হল। তা আসছো তো আজ, সন্ধ্যাবেলা! আচ্ছা আচ্ছা, সাবিত্রী দেবী!...

চরিত্র পরিচিতি

মিঃ সেন	…	ম্যানেজিং ডিরেক্টর	মঙ্গল মিস্ত্রী	…	দালাল
কবি	…	মিঃ সেনের বন্ধু	গজানন	…	দারোয়ান
রায় বাহাদুর	…	মিঃ সেনের বাবা	মহাবীর	…	সান্ত্রী
মিঃ সরকার	…	মিঃ সেনের বন্ধু	ওসমান	…	শ্রমিক
মিঃ মুখার্জী	…	উচ্চপদস্থ কর্মচারী	কচি	…	,,
রেবতীবাবু	…	ম্যানেজার	নগিন	…	,,
নকড়ি	…	দালাল	গিট্টু	…	,,
ঈশ্বর পণ্ডিত	…	শ্রমিক নেতা	সুচিত্রা	…	মিঃ সেনের স্ত্রী
ঠিকাদার	…		সাবিত্রী	…	কবিপত্নী

আমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ, এজেন্ট, শ্রমিক, দারোয়ান, সশস্ত্র সান্ত্রী ইত্যাদি ইত্যাদি…

কথা তো আছে। হ্যাঁ কবি তো থাকবেই…আচ্ছা আচ্ছা many thanks, চিয়ারিও।

রিং বাজতেই বেয়ারার প্রবেশ।

বোল লেয়াও

বেয়ারার প্রস্থান এবং নকড়ির প্রবেশ।

মি. সেন : এই যে নকড়ি, বসো। ত্যাখ অজ্ঞাত কুলশীল ঐ সব বাজে পার্টি…

নকড়ি : না সে আপনি আর তার কি বলবেন মানে…

মিঃ সেন : না না কথাটা বলতে দাও আমায়।

নকড়ি : না তা সে আপনি বলুন, বলুন।

মি. সেন : তোমার ধারণা যে তুমি খুব একটা চালাক লোক, কেমন।

নকড়ি : না মানে কথা…

মি. সেন : মানে কথাটথা না, তুমি নিজেকে তাই ভাব। ভাব না! …যা হোক শোন।

নকড়ি : বলুন, বলুন।

মি. সেন : ঐ সব অচেনা অজানা পার্টির সঙ্গে খবরদার আর কখনও কোন রকম transaction করতে যেও না। দেখ, তুমি বেশী দালালি মার, that I don't grudge, কিন্তু ব্যবসাটা তো বাঁচিয়ে চলতে হবে। সামান্য তিন টন নারকেল তেলের transaction করতে গিয়ে তুমি যে দেখছি কোম্পানী ফাঁসিয়ে দেবে। গবর্নমেন্ট কি ঘাস খায়! তোমাকে তো জেলে যেতেই হবে, মায় কর্তাকে ধরে টানাটানি করবে। খবরদার ঐ ধরণের লোক আর এনো না। কী কাণ্ড! …হ্যাঁ, আর শোন, গ্লিসারিন আর ব্লিচিং পাউডার…পাঁচ, পাঁচ টন,— মালটা আমি তোমার কাছেই বিক্রী করতে চাই। তারপর তুমি সে কাকে দেবে কি করবে, সে তুমি বুঝে দেখবে। …মালটা একটু দূরে আছে জানলে, সেখানে স্থানীয় কোন party পাও তো ভাল, আর টানা হেঁচড়া যদি একান্ত করতেই হয় তো freight-চার্জ বাবদ, জানবে এ শুধু তোমার খাতিরেই, কিছু টাকা আমি ছাড় দিয়ে নিতেও রাজী আছি। But I must get the money immediately. এখন বল, নিতে পারবে তুমি মালটা?

নকড়ি : এক্ষুনি নেব। বাবা, দেব-দুর্লভ ধন— বাজার একেবারে গরম হয়ে আছে।

মি. সেন : রিসিট টিসিট কিন্তু কিছু দিতে পারব না।

নকড়ি : কিচ্ছু দরকার নেই, …ও সে আপনি মুখে বলেছেন এই যথেষ্ট।

মি. সেন : টাকা কিন্তু আমার আগাম চাই।

নকড়ি : এখন বলেন তো এখুনই দিই।

মি. সেন : না এখন মানে, তোমাকে বলে রাখলুম আগে থেকে, কর্তার সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে হবে তো। তবে সে কিছু না, একবারটি শুধু বলে নেয়া।

নকড়ি : তা আমি আসব কখন?— ফাইনাল একটা তো কিছু হল না।

রিং বেজে উঠল।

মি. সেন : হ্যাঁ, তুমি আসবে, just a minute,... Hullo, yes speaking...না, তিনি এখনও আসেন নি।....ঠিক বলতে পারি না। তবে চারটে নাগাদ আপনি একবার রিং করতে পারেন।...না, আজকাল একটু কমই আসেন। আছেন, ভালই আছেন। আচ্ছা, আচ্ছা নমস্কার। (ফোন রেখে) হ্যাঁ তা হলে তুমি আসবে...এই সাড়ে চারটে নাগাদ একবার এস। কর্তার সঙ্গে ইতিমধ্যে একটু কথা কয়ে রাখি।

নকড়ি : সাড়ে চারটে, আচ্ছা।...সন্ধ্যের পর বাড়ীতে সময় হয় না!

মি. সেন : সন্ধ্যের পর বাড়ীতে...

নকড়ি : আচ্ছা আমি সাড়ে চারটে নাগাদই আসবোখন।

মি. সেন : হ্যাঁ সন্ধ্যের পর আবার— তুমি সাড়ে চারটে নাগাদই এস। Positively.

নকড়ি : Positively.

নকড়ির প্রস্থান ও গোপালের প্রবেশ।
গোপাল দাশগুপ্ত মি: সেনের সহপাঠি বন্ধু। পরনে খদ্দর, বগলে ব্যাগ— দেশী বিদেশী পাবলিকেশন-এ ঠাসা।

মি. সেন : (ভাল করে আগন্তুককে দেখে কৌতুকভরে হেসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে) বলছি বলছি··· তুমি,— তোমার নাম— আচ্ছা দাঁড়াও— তোমার নাম হৃষিকেশ, না?

গোপাল : আজ্ঞে না; আমার নাম গোপাল। গোপাল দাশগুপ্ত।

মি. সেন : গোপাল গোপাল। আমি হৃষিকেশ বলছি। যা হোক ঐ এক কথাই হল। বসো···

গোপাল : হ্যাঁ হৃষিকেশও আমাদের সঙ্গে পড়ত। ঐ এক সঙ্গেই আমরা ঘুরতাম টুরতাম!

মি. সেন : জানি জানি, চিনেছি আমি তোমায় ঠিকই তবে, ···দেখ কত বচ্ছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

গোপাল : না খুব বেশী দিন আর কি এমন! তবে তোমার পক্ষে এখন ভুলে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক··· মস্ত বড় লোক হয়ে গেছ এখন···দেশেরই বড় বড় নেতাদের সঙ্গে খবরের কাগজে ছবি বেরুচ্ছে!

মি. সেন : কি রকম!

গোপাল : হ্যাঁ দেখলুম দিশি কাগজগুলো সব সেদিন বেশ ফলাও করে ছেপেছে। একেবারে পাশাপাশি কাঁধে হাত দিয়ে···

মি. সেন : কেন, তোমার ভাল লাগেনি?

গোপাল : আরে ছি সেই কথাই তো বলছি, গর্বের কথা, খারাপ লাগবে তুমি বলছো কি হে! ক জনের সে সৌভাগ্য হয়! টাকা তো অনেকেরই আছে!

মি. সেন : You did like it then!

গোপাল : Of course, সেই দেখেই তো এলাম।— কত বড়লোক হয়ে গেছ আজকাল···

মি. সেন : কত বড়লোক না; —যাক্‌গে তারপর আছ কেমন? কলকাতাতেই থাক, না আর কোথাও···

গোপাল : না এখানেই আছি।

মি. সেন : কোথায়?

গোপাল : সেই মসজিদবাড়ী স্ট্রীট, পিসিমার বাড়ী। মনে পড়ে তোমার পিসিমার কথা?— সেই ফরাসের ওপর বসে আম-তেল দিয়ে মুড়ি খাওয়া—

মি. সেন : আম-তেল দিয়ে মুড়ি খাওয়া?...বহুদিনের কথা হয়ে গেল কিন্তু...

গোপাল : না বহুদিন আর এমন কি, এই তো বছর তিন-চারেকের কথা।— আচ্ছা কমলার কথা মনে পড়ে? পিসিমার মেয়ে কমলা! উচ্ছ্বাসের মাথায় যাকে একদিন তুমি বলেছিলে ভালবাসি। মনে পড়ে?

মি. সেন : ভালবাসি! আমি বলেছিলাম?

অবরোধ / বিজন ভট্টাচার্য। প্রকাশকাল : প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৫৪। প্রকাশক : সুনীলকুমার সিংহ, ইন্টার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। মুদ্রাকর : সুধাংশুরঞ্জন সেন, ট্রুথ প্রেস, ৩ নন্দন রোড, কলিকাতা। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : সূর্য রায়। ব্লক মুদ্রণ : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী। প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও। বাঁধাই : বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্, কলিকাতা। দাম : দু টাকা আট আনা। উৎসর্গ পত্র : বজ্রমুঠ কে।

গোপাল : জানি না এখন কি বলেছিলে তুমি তাকে। সে কিন্তু বিশ্বাস করেছিল। অনেক দিন অনেক ছলে সে আমায় তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছে— কোথায় থাকে, কি করে,— একবারটি দেখা হয় না হেমেনদার সঙ্গে ইত্যাদি— মেয়েদের যা হয় আর কি? যাক্‌গে সে সব কথা তোমার হয়ত আজ মনেও নেই। তা সম্প্রতি বিয়ে হয়ে গেল কমলার। সে কিছুতেই করবে না, শেষকালে আমিই একরকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে...

মি. সেন : হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে, মনে পড়েছে,— কমলা, কমলা...that কমলা...

গোপাল : মনে পড়েছে! ...ভাল, আমি তো ভাবতেই পারছিলাম না যে এতক্ষণ তুমি ভুলেছিলে কি করে? যা হোক—

মি. সেন : না দেখ মানে কম দিনের কথা হল নাতো! আর কতদিন out of touch।

গোপাল : যত দিনেরই কথা হোক, দেখ হেমেন— (সমঝে গিয়ে) কি বলছি!

মি. সেন : কি হল!

গোপাল : না মানে— তোমার সময় নষ্ট করছিনা তো?

মি. সেন : আরে কিছু না কিছু না! কি আশ্চর্য। এতদিন পরে এলে। চা খাও?

গোপাল : তা খাই।

মি. সেন : খাও।

কলিং বেল টিপলো। বেয়ারার প্রবেশ।

একপট চা দিয়ে যেতে বল।

বেয়ারার প্রস্থান।

সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট নিয়ে কেসটা গোপালের সামনে খুলে ধরল।

হুঁ তারপর!

জনৈক অফিসার উঁকি দেন। হাতে কতকগুলো বিল।

কে! কি, আসুন না!

অফিসার : এই কতকগুলো বিল পাশ করাবার ছিল!

মি. সেন : দেখি (বিলগুলো দেখে) আচ্ছা যান আপনি, আমি sign করে পাঠিয়ে দিচ্ছি— এ সবগুলো কি আজকেই পাশ করতে হবে? এটা?... Malcolm কোম্পানীর বিলটা? তারপর গুপ্তদত্ত? আর পাটকেলওয়ালা খাণ্ডেলওয়ালা কোম্পানীর বিলগুলো? রেবতীবাবু কি বললেন, পাশ করতে হবে?

অফিসার : উনি তো আপনার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন।

মি. সেন : আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আচ্ছা আমি রেবতীবাবুর সঙ্গে কথা কইছি।...আপনি যান আমি পাঠিয়ে দেবখন।

অফিসারের প্রস্থান।

বিলগুলো ভালো করে দেখে নম্বর টিপে ঘুরিয়ে ফোন তুললেন।

রেবতীবাবু! যে বিলগুলো পাঠিয়েছেন তার সবগুলোই কি আজ পাশ করতে হবে, না, হ্যাঁ, due over হয়ে গেছে! (হাত ঘড়ি দেখে) না আজ

তো ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে! ও— ও, আচ্ছা, Malcolm কোম্পানীর বিলটা আমি পাশ করে দিচ্ছি, কিন্তু গুপ্তদত্তকে আপনি বলে দেবেন যে অত prompt আমরা আর হতে পারব না। They must wait more. আর খাপেুলওয়ালা? এটাও দিতে বলেছেন! ও, উ উ, I know, বলেছেন? আচ্ছা এবারটা দিয়ে দিন তা হলে?...আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি (ফোন রেখে sign করতে করতে) তারপর গোপাল, চুপ করে রইলে, বলো কিছু, কি হে?

কলিং বেল বাজাতেই বেয়ারার প্রবেশ।

Accounts.

বেয়ারার প্রস্থান।

গোপাল : Certainly I am disturbing you.

মি. সেন : কিছু না কিছু না। কী আশ্চর্য? আরে এরকম ব্যস্ত আমায় থাকতেই হয়।

গোপাল : খুব কাজ, না?

মিঃ সেন : হ্যাঁ তা কাজ তো করতেই হয়।—কাজ না করলে...তা যাকগে এইবার তোমার কথা বল।

গোপাল : আমার কথা মানে— সংক্ষেপেই বলছি।

মি. সেন : বেশ।

গোপাল : জান না নিশ্চয়ই, আমি বইয়ের business করছি— mostly foreign publications, অবিশ্যি আরম্ভ করেছি এই কিছুদিন হল...

মিঃ সেন : আচ্ছা?

গোপাল : Modern foreign literature, I mean fiction বলতে যা কিছু, তারপর তোমার books on criticism, up-to-date anthology, এ ছাড়া works of great literateurs— Shelly, Keats, Byron, Shakespear, Ibsen, Shaw তারপর Politics, Sociology, Popular Science, Economics ও Historyর ওপরেও আধুনিক নামকরা লেখকদের ভাল ভাল বই আমি রাখি।

মি. সেন : বটে?

গোপাল : দেখ না catalogue খানা, দেখলেই বুঝতে পারবে।

মি. সেন : (বইটা হাতে নিয়ে) That's all right কিন্তু what do you want me to do?

গোপাল : Well, you can choose for yourself, দেশের সব গণ্যমান্য নেতাদের সঙ্গে মিশছ, নিশ্চয়ই অনেক up-to-date information রাখতে হয় তোমাদের। You will need them.

মি. সেন : বই অবিশ্যি দেখলেই কেনবার সখ হয়। কিন্তু ভাই already যা কিনে ফেলেছি তাই তো পড়ে উঠতে পারছি না।

গোপাল : আজ না পড় দুদিন পরে পড়বে। বই যাদের কেনা regular অভ্যেস তারা আর পড়ে উঠতে পারে সত্যিকারের কখানা বই বলো? Mostly যে আন্দাজে কেনে লোকে বই, পড়ে তার চাইতে ঢের কম, এ তোমার হয়ই।

মি. সেন : দূর, এত পড়বার আমার এখন সময় কোথায়?

গোপাল : আহা পড়তে তো তোমাদের হয়ই, পড়বে, পরে পড়বে।

মি. সেন : আর তা ছাড়া I have a heap of such stuff in my study, actually বাড়ীতে বই রাখবারই আমার আর জায়গা নেই, believe me আর তারপর শুধু শুধু কিনেই বা করবো কি বলো? পড়তে তো আর পারবো না?

গোপাল : কেন?

মি. সেন : সময় কোথায় ভাই, মোটে সময় পাইনা। ...অবিশ্যি তুমি এসেছ, I must not dishearten you, তবে তোমাকে ভাই একটা অনুরোধ করব।

গোপাল : কি রকম?

মি. সেন : Of course you must not mind for taking that trouble.

গোপাল : না mind মানে কি বলছ আমি একদম বুঝতে পারছি না।

মি. সেন : বলছি, আচ্ছা কম পক্ষে কত টাকার বই আমি কিনব তুমি expect করে এসেছ, বলো।

গোপাল : Expect মানে…

মি. সেন : না মোটামুটি একটা ভেবে এসেছ তো তুমি, যে এই বইগুলো হেমেনকে গছাতে হবে। বলো না, frankly বলো না!

গোপাল : সে তুমি যেমন select করবে তেমনি তার…

মি. সেন : আরে দুত্তোর কলা নিকুচি করেছে তোমার selection-এর, সময় কোথায় বললুম না তোমায়?

গোপাল : তা হলে—

মি. সেন : তা হলে এসেছ যখন ম্যাদ্দিন পর তখন শুধু হাতে নিশ্চয়ই আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব না। (চেক কেটে) এই নাও,—খুশী তো?

গোপাল : তুমি আমায় অপমান করছ হেমেন।

মি. সেন : আরে কী আশ্চর্য!

গোপাল : আমি তো তোমার কাছে সাহায্য চাইতে আসিনি।

মি. সেন : কী মুশকিল, সাহায্য বলে কি আমিই তোমায় টাকা দিচ্ছি।…বেশতো, বই দেবে তো আমার নাম করে তুমি যে কোন একটা Public Library-তে দুশো টাকার বই দিয়ে দিও। হলো তো?

গোপাল : থাক ভাই, যথেষ্ট হয়েছে। আমার ভুল হয়েছে তোমার কাছে বই বিক্রী করতে আসা।

মি. সেন : তুমি আমায় ভুল বুঝছ গোপাল।

গোপাল : ভুল বুঝছি; না। সবাই তোমায় ভুলই বুঝে গেল। চমৎকার যুক্তি!

মি. সেন : মেয়েদের মতো অভিমান করে বেশতো কথা বলতে পার তুমি গোপাল!

গোপাল : হেমেন!

মি. সেন : চেকটা না নিয়ে খুব ভুল করলে গোপাল!

গোপাল : তোমার চেক,—

মি. সেন : খুব রাগ হচ্ছে, না। হুঁ…ঐ রকম হয়। চেক যারা কাটে, তাদের ওপর চেক যারা কাটতে পারে না— তাদের খুব রাগ।…দূর তুমি দেখছি কিচ্ছু শেখনি। বই বুঝি শুধু বেচই, পড় না একখানাও।

গোপাল : সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেবো না।

মি. সেন : মিথ্যে ঐ দেমাকটুকু না থাকলে বাঁচবে কিসের জোরে। I appreciate your indignation Gopal.

গোপাল : আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

মি. সেন : Oh, so kind of you.

গোপাল : তুমি যে এতটা ইতর…

মি. সেন : চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না! ঐ রকম হয়, কিন্তু দাঁত কটাই যে ভাই তোমার ভেঙে যাবে কড়মড়িয়ে।

গোপাল : থাক আর বাক্-বৈদগ্ধ্য দেখাতে হবে না তোমায়। তোমার মত…

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ায় মি. সেন। চেকটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে। গোপালের প্রস্থান। সিগারেট ধরিয়ে একটু ঝিম হয়ে বসে থেকে নম্বর ঘুরিয়ে ফোন তোলে মি: সেন।

Accounts, রেবতীবাবু। শুনুন, নকড়ির টাকাটা আপনি Loan Accounts-এ জমা করে নেবেন as usual, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ—হ্যাঁ—কত? ত্রিশ হাজার? হ্যাঁ, ম্যানোয়ারী ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন,… আচ্ছা thats all right then, আচ্ছা…আচ্ছা।

সাহেবী পোষাক পরা জনৈক এজেন্টের প্রবেশ। হাতে পোর্ট ফোলিও

মি. সেন : এই যে, আসুন, বসুন।

এজেন্ট : ভাল আছেন?

মি. সেন : এই, তারপর বম্বে থেকে ফিরলেন কবে?

এজেন্ট : পরশু। আবার দিল্লী যেতে হল।

মি. সেন : আবার দিল্লী কেন?

এজেন্ট : গোলমাল তো এখনও মেটেনি।

মি. সেন : এখনও চলছে গোলমাল?

এজেন্ট : এবারে মিটবে মনে হয় Deputy Director of Taxation Office-এ খুব তো একচোট হৈ চৈ করে এলাম। আশা করি হয়ে যাবে এবার।… আর সব হয়েছে গদাই লস্করি ব্যাপার।

মি. সেন : তা যা বলেছেন।

এজেন্ট : (কতগুলো টাইপ করা ও ছাপা কাগজ এগিয়ে দিল) দেখেছেন নাকি ?

মি. সেন : কি ব্যাপার...(কাগজগুলো দেখে) এ তো আমি নিইছি already...

এজেন্ট : নিয়েছেন! বেশ ভাল···একেবারে নতুন স্কীম।

মি. সেন : হ্যাঁ, আর experiment না করলে চলবে কি করে এখন। ঐ জন্যেই তো নিলুম। তা সন্ন্যাবাবু আবার এখন আমায় ডিরেক্টরস বোর্ডে যেতে বলছেন...ঐটেই আমার ইচ্ছে নেই।

এজেন্ট : কেন, ঢুকে পড়ুন না। আপনারা না ঢুকলে···

মি. সেন : বুঝি, কিন্তু সময় করে উঠতে পারব কি ? আপনি তো জানেন নামকাওয়াস্তে আমি ডিরেক্টরস বোর্ডে থাকতে পারব না, থাকলে ভীষণ হৈ চৈ করবো। এখন এদিক ওদিক সব সামলে আবার নতুন একটা ব্যাপারে মাথা গলাব— পেরে উঠবো কি ? সেই কথাই ভাবছি।

এজেন্ট : ও খুব পারবেন, খুব হবে। তেমন একটা কিছু না করতে পারেন, অন্তত মিটিঙগুলো attend করলেও তো জিনিষটা হাতে থাকে ; নয়তো সব যে ভাটিয়া পার্শী আর সিন্ধীদের হাতে চলে গেল ; বুঝতে পারছেন না ?

মি. সেন : তা ঠিক। আচ্ছা দেখি কি করি, এখনও ঠিক করে বলতে পারি না কিছু।

এজেন্ট : (উঠে পড়ে) ঢুকুন ঢুকুন। আপনারা পাঁচজন ঢুকলে দেশেরও একটা ভবিষ্যৎ থাকে...

মি. সেন : আপনি উঠছেন ?

এজেন্ট : হ্যাঁ, একটু ঘোরাঘুরি আছে। ঐ জন্যেই এসেছিলাম। ভাবছিলাম...তা already নিয়ে ফেলেছেন, বেশ ভালই করেছেন।

মি. সেন : হ্যাঁ নিলুম।

এজেন্ট : না, ভাল কাজ করেছেন...দর দেখেছেন এর মধ্যেই ?

মি. সেন : বেশ ভাল দর উঠছে।

এজেন্ট : আচ্ছা...

মি. সেন : আচ্ছা...তারপর চুনের খবর কি ? আপনার চুন ?

এজেন্ট : চুন...নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন।

মি. সেন : Fifty two, I mean fifty two, two.

এজেন্ট : আজকের দর ?

মি. সেন : আজকের দর।

এজেন্ট : একটু একটু করে আবার উঠতে আরম্ভ করেছে।

মি. সেন : হ্যাঁ তা উঠছে। কিন্তু সে আপনার কোথায় সেভেনটি টু আর কোথায় ফিফটি টু—heaven and hell difference.

এজেন্ট : হ্যাঁ, সে দর উঠতে আপনার এখন...সন্ন্যাবাবু তো হাত কামড়াচ্ছেন।

মি. সেন : তা কামড়াতেই পারেন। তবু বাঙালী brain, তাই এখনও চুপচাপ আছেন। পাটকেল-ওয়ালা তো হন্যে শ্যালের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে শহর ময়। এসেছিল কাল আমার এখানে...বলে কিনা বাবুজী আপসব লে লিজিয়ে...বুঝুন কাণ্ড, হুঁ, আর সন্ন্যাবাবু তো...বহুৎ জবরদস্ত লোক বলতে হবে সন্ন্যাবাবু।

এজেন্ট : ও: বহুৎ খুব ! ...আচ্ছা চলি—

মি. সেন : আচ্ছা ভাই—

এজেন্টের প্রস্থান।

বন্ধু মি: সরকারের প্রবেশ। পরনে সুট— ফর্সা নাদুস নুদুস চেহারা— চোখে রিমলেশ।

মি. সেন : এই যে, এস এস, বস ! তারপর সরকার সাব...খবর কি বল !

সিগারেট কেস খুলে ধরে।

সরকার : আরে খবর তো সব তোমাদের। আমার আর খবর কি ?

মি. সেন : কি রকম ?

সরকার : (সুর ভাঁজে) ই-রি-রি-রি-রি। সাবিত্রী দেবী আসবেন না ?

মি. সেন : উঃ খুব ঘেঁ...

সরকার : কেন ?

মি. সেন : (ফোন তুলে) দেখি, একবার ring করি। দেরী করে কেন বুঝতে পারি না।

সরকার : ছটা তো বাজল।

মি. সেন : হ্যাঁ, এসে তো,...PK. 30990 please ! Thank you ! এর ভেতরে তো এসে যাওয়া উচিত। বাড়ীতে আবার ring করা মানে, বুঝতেই পাচ্ছ— সুচিত্রার সঙ্গে একবার কথা বলে নিতেই হবে।... Hullo, yes...কে সুচিত্রা, তারপর...কে আমি, কটার মধ্যে যাচ্ছ...সাতটা, না তা হলে তুমি একাই যাও। আমি, আমার পক্ষে সাতটার মধ্যে manage করা অসম্ভব ! বুঝলাম, কিন্তু সুচিত্রা !— শোন, কবিকে একবার ডেকে দিও তো... সরকারকে বললাম, বাপের বাড়ী যাচ্ছেন, এখন চল আর কি সঙ্গে সঙ্গে। Insufferable ব্যাপার সব।

সরকার : তা কি, বিয়ে করা বউ বলতেই পারে।

মি. সেন : বলতেই পারে !

সরকার : তবে ! আর তারপর সবে Rangoon থেকে ফিরেছে, এখন তো হবেই একটু বাপের বাড়ী মুখো...

মি. সেন : না, তা হোক, বাপের বাড়ীই যাক, আর যে চুলোয়ই যাক— আমায় নিয়ে টানাটানি কেন !... Hullo, কে কবি ! বাঃ ! বাজলো কটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি !...কে, সাবিত্রী দেবী...তুমি বল সাবিত্রী দেবীকে। পৌনে ছটায় মধ্যে তোমাদের এখানে আসবার কথা নয় !....কি, গাড়ী, সুচিত্রা তো সাতটা নাগাদ যাবে শুনলুম। হ্যাঁ, ও হ্যাঁ, তা বেশ তো...শোন, যদি অসুবিধে বোঝ তো I can send you my car, কি ! দরকার হবেনা ! Any way try to come immediately. We are waiting for you, কি, সে এসে দেখবে...আছেন, অনেকেই আছেন...চটপট এস, কেমন ! (ফোন রেখে দেয়) বেচারা, ঐ স্ত্রীকে manage করা কি কবির মতো লোকের সাধ্যি।

সরকার : স্ত্রী মাত্রেই, I mean স্ত্রীলোক, দেখবে unmanagable. This is the conscientious report that I have ever gathered from persons who have been married upto June, 1947. আমার অবিশ্যি ব্যক্তিগত কোন experience নেই।

মিঃ সেন : বেঁচে গেছ ভাই। বেঁচে গেছ।

সরকার : ওঃ, বলে···

মিঃ সেন কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল।

গ্রন্থ প্রসঙ্গ : প্রথম প্রকাশ পরিচয়-এ ধারাবাহিক। অভিনীত এই প্রথম প্রকাশিত সংস্করণটি দুষ্প্রাপ্য। ন্যাশনাল লাইব্রেরী সংগ্রহ নং B/891. 442/Bh 5458 av 1 Acc No. 19940 dt. 11.3.68 এ। বইটি ইস্যু হয়েছে মোট ৯ বার, বর্তমান নকলনবিশকে নিয়ে ১০ বার। ২৮ অক্টো, ১৯৭০ ; ১ সেপ্টে, ১৯৭১ ; ৭ জুন, ১৯৭৩ ; ৫ মার্চ, ১৯৭৪ ; ৮ এপ্রিল, ১৯৭৪ ; ২৫ এপ্রিল, ১৯৭৪ ; ৫ জুন, ১৯৭৪ ; ১৩ আগষ্ট, ১৯৭৪ ; ১১ অক্টো, ১৯৭৪ এবং আজ আগষ্ট, ১৯৭৭। বইটি আকারে ডবল ক্রাউন ১/১৬। বোর্ড বাঁধাই।

৮+১২৩ মোট ১৩১।

মি. সেন : দো গিলাস দাও।

গ্লাস ও বিয়ারের বোতল রেখে গেল। মি: সেন নিজের ও সরকারের গ্লাসে ঢেলে নিলেন।

সরকার : কবি কিন্তু যাই বল husband হিসেবে একটা failure,··· they are so unlike in nature. বিয়েটা কি প্রেমিক ?

মি. সেন : শুনি তো ! তবে এখন সে প্রেম ফ্রেম সব উবে গেছে। আর তাছাড়া কবি হচ্ছে এক ঢঙের মানুষ— essentially a poet— ও:, রেঙ্গুনে যখন প্রথম দেখা হয়···

সরকার : রেঙ্গুনেই বুঝি প্রথম পরিচয় তোমার সঙ্গে ?

মি. সেন : আরে না, কবি হচ্ছে আমার কলেজ লাইফের বন্ধু, একসঙ্গে পড়তাম আমরা। সে আজ পনের বছর আগেকার কথা। তারপর যে যার মত ছিটকে পড়ি, দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এই পনের বছরের মধ্যে। হ্যাঁ, তবে কার মুখে যেন শুনেছিলাম কবি ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেতে গেছে— একখানা চিঠিও বুঝি লিখেছিল বিলেত থেকে— সাত আট বছর আগেকার কথা, ভাল করে আমার এখন মনেও নেই— এই, তারপর কেউ কারো হদিস রাখিনি। Practically we totally forgot each other ···বুঝলে, তারপর হঠাৎ তোমার 'forty one'-এর November-এ রেঙ্গুনে। রাত্তির দুটোর সময় হঠাৎ একদিন আমার চাকরটা ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললে, একজন বাঙালীবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আমি তো শুনে বেশ একটু আশ্চর্যই হলুম। রাত দুটোর সময় বাঙালীবাবু ডাকাত টাকাত নয়তো ! এদিকে কৌতূহলেরও অন্ত নেই। যাই হোক, বাঙালীবাবুর কথা শুনে পরিণাম না ভেবেই আমি তো ডেকে নিয়ে আসতে বললুম ভেতরে— কে আর ওঠে শীতের মধ্যে।— অপেক্ষা করছি, এখন একটু পরেই দেখি স্যুট পরা এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত, সঙ্গে অনিন্দ্যসুন্দরী একটি স্ত্রীলোক— I mean this Savitri— She was looking so exquisite then. লোকটা বললে আমি আরাকান যাচ্ছি— তা মেয়েটিকে আপনার কাছে রেখে যেতে চাই— এখানে তো বাঙালী এখন তেমন নেই, আর তা ছাড়া হাজার খানেক টাকা আমায় আপনি দেবেন এক্ষুনি— She will pay you back next week. And this in one breath— হুড় হুড় করে বলে গেলো লোকটা। শুনে আমি তো একটু ঘাবড়েই গেলুম, এ আবার কী নতুন ফ্যাসাদে পড়লুম রে বাবা— blackmail করছে নাতো ! মেয়েটা থাকবে, আবার হাজার খানেক টাকা ধার— সমস্ত জিনিসটাই খুব conspiring মনে হতে লাগলো আমার কাছে।—কি করি ?—উঠলুম, বললুম, বড্ড শীত, আগে একটু কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন — এখনি তো আর আপনি আরাকান যাচ্ছেন না ! এই, এখন কফির নাম শুনতেই মেয়েটা দেখি খুশীতে টগবগিয়ে উঠলো— বলল you can give us something to eat also, we are hungry— ছেলেটা মেয়েটার কথায় ঠিক ক্ষুণ্ণ হলো কিনা বুঝতে পারলুম না। বললুম, তা বেশ তো, এর জন্যে আর···এতক্ষণে লোকটাকে আমার faintly চেনা চেনা মনে হতে লাগলো। ভাবতে লাগলুম, কোথায় যেন দেখে থাকতে পারি লোকটাকে।

সরকার : পাঠ্য জীবনের অত সৌহার্দ্য সত্ত্বেও মনেই এল না তোমার লোকটাকে ?

মি. সেন : কি করে হবে, এক গাল দাঁড়ি গোঁফ— sea-pirate-দের মত চোস্ত চেহারা— তারপর কতদিন কেটেছে, এখন 'সেই'ই কবি যে এই কবি— এ একেবারে অসম্ভব কল্পনা করা— কথাবার্তা, চালচলন সবই তো বদ্‌লে গেছে কিনা ?

সরকার : Any way, তারপর।

মি. সেন : তারপর খাওয়া দাওয়ার পর ওদের তো বিশ্রামের বন্দোবস্ত করে দিলাম। রাত্তিরে আর বিশেষ কোন কথাবার্তাই হল না। পরদিন···সকাল বেলা চায়ের টেবিলে...কথায় কথায় সব কথা উঠে পড়ল— চেনা পরিচয় সবই হল— জানলাম কবি

বিয়ে করেছে মেয়েটিকে— Burma domiciled Hindu Bengali girl, fairly educated সিঙ্গাপুরে বাপের কাঠের কারবার ছিল— কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে পারেন নি বলে— They have been the victims of Scorched Earth Policy. আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায়নি তাদের সেই থেকে। কবি তখন সিঙ্গাপুরে— মেয়েটিকে কোনমতে উদ্ধার করে রেঙ্গুনে নিয়ে আসে। Then the story gets an easy run— they loved and lived.

সরকার : এখনও কি সম্বন্ধটা তেমনি sacred আছে?

মি. সেন : Oh yes, they are husband and wife.

সরকার : Minus the love between them.

মি. সেন : How do you know that?

সরকার : আরে বাবা, যাকগে...any way, Savitri is fine. আচ্ছা— সেদিন টাকা নেওয়াটা কি অন্যায় হয়েছে আমার পক্ষে।

মি. সেন : না, টাকা ধার দিয়েছিলে, টাকা ফেরৎ নেবে— এর ভেতরে অন্যায়টা কি আছে। ...অবিশ্যি ওদের অবস্থা এখন খুবই খারাপ...practically I had to pay for her.

সরকার : তাই নাকি! কৈ বলনি তো তুমি একথা আমায়!

মি. সেন : আমার কি বলবার থাকতে পারে।

সরকার : ছি ছি ছি ছি, আগে জানলে চাইতাম না আমি টাকা সাবিত্রী দেবীর কাছে।

মি. সেন : যাগগে যা হয়েছে হয়েছে— এই নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করো না— জিনিসটা মোটেই ভালো দেখায় না—

সরকার : না সত্যি, সেদিন যেমন টাকাগুলো টিপে টিপে গুণে দিলেন সাবিত্রী দেবী আমাকে...আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম!

মি. সেন : যা করেছ ভালই করেছ। সাবিত্রীকে obliged করবার আরও খানিকটা scope দিলে তুমি আমায়।

পৃথিবীর মানুষ আজ এক অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ শ্রেণীবিন্যাসে চিহ্নিত। আমাদের সমাজেও সেই শ্রেণীবিন্যাস তেমনি নির্মম ও ধারালো। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিতান্ত সাধারণ ও অনাড়ম্বর মানুষ কি করে আজকের জটিল ও বিচিত্র শিবিরে ভাগ হয়ে গেল সে এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বর্তমান উত্তরাধিকারীদের সংঘাত ও সংঘর্ষই 'অবরোধ'-এর মূল উপজীব্য। কামারের হাতুড়ির

শেষ প্রচ্ছদে প্রকাশক কর্তৃক গ্রন্থ পরিচিতি

আঘাতে নেহাই-এর গা বেয়ে একেকটা স্ফুলিঙ্গ মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু লোহার জ্বলন্ত পিণ্ড গড়ে পিটে হয়ে ওঠে ক্ষুরধার অস্ত্র— ইস্পাতের মত কঠিন। ইতিহাসের রক্তাক্ত পথেও তার ব্যতিক্রম নেই। মানুষের সমাজের পরগাছারাও জনসাধারণের পদক্ষেপের আঘাতে স্ফুলিঙ্গের মতই ক্ষীণায়ু ও ক্ষণজীবী। তাই 'অবরোধ'-এর প্রবল পরাক্রান্ত মিলমালিক জনশক্তির কাছে অসহায়ভাবে বন্দী, নিষ্করুণভাবে অবরুদ্ধ। ঘরে-বাইরে নতুনের পদধ্বনি। নতুন মানুষ আসছে, এসেছে।

সরকার : আর আমার সম্পর্কে সাবিত্রী দেবী কি ভাবলেন বলতো !

মি. সেন : যাই ভাবুন না কেন—you have got back the money you love.

সরকার : মানে !

সিগারেট খেতে খেতে পায়চারি করতে করতে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে।

মি. সেন : আরে, চললে কোথায়—

সরকার : দাঁড়াও আসছি। Just a few minutes.

প্রস্থান। কর্মচারী ঈশ্বর পণ্ডিতের প্রবেশ।

মি. সেন : (খাতা থেকে মুখ তুলে) হুঁ, তারপর এই যে পণ্ডিত।

ঈশ্বর : আজ্ঞে—

মি. সেন : আজ্ঞে না, বস তোমার সঙ্গে আমার মোকাবিলা করতে হবে কয়েকট. বিষয়ে।

ঈশ্বর : আমার সঙ্গে !

মি. সেন : হ্যাঁ বস, আপত্তি আছে ?

ঈশ্বর : কি যে বলেন।

মি. সেন : না যা আজকাল শুনতে পাচ্ছি সব তোমার নামে !

ঈশ্বর : মন্দ লোক অনেক কথা বলে।

মি. সেন : মন্দ লোকে, না ! জগতশুদ্ধ লোক মন্দ হয়ে গেছে আর তুমিই যা আছ একমাত্র সাচ্চা লোক, কেমন ?

ঈশ্বর : জগতশুদ্ধ লোক আমায় মন্দ বলছে ! তা যদি বলে তো নিশ্চয়ই আমি মন্দ, কিন্তু ঠিক ঠিক বলছে কি !

মি. সেন : তোমার কি ধারণা !

ঈশ্বর : আমি তো জানি, অবিশ্যি জগতশুদ্ধ লোকের কথা বলতে পারবো না, বহু লোকের আমার সম্বন্ধে মোটামুটি ভাল ধারণাই আছে। অনেক সময় এই পোড়া কানেই তারা বলছে শুনি পণ্ডিতের মতো লোক হয় না। •তা...বেশী কথা কি, আপনিই বলুন না...লোক কি আমি খারাপ ?

মি. সেন : খারাপ তুমি ছিলেনা,...হচ্চো।

ঈশ্বর : হচ্চো, হইনি তো এখনও।

মি. সেন : বড বাকীও নেই।

ঈশ্বর : আপনি বলছেন ?

মি. সেন : হ্যাঁ বলছি, বলতে বাধা কচ্ছি।

ঈশ্বর : বলতে পারেন। আপনি মালিক।

মি. সেন : না ও মালিক টালিকের কথা নয় পণ্ডিত। বড়কর্তার মত কর্মচারীদের ওপর আমি সে মালিকানার দেমাক দেখাই না। আসল কথা হচ্ছে কোম্পানী। কোম্পানীর চাইতে আমার কাছে কেউই বড় নয়। কারণ তুমি মালিকই বল আর শ্রমিকই বল--কোম্পানী না টিঁকলে কেউই টিঁকতে পারে না।

ঈশ্বর : সে তো অবশ্যই।

মি. সেন : কি অবশ্যই। এখন তো বলছ অবশ্যই কিন্তু কথাটা হয়ত একটু রূঢ়ই শোনাবে, সত্যি করে বল তো কজন কর্মচারী এই কোম্পানীর মঙ্গল চায় ?

ঈশ্বর : কেন, আমি তো জানি প্রত্যেকেই চায়। চায়, কারণ রুজীর সম্বন্ধ রয়েছে যে।

মি. সেন : প্রত্যেকেই চায়, না ! আর সেই জন্যেই বুঝি কোম্পানীর এই দুর্দিনে মায় মাগ্‌গী ভাতার টাকাটা পর্যন্ত মাইনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবার জন্য তোমরা জেদ ধরেছ ? হুঁ: ! আরে বাবা কোম্পানীর যদি সেই অবস্থাই থাকতো তো বলতে হত না তোমাদের, এমনিই পেতে। কেন, পাওনি ? পঞ্চাশ সনের মন্বন্তরে এক এই বাংলা দেশেই কমসে কম তিরিশ চল্লিশ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরে গেছে। কেউ বলতে পারে ন্যাশানাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর একটা মুদ্দাফরাস, মরে যাওয়া তো দূরের কথা, এক বেলা না খেয়ে থেকেছে ? দিয়েছে কোম্পানী তোমাদের সেই দুর্দিনে, দেয়নি ! চাল বল, ডাল বল, নুন বল, তেল বল, এমন কি অনেক ভদ্দর লোক পর্যন্ত মাথা কোটাকুটি করে যে সব জিনিষের হদিস পায়নি, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী না চাইতেই সেই সব দুর্মূল্য জিনিষ

কোম্পানীর প্রত্যেকটি মজুরের হাতে খুশী হয়ে তুলে দিয়েছে। নাকি বল দেয় নি?

ঈশ্বর: না সে তো বলছিই, বলি—

মি. সেন: কই বলছ, 'বলছি'! তাই যদি বলবে তো এই বুঝি তার প্রতিদান। চোখ রাঙিয়ে বলছ ভাতার টাকা মাইনের সঙ্গে যোগ দিলে কি থাকলাম, আর নয় তো দিলাম তুড়ে তোমার কোম্পানী, ছিঃ! দেখ নুন খাবার পরও যে গুণ গায় না, তাকে এক কথায় নেমকহারামই বলে। তোমরা সব নেমকহারাম।

ঈশ্বর: তা আমাকে এখানে একলা ডেকে এনে এসব কথা শোনাচ্ছেন কেন! ইউনিয়নকে বলুন না!

মি. সেন: কিসের ইউনিয়ন? মানি না আমি তোমাদের ঐ ইউনিয়ন। ইউনিয়ন! Cheek!

ঈশ্বর: আপনি মিথ্যে মিথ্যি চটছেন।

মি. সেন: মিথ্যে কি সত্যি— আমি পারি সব তোমাদের একবার দেখিয়ে দিতে, জানলে পণ্ডিত! শুধু··· নিজের কথাটাই ভাবো না কেন। দু'বছর আগে, মনে পড়ে! মরতে তো বসেছিলে মাগ-ছেলেপুলে নিয়ে,···কী খেয়ে বাঁচতে য্যাদ্দিন যদি এই কোম্পানী না থাকতো। আজ বলছ তুমি ইউনিয়ন, শ্রমিক-স্বার্থ, সব বড় বড় কথা।

ঈশ্বর: তা সে কোম্পানী তো বাঁচিয়েছেই আমি বলছি।

মি. সেন: বলছি আর এই বুঝি তার নমুনা! ছিঃ, শেষকালে ঈশ্বর তুমি আপনার লোক হয়ে যে এই রকম করবে···হেডমিস্ত্রী বলে সাধারণ কারিগরদের ওপর তুমি ইউনিয়নের কথা বলে হামলা কর।—

ঈশ্বর: ইউনিয়নের কথা বলে আমি হামলা করি?

মি. সেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কি কর আর না কর তার প্রত্যেকটা খবরই আমার কানে এসে পৌঁছয়, সে আর তোমায় বলতে হবে না; এখন কথা হচ্ছে যে কে তোমাকে এই কারখানার হেডমিস্ত্রী করে দিলে, ইউনিয়ন? না এই হেমেন সেন? তাই বলি এই যুগে লোকের কক্ষনো ভাল করতে নেই। কেউ তার মর্যাদা রাখে না। হুঁ! বুঝতাম খুব অসুবিধের রেখেছে কোম্পানী, নিজেরা টাকা করছে আর তোমাদের সব না খাইয়ে শুকিয়ে মারছে, তখন বলতে পারতে।

ঈশ্বর: আমরা কিন্তু সত্যিই শুকিয়ে মরছি।

মি. সেন: কি শুকিয়ে মরছি, তুমি শুকোচ্ছ?

ঈশ্বর: হ্যাঁ তা' কিছুটা তো—

মি. সেন: কই—এ কথা তো বলনি তুমি আমায় কস্মিন কালে।

ঈশ্বর: আমি তো একলাই নই, আমার মতো আরো অনেকে···

মি. সেন: ছ্যাখ পণ্ডিত, মিথ্যে মিথ্যি ঐ শেখানো বুলিগুলি আর কপচো না— আমার মত অনেকেই। ভাবছো খুব একটা বিশ্ব প্রেমের কথা বলছ। আরে বাবা সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে ঐ বৈষম্যটা রয়েছে। দুটো আঙুল পর্যন্ত কারো এক নয়। তুমি তো ভারী বলছ······ছ্যাখ বড় বড় কথা আউড়ো না বুঝলে পণ্ডিত!···আমার মত অনেকেই— কথা বলে বেশ। হুঁ, যাক গে, তারপর আছো কোথায় আজকাল?

ঈশ্বর: সেই গলির মধ্যেই।

মি. সেন: গলি,— ও সেই যে গিয়েছিলাম একদিন রাত করে! ওফস্! সে কী ঘিঞ্জি···

ঈশ্বর: হ্যাঁ তা একটু ঘিঞ্জিই বটে।

মি. সেন: থাক কি করে ওর ভেতরে?

ঈশ্বর: আমিও ভাবি মাঝে মাঝে কথাটা।

মি. সেন: কেন তুমি আমাদের কারখানার ভেতরের একটা ঘরে থাকতে পারো না! দু-চারখানা ঘর তো দেখি এমনিই খালি পড়ে থাকে। হয় না সুবিধে?

ঈশ্বর: না সে তো হয়ই, তবে আমি তো একলাই নই, আর পাঁচ জনা—

মি. সেন: আঃ, দেখ ঈশ্বর, ঐ আর পাঁচজনার কথা ছাড়, বুঝলে! আর পাঁচজনা! দেখছ নিজেরই দাঁড়াবার জায়গা নেই। কী বিশ্বপ্রেম রে বাবা। কোন মানে হয়! যা বললাম তাই কর। আর অত advance নাও কেন! মাস গেলে তিন টাকা

সাড়ে সাত আনা, এক টাকা ছ পয়সা মাইনে পাও, ব্যাপারটা কি ?

ঈশ্বর : ব্যাপার খুব স্পষ্ট। যা রোজগার করি তাতে করে সংসার চলে না।

মি. সেন : কই সংসার চলে না, এসব কথা তুমি তো কক্ষনো বলনি আমায় ?

ঈশ্বর : দরখাস্ত একখানা দিসলাম।

মি. সেন : দরখাস্ত, আরে দরখাস্ত ও-রকম রোজ হাজারখানা পড়ছে। দরখাস্ত দিলে কি হবে।…আর তুমি দরখাস্ত করবে কেন ? চাকরি করবার সময় তুমি কি দরখাস্ত করে চাকরি পেয়েছিলে ? এ ধরণের মনোভাব তোমার হল কি করে পণ্ডিত ? —দরখাস্ত, appeal, protest letter — যত সব ! ছাড বুঝলে, ও-সব ছাড়। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাল মানুষের মতো কাজ কর, তোমার কোন অসুবিধে হবে না— কোন অসুবিধে হবে না।

কবির প্রবেশ।

কবির গায়ে একটা ওভার-কোট, পরণে যোধপুরী পায়জামা। মাথায় গান্ধী টুপি। সঙ্গে সাবিত্রী দেবী। ফর্সা চেহারা। টিকোলো নাক। কপালে লাল টিপ। কমলালেবু রঙের একখানা শাড়ী আঁট করে জড়িয়ে পড়া।

মি. সেন : (উঠে দাঁড়িয়ে) আরে এস এস। —আসুন সাবিত্রী দেবী। What a fortune— আচ্ছা ঈশ্বর তা হলে তুমি এখন এস। আর— দেখছি আমি তোমার ব্যাপারটা। দেখছি।

ঈশ্বরের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে তুমুল হট্টগোল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

কবি : গোলমাল কিসের ?

সাবিত্রী : কারা ?

মি. সেন : ও কিছু না, কারখানার একটা shift এর বোধ হয় ছুটি হল। বসুন সাবিত্রীদেবী।

নিমেষের জন্য একটু মুহ্যমান হয়ে পড়েন মি. সেন। একটু পড়েই তৎপরতার সঙ্গে সিগারেট কেস্ খুলে ধরেন কবির সামনে।

smoke, তারপর দেবীর দিকে যে আজ দেখি একেবারে চাওয়াই যাচ্ছে না, কবি !

সাবিত্রী : সত্যি !

মি. সেন : না কবি !

কবি : আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম। তবে নিজের বলাটা নেহাৎই একেবারে খারাপ দেখায় বলে চেপেছিলাম এতক্ষণ। …আহা মা কী হইয়াছেন !

সাবিত্রী : মুখে তোমার আজকাল কিছু আটকায় না।

কবি : খারাপ কিছু বলেছি মি. সেন ?

মি. সেন : আরে দূর দূর, কথা হল। তুমি কবি, কথা বললেই যে অমৃত হয়ে যায়। খারাপ কি বলছ ! Poet-দের কথাই আলাদা— divine musicians.

কবি : বল ভাই, একটু বল আমার হয়ে।

মি. সেন : Of course, তবে এর চাইতে আর বেশী বলব না কিন্তু— over-acting হয়ে যাবে !

মি: সরকারের পুন: প্রবেশ।

মি. সরকার : বেশ জমেছে দেখছি !

মি. সেন : আরে এই যে মালেক, এস এস। কী কাণ্ড !

সাবিত্রী : কী লোক বাবা, চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন তো !

মি. সরকার : শুনলেও over acting তো হয় নি কারো ! সুতরাং— না কি বল হে !

মি. সেন : Right right, বড্ড জোর বাঁচিয়ে দিয়েছ হে, নয় তো over-acting ই হয় তো করে ফেলতুম 'ভদ্দর লোকদের' সামনে।

মি. সরকার : You will find Sircar always a saviour— ত্রাতা !

কবি : হাঁ ভাই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে অনুবাদটা করে যেও। বড্ড মিষ্টি লাগে শুনতে।

মি. সেন : এটা কি অকবির মত একটা কথা বললে হে কবি, অনুবাদ মিষ্টি লাগে।

সাবিত্রী : দেখলেন তো, কথা বললেই অমৃত হয় না। Divine musicians even betray.

মি. সেন : Oh ho, what a lawyer, a Daniel came to Judgement.

মি. সরকার : কি রকম হল, রসিকতাটা তো একেবারেই ধরতে পারলাম না।

সাবিত্রী : Look, a saviour could not save himself!

মি. সেন : (হাসি) হা হা হা হা, A saviour could not save himself. Right right. What a wit, কবি? Oh! সাবিত্রী দেবীর আজকে যে দেখি একেবারে full form, sparing none.

মি. সরকার : It is definitely very bad to take somebody unawares. This is not sportsmanlike.

সাবিত্রী : There can be no law in love and war.

মি. সেন : সরকার blush করছে, কবি দেখ সরকার blush করছে।

মি. সরকার : I presume none of us is encountering either of the feats— কবি। Help me.

কবি : I dunn'o. I dunn'o.

বয় কফি দিয়ে গেল। সাবিত্রী দেবী রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে থাকলেন। সরকার কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

মি. সেন : A saviour couldn't save himself. সরকার, ছি ছি ছি ছি— এ লজ্জা তুমি রাখবে কোথায়!

সরকার : "আহা এ কি মোর দুস্তর লজ্জা, আ"।— (হাসি চেপে) সত্যি মিঃ সেন আমি নির্লজ্জ হয়ে বসতে পারছিনে।

সাবিত্রী দেবী সরকারের দিকে কফি এগিয়ে দিলেন এক কাপ।

সাবিত্রী : কফি খান গরম গরম, দেখবেন লজ্জা ভেঙে যাবে। চিনি দেব ক-চামচে, বলুন!

সরকার : সোয়া দুই। তার চাইতে একটা দানা যেন কম বেশী না পড়ে।

সাবিত্রী : চিনি তো আর গুণে নিতে পারবেন না!

মি. সেন : You never know.

সাবিত্রী : No, I would believe it, if it was possible for a Son of man.

সরকার হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, ছুঁড়ে ফেলে দেয় কাপ। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

মি. সেন : সরকার!

সরকার : Shut up you bloody hound.

মি. সেন : What the devil do you mean.

সরকার : (ঘুরে দাঁড়িয়ে সাবিত্রীকে) And I will prove it.

সরকারের প্রস্থান।

'অবরোধ' সম্বন্ধে .

তাঁর নবান্ন-এর পরেই লেখা যে নাটক, তার নাম 'কারাগার'। আঙ্গিকের দিক থেকে সেটা সম্পূর্ণ অন্য একটা পথের সন্ধান খোঁজবার চেষ্টা করেছিল। একটা লকআউট হয়ে যাওয়া ফ্যাক্টরীর গেটে একটা বুড়ো দারোয়ানের চোখ থেকে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখ দুর্দশা বিবৃত।

—ঋত্বিক ঘটক

* 'কারাগার' নয়, হবে 'অবরোধ'। ঋত্বিকবাবু ভ্রমক্রমে অবরোধকে কারাগার বলে উল্লেখ করেছেন।

—গন্ধর্ব সম্পাদক

কবি : Wait Sircar, I will come with you, Sircar.

সাবিত্রী দেবী ফেইন্ট্ হয়ে পড়েন।

মি. সেন : কবি, শোন। কবি, কি হচ্ছে কি সব !··· না:···

ছুটে এসে টেবিলের ওপরকার গ্লাশ থেকে বার কয়েক ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মারল সাবিত্রী দেবীর চোখে মুখে। সোফার ওপর সাবিত্রী দেবীকে যুত করে শুইয়ে দিয়ে একটা বালিশ টেনে দিলো সাবিত্রীর মাথার নীচে। ঠাণ্ডা জলের হাত দিয়ে ঘাড়টা মুছিয়ে দিল। তারপর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকার দরজার কাছে গিয়ে পায়চারী করতে লাগল।

মঞ্চ অন্ধকার। সাবিত্রীর জ্ঞান ফিরে আসেনি। জ্বলন্ত সিগারেটের আনাগোনায় সেন সাহেবের গতিবিধি অস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিত্তের অস্থির অবস্থা বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে সুস্পষ্ট। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। শুধু কারখানার ভেতরকার ঘূর্ণায়মান চাকার একটানা শব্দ ভ্রমরুদের মতো গান করে চলেছে।

কাল ও অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেপথ্যে এতক্ষণ যে করুণ একটা সুর বিলাপের মতো কাঁপছিল এখন সেই সুরটা পর্যায়ক্রমে বেড়ে বেড়ে বিরাট একটা যান্ত্রিক আবহ সৃষ্টি করে। এই আবহটা চূড়ান্ত ভাবে বেড়ে বেড়ে দ্বিতীয় দৃশ্যে গিয়ে পড়ে। তারপর আবার ঝিমিয়ে পড়ে অভিনয় আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে।

।।।।।।।।।।দ্বিতীয় দৃশ্য।।।।।।।।।।

কারখানা— ন্যাশনাল মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ।

যুদ্ধের বাড়তি কাজের চাপে রাত্রেও কাজ চলছে কারখানায় পুরোদমে। সামনে টানা চওড়া করিডরের মাঝামাঝি জায়গায় বিরাট একটা খিলেন। অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় গেটের লোহার দুটো দরজা লোহার পাতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে খানিকটা হাঁ হয়ে আছে। খিলেনের পথ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই পড়বে করগেটের টিনের বিরাটাকায় একপাল্লার দরজা— ওপর নীচে খানিকটা করে ফাঁক— ভেজানো রয়েছে। দপ্—সির্-র্-র্-র্—একটা যান্ত্রিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নীচের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে অবিরাম ফুলকি উড়ছে আগুনের। আর কানে আসছে একটা চাপা গোঁঙানির শব্দ। যান্ত্রিক অর্কেস্ট্রা বাজছে ঘট-ঘটাং-ঘটাং-ঘট, ঘট-ঘটাং-ঘটাং-ঘট, ঘট-ঘটাং ঘট......

লোহার গেটের ডান দিকটার দেওয়ালের কাছে একটা কাঠের টুলের ওপর বসে ঝিমোচ্ছে বুড়ো দারোয়ান গজানন। মাথার ওপরকার আলোটা গোল হয়ে এসে পড়েছে গজাননকে কেন্দ্র করে। শূন্যে ঝুলন্ত আলোটাকে ঘিরে উড়ছে একঝাঁক দেয়ালী পোকা।......গজাননের ডান দিকে লিফ্ট। লিফটের ডাইনে পাক দিয়ে উঠে গেছে ওপরে উঠবার সিঁড়ি।...অস্পষ্ট আলোয় গোটা দৃশ্যটাই দেখাচ্ছে খোদাই করা উডকাটের আলো আঁধারির ছবির মত ছমছমে।... সামনে টানা চওড়া বারান্দার ওপর দিয়ে বন্দুক ঘাড়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে মহাবীর-সান্ত্রী ; ভূতের মত নড়ছে চড়ছে জুতো ঘষটে ঘষটে আর হঠাৎ থমকে থমকে দাঁড়াচ্ছে অদৃশ্য শত্রুকে তাগ করে— আবার চলছে জুতো ঘষটে। ঘুরতে ঘুরতে লোহার গেটটার গায়ে হাত রেখে দাঁড়াতেই গেটটা যান্ত্রিক শব্দে কিঁচ কিঁচ শব্দ করে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় বুড়ো দারোয়ান গজাননের—কিঁচ কিঁচ শব্দটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

গজানন : চুহা বা।

মহাবীর : হুঞ্চ হোলা।

মুখে গাঁই গুঁই আর চাপ চুপ শব্দ করতে করতে ঝিমোতে থাকে গজানন।...মহাবীর জানে গজাননের এই দুর্বলতা, তাই দুষ্টুমি করে সে আবার গেটটা নাড়তে থাকে। ...টনক নড়ে যায় বুদ্ধের। প্যাট প্যাট করে বুড়ো মহাবীরকে একটু লক্ষ্য করে—এদিকে সেদিক তাকিয়ে দেখে ; তারপর একটু পরে আবার ঝিমোতে থাকে। কিঁচ কিঁচ শব্দের কিন্তু বিরাম নেই— এবার একটু জোরেই আরম্ভ করেছে মহাবীর। ঘুম ভেঙে যায় আবার বুড়োর। নাটা নাটা দুটো চোখ তাকিয়ে সে ঠিক কোনখানে শব্দটা হচ্ছে সেটা আঁচ করতে চেষ্টা করে। মহাবীর কিন্তু সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে ঠোঁট টিপে হাসছে আর মাঝে মাঝে গেটটা নাড়ছে তাল বুঝে।

গজানন : আরে কেয়া হ্যায় রে।···খালি কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ !

মহাবীর : (কৃত্রিম রোষে) কাঁহা কিঁচ্ কিঁচ্?

গজানন : আরে শুনা তো শালা চুহা না কেয়া বা ইধর উধর হরদম কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ কর্ রহা হ্যায়।

মহাবীর : কাঁহা চুহা ? চুহা তো দেখতাহি নেহি।··· চুহা চুহা চুহা, আরে বুঢ্ঢা তেরে শিরমে চুহা।

প্রভঞ্জনরূপী বিজন । সঙ্গে ত্রিভুবনরূপী বিভূতি মুখোপাধ্যায়

বাংলা থিয়েটারে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা **দেবীগর্জন**

সোপানের উপর প্রভঞ্জনরূপী বিজন । পেছনে ত্রিভুবনরূপী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

মফঃস্বলে ত্রিতীর্থ-র প্রযোজনায় ঃ আঁই দেখ, বাটখারা বানাইল দেখ

দেবীগর্জন জনগণের সংগ্রামের অপর নাম

শোষক-নিধনের ক্রান্তিকাল : ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজনায়

সোনার বাংলায় ঃ গাজীর ভূমিকায়

'তিতাস একটি নদীর নাম' ঃ রামকেশব চরিত্রে বিজন। সঙ্গে শোভা ও অন্যান্য

স্বপ্নেমে সিরফ্ চুহাই দেখতে হোঁ, হোগি! এত্তো ঠুল ঠুল মোটা মোটা চুহা, হোগি!'

গজানন : আরে রাম রাম রাম রাম!…কাঁহা থা অউর কাঁহা আ গয়া। আরে রাম রাম রাম রাম।

মহাবীর : (একটু এগিয়ে যায়) কাঁহা থা!

গজানন : আরে কেয়া বাঁতাউ তোসে স্বপ্নে কি বাত। শালা চুহানে বিলকুল মাটি কর দিয়া। খালি কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্।…ফির কেয়া উ আবেগা! মাইনামে এক ইয়া দো বার তো বাস্, বহুত খুশি…শালা চুহা।

মহাবীর অন্যদিকে মুখ ঘোরায়।

এ মহাবীর, ইয়ে চুহা না, শালা বহুৎ খারাপ হৈ। বাবাজীসে হাম শুনা কি ইয়ে চুহা জীন্‌কা বহুৎ পিয়ারা হৈ। ভগ্‌বান যিস্কো ভালা চাহাতে হ্যাঁয় তো জীন্ উস্কে উস্কো পাশ তুরন্ত ভেজ দেতে হৈঁ। দেখতে হি উস্কি জিন্দিগি খতম কর দেনা হি ধরম হ্যায়। তো কেঁও নেই তু উস্কো মারডালা!… আব্‌সে ঠিক করলে যে এক চুহে কো দেখা কি ব্যস, একদম খতম কর্‌দে জানসে। তব তেরা ধরম কদম কদম বাঢ় যায়েগা। য্যাসা শও চুহা খতম করনে পর জীন তুঝে ছুঁ নেহি সকেগা। সমঝা!

মহাবীর : কেয়া বোলতা হ্যায় রে বুঢ্‌চা। রাতমে সারাব পিয়া হৈ খুব, হোগি!

গজানন : আরে রাম রাম রাম রাম।

মহাবীর। তো কেয়া বোলতে হো! বাতাও!

গজানন : আরে বিটিয়া আ রহি হৈ স্বপ্নে মে। মেরি বিটিয়া। উস্কি মা ভি আ রহি হৈ। থোড়িসি বাতচিত ভি হোনে লাগিথী মেরা সাথ হঁাসতে হঁাসতে, ইস্‌বখত কিঁচ্ কিঁচ্ কিঁচ্ কিচ্ কিঁচ্ কিঁচ্, শালা চুহা…

মহাবীর : (হেসে) এত্‌না বুঢ্‌চা হো গয়া তব ভি স্বপ্নেমে আওরৎ দেখতে হো।…মেরী ভী এক সুন্দর পিয়ারী হৈ দার্জিলিং মে, এক রাত ভি উস্কো নেই দেখতা। আর শালা রাত ভর টহল দেগা তো আবেগা ক্যায়সে আওরৎ স্বপ্নেমে!

গজানন : চুহা মার দশ বিশ, আ যায়েগী।

মহাবীর : য্যায়সে, শোনেকিকোই জরুরত্ নেহি হ্যায়!

গজানন। আরে তু তো খাড়ে খাড়ে হি শো সকতা হ্যায়।

মহাবীর : মৈ কেয়া ঘোড়া হুঁ…লঃ, কাল সে হাম রাতমে শোত্ রহে গা, লঃ!

মহাবীর সরে যেতেই গজানন আবার বসে বসে ঝিমোতে আরম্ভ করে। পেছনে কারখানায় তেমনি কাজ চলছে। কখন কখন ফোরম্যানের হাঁক শোনা যায় দূরাগত সাইরেনের মতো। একটু পরে গজাননকে তন্দ্রাহত দেখে মহাবীর কৌতুকভরে এগিয়ে আসে। চোখের পাতার কাছে আঙুল নেড়ে গজাননের ঘুম পরীক্ষা করে। তারপর বন্দুকটা পাশে রেখে লঘু ত্রস্ত পায়ে আশপাশ থেকে একখানা আধময়লা সাদা চাদর ও গজাননের পায়ের কাছে গোটো করা রঙীন আলোয়ানটা নিয়ে সরে দাঁড়ায়। তারপর গায়ের কোর্তার ওপরেই চাদরটা শাড়ী করে কোমরে জড়িয়ে আর রঙীন আলোয়ানটা মাথায় ওড়না করে পরে গজাননের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে ঘুমোতে ঘুমোতে ঝুল খেয়ে টনক নড়ে ওঠে গজাননের— মনে হয় সামনে যেন কোন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে বেঁকে ভেঙে। হকচকিয়ে যায় বুড়ো গজানন। চোখ তারিয়ে সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে অপরিচিতার। একবার মনে হয় ভুত নাকি! ভয়ে ভয়ে মহাবীরকে ডাকে।

গজানন : এ মহাবীর। কাঁহা গৈল বা…রাম রাম রাম রাম— তুম কোন হো!

সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপে মহাবীরের হাসিতে।

আরে এ মহাবীর। ‥কেয়া জানে কোন বা। মহাবীর হো!

কোন সাড়া নেই। একটু ইতস্তত করে গজানন ভালো করে নিরীক্ষণ করে নারীমূর্তিটাকে। আশে পাশে তাকিয়ে দেখে রঙীন আলোয়ানটা উধাও হয়েছে। একটু পরে মহাবীরের জুতোটা সে যেন আন্দাজ করতে পারে। এতক্ষণে একটু হৃষ্ট হয়ে ওঠে বুড়ো। ঠিক ধরেছে এইবার। তবু রহস্য সে ভাঙতে চায় না। না বোঝার ভান করে অভিনয় শুরু করে।

আব মৈঁ কেয়া করু।…এ মহাবীর, মহাবীর হো!… কেয়া জানে বাবা।…স্বপ্নেমে আওরৎ আ রহী থী,

আব কেয়া উ সাচমুচ আ গয়ী হৈ। মগর ইয়ে ক্যায়সে হো সকতা! কাঁহা দারভাঙ্গা ঔর কাঁহা কলকাত্তা। কেয়া মালুম!···আচ্ছা পুছ দেখে একদফা, কেয়া হোগা উসমে।···ইয়ে···তুম কোন্ হো বা? কোন হো বা তুম?··· কেয়া দেবী কো শুনাই নেহী পড়তা।···আরে বাতাও না মুঝে পিয়ারী, কেঁও ঘাবড়াতি! তুম কোন হো!

মহাবীর : মৈ আওরৎ হুঁ।

গজানন : আওরৎ হুঁ!

মহাবীর : হাঁ জী।

গজানন : হাঁ হাঁ আরে উতো য়্যাসাই মালুম হোতা মুঝে, মগর মেরা সওয়াল কেয়া তুম কৌন হো, কাঁহা সে আয়ি বা, বাতাও। কেয়া সরম আতি হৈ! আরে মুঝে কেয়া সরম! মৈঁতো বুঢ্ঢা হুঁ, আঁ! ···ঘুঙট্ পটকো খোল দিয়া যায় দেবী· মৈ আরজ করতা হুঁ তুঝে।

মহাবীর : ঘুঙট পট কেয়া খোলা যাতা হাঁায়· খোলনা পড়তা হ্যায়।

গজানন : ইয়ে বাত সাচ।···নেহি নেহি, ছলনা করতি হ্যায়।

মহাবীর : আওরৎ কভি ছলনা নেহি করতি।

গজানন : আরে হাঁ হাঁ ইয়ে তো ঠিক বাতই হ্যায়— আওরৎ কভি ছলনা জাস্তী নেহী। হামরা ভুল হুয়ী, ভুল হুয়ী। আচ্ছা দেখব তো; দেখব তো কাঁহাকা আওরৎ!···অঁ—বহুত খুপ্ সুরৎ মালুম হোতা!

ঘোমটা খুলে দেখে মহাবীর স্ত্রীলোকের সরম মুখ টেনে চোখ বুজে আছে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারে না। হেসে ফেলে ভারী গলায়। সঙ্গে সঙ্গে গজাননও নিজমূর্তি ধরে কৃত্রিম রোষে মহাবীরকে মারতে থাকে লাথি ঘুষি।

তব্ রে শা-লা...

লাথি মারবে বলে পা তোলে।

এমন সময় ছুটির সিটি বেজে ওঠে। সকাল হয়ে এসেছে প্রায়। মহাবীর দৌড়ে গিয়ে বন্দুকটা কাঁধে ফেলে যথারীতি গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়, অন্য দিকে দাঁড়ায় গজানন। একটু পরেই কারখানায় ঢোকবার টিনের বড় পাল্লাটা যান্ত্রিক শব্দ খুলে যেতেই কারখানার ভেতর থেকে একরাশ ঘন ধোঁয়া মঞ্চের ওপর এসে পড়ে। আর সেই ঘন কালো ধূমকুণ্ডলীর ভেতর থেকে মজুরদের বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। ঘামে ভেজা শরীরগুলো তাদের সব জঙ্গ সমারোহে চক্‌চক্ করে ওঠে দিনের আলোয়।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ **পটক্ষেপ** □ □ □ □ □ □ □ □ □

দ্বিতীয় অঙ্ক / ১ম দৃশ্য

মি. সেনের ড্রয়িংরুম। মিসেস্ সেন নিবিষ্ট মনে সাবিত্রী দেবীর মুখোমুখি বসে উল বুনছেন। সর্বাঙ্গে তার প্রচুর গহনা। মি. সেনের পরনে একটা গাউন — ঘরের এক কোণে ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন আর কবি খবরের কাগজ পড়ছে সোফার ওপর পা তুলে বসে।

মি. সেন : (ফোনে) তাই নাকি! বেশ বেশ বেশ। কিন্তু আজকে তো ভাই আমি পারবো না। কি, পাগল নাকি, মরবার ফুরসৎ পাবো না আমি আজ। আচ্ছা কি করে যাব বল?··· হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বুধবার তো— নিশ্চয়ই, আমি কথা দিচ্ছি। আচ্ছা, আচ্ছা ছেড়ে দিলুম।

কবি : গ্রীসের ব্যাপারটা দেখছি ক্রমেই পোল্যাণ্ডের মতো জটিল হয়ে উঠছে।

মি. সেন : পোল্যাণ্ডের মতো, তার চাইতে বল না কেন আমার কারখানার মত!

সুচিত্রা : তোমার তো কেবল ঐ কারখানা। Business

যেন আর কেউ করে না। ··· দেশ—বিদেশের কথা হচ্ছে শুনছ···

মি. সেন : কেন আমার কারখানাটা কি সৃষ্টি ছাড়া নাকি ! দেশ বিদেশের ভেতরে পড়ে না ? কবি !

কবি : উঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই—

সুচিত্রা : কারখানা কারখানা আর কারখানা। বিশ্ব-সংসারটাই যেন···

মি. সেন : আজ্ঞে হ্যাঁ একটা কারখানা !

সুচিত্রা : (হেসে) তাই আর না, খুব retort করতে ওস্তাদ হয়েছ।

মি. সেন : তুমি কিছুতেই contradict করতে পারো না সুচিত্রা, বললে কি হবে।

সুচিত্রা : আমার ভারী বয়েই গেছে, (কবিকে) দেখুন না কি রকম কথা ফিরোচ্ছে।

মি. সেন : তবে, এই কথার jugglery করেই টিঁকে আছি বাবা দুনিয়ায় ; নইলে আমার মত একটা অর্বাচীনকে···

সাবিত্রী : যবন হরিদাসের চাইতেও যে বেশী বিনয়ী হয়ে যাচ্ছেন মি. সেন !

মি. সেন : চেপে যেতে বলছেন ?

সাবিত্রী : না চেপে যাবেন কেন।

সুচিত্রা : এত বাজে কথা বলতে পার তুমি !

মি. সেন : বাজে কথা !

সুচিত্রা : তা নয় তো কি ! শুধু irrelevant juxtaposition of words— লোককে কথা বলে হয়রান করতেই যদি ভাল লাগে তো উকিল ব্যারিষ্টার হলেই পারতে— scope ছিল। Businessman হতে গেলে কেন ?

মি. সেন : কথাটা যে আমিও ভাবিনি তা নয়।

কবি : Really, how you talk সুচিত্রা দেবী—scope-টা তো দেখছি আপনারও কম ছিল না।

সুচিত্রা : (হেসে) scope হয়ত ছিল, কিন্তু opportunity পেলাম কৈ !

মি. সেন : বেশ তো, কারখানার কাজে আমায় তুমি সাহায্য করবে চল না—free scope and opportunity পাবে।

সুচিত্রা : মুখেই, বাইরে একটু বেড়াতে যাবো বললে যার মুখ শুকিয়ে যায়··· (কবিকে) ওপরটা এদের জানলেন খুব চটকদার, এমন ভাব দেখাবে যেন কতই না up-to-date, কিন্তু বেশ একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করুন, দেখবেন এদের প্রত্যেকে এক-একজন Tory number one.

কবি : কেন মি. সেনকে দেখলে তো তা মনে হয় না।

সুচিত্রা : দেখলে, বলছি তো ওপরটা এদের···

কবি : হ্যাঁ, হয়ত আপনার মত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিনি, কিন্তু মি. সেনকে তো আমি ভাল করেই জানি, তাতে করে···

সাবিত্রী : No leg pulling please.

কবি হাস্য করে।

কবি : কি রকম !

সুচিত্রা : অত কথা কি ! আমার দিকেই ভালো করে তাকিয়ে দেখুন না। এদের সত্যিকারের মানসিক গঠনটা কি ভাবে সালংকারে ফুটে উঠছে আমার প্রতিটি অঙ্গে। এই দেখুন কঙ্কণ, তাবিজ, চুড়ি, রুলি, দু হাতে দুটো দুটো চারটে আংটি, গলায় লকেটওলা দায়মল-কাটা হার। আরও তো পরি না বলে কত কথা কাটাকাটি হয়। আচ্ছা বলুন তো, এই অবস্থায় দেখলে আমায় কেউ আধুনিক কালের একজন শিক্ষিতা মহিলা বলবে ? অথচ দেখুন, অবিশ্যি তর্কের খাতিরেই বলছি, নইলে আমার নিজের কোন illusion নেই— আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট— passed successfully with honours in philosophy, মানে হয় ?

মি. সেন : মানে হওয়ালেই হয়। গ্রাজুয়েট হয়েছ বলেই যে রাস্তায় রাস্তায় ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াতে হবে তার কি কোন যুক্তি আছে ? কথায় বলে লক্ষ্মীরূপিণী, মেয়েরা থাকবে ঘরে— বললেই হল ? দু পাতা philosophy পড়ে তুমি দেশের গোটা

tradition কে উল্‌টে দিতে পার না। চালাকি করলেই হল!

সুচিত্রা : তাও যদি বুঝতে! Tradition বলতে তো বোঝ আমি তোমার ঠাকুমা হয়ে থাকব।

মি. সেন : What! ঠাকুমা (অট্টহাসি) হো-হো-হো-হো।

কবি : By jove, what a tradition!

তিন জনেই হাসতে থাকে।

সুচিত্রা : (হেসে) খুব humour হল, না!

মি. সেন : (হাসতে হাসতে) কী কাণ্ড, তুমি কি শেষ কালে আমায়···

সুচিত্রা : ঐ তো, seriously কোন কিছু বললেই তুমি হেসে উড়িয়ে দেবে— তোমার politics কি আর আমি বুঝি না। (হেসে) বা রে খুব হাসির কথা হল না, আমি চলে যাচ্ছি।

প্রস্থান।

কবি : আরে শুনুন, চলে যাবেন না রাগ করে সুচিত্রা দেবী, সুচিত্রা দেবী!

সাবিত্রী দেবী : দেখি আমিও যাই।

মি. সেন : সে কি, আপনি বসুন, ও এক্ষুনি আবার আসবে।

সাবিত্রী দেবী : I leave this hall in protest.

প্রস্থান।

মি. সেন : আরে এখানেও যে দেখছি trade union, কবি!

কবি : সর্বত্র।

মি. সেন : (সাবিত্রীকে লক্ষ্য করে) দেখবেন আস্তে আস্তে যাবেন, আবার মাথা-টাথা না ঘোরে।

(আবৃত্তি)

কবি : "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।
এ নহে মুখর বন-মর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।

এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম রঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়- শাখা
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"
কি রকম লাগল?

মি. সেন : Wonderful, প্লেনে করে Calcutta to Karachi যাবার কথা মনে হচ্ছিল। সে তোমার বলব কি কবি, একটা ethereal existence, নীচের দিকে চেয়ে থাকলে গোটা পৃথিবীটা মনে হয় যেন কোন engineer-এর হাতে আঁকা plan— সুতোর মতো বয়ে গেছে বড বড় নদ-নদীগুলো, পাহাড-পর্বতগুলো মনে হয় যেন so many dots on a canvas— আর মানুষগুলো দেখতে তোমার গিয়ে এই ঠিক ক্ষুদে লাল পিঁপড়েগুলোর মত— নড়ছে-চডছে— এমন funny লাগে।

কবি : funny লাগে!

মি. সেন : হাঁ্যা, মানে তোমার সে গিয়ে বলব কি এমন একটা অদ্ভুত sensation হয়, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কত শহর, কত বন্দর, কত জনপদ— সব যেন অসাড নিস্পন্দ হয়ে আছে। এমন অনেক vast tracts of land চোখে পডে যে দেখলে মনে হবে মানুষের সেখানে কোনদিন বসতি ছিল না। Creamy bluish একটা tint— অনেকটা মনে হবে তোমার এই, আরে কি যে বলে ওর নামটা—এই তোমার গিয়ে শেওলার মতো — miles after miles চলে গেছে...ওপরটায় পাতলা ধোঁয়ার একটা আস্তরণ— দেশটা মনে হয় as sombre and dull like a dead man's coffin. তোমার আবৃত্তি শুনতে শুনতে সেই কথাই মনে হচ্ছিল। তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা... বাস্তবিক।

কবি : বেশ একটা sense of resignation আসে, না!

মি. সেন : হাঁ্যা, and that is inevitably infectious— সমস্ত দেহ মনটাকে আস্তে আস্তে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে, at times you feel like a sinking man— going down and down and down.

কবি : খুব deeply enjoy করেছ তো। চমৎকার

লাগল। না মি. সেন you are really great, বইয়ের প্রেমে তো অনেক লোকেই চড়ে কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যা তো আমি কারো মুখ থেকে শুনিনি।

মি. সেন : বলছ!

কবি : না sincerely.

মি. সেন : ছিল ভাই, অন্তরের সম্পদ অধমের ভেতরে-ও কিছু কিছু ছিল, কিন্তু কেউ দাম দিলে না। সবাই জানলো Mr. Sen is essentially a typical businessman— খচ্চর লোক। স্ত্রী পর্যন্ত মনে করে যে আমি তাকে একটা পণ্য দ্রব্য বই আর কিছু মনে করি না। See...

কবি : না, এ কী বলছ!

মি. সেন : বলতে আমারও খুব ভাল লাগছে না ভাই কিন্তু...আর বলব কি, শুনলে তো কিছুটা নিজের কানে একটু আগেই।

কবি : ও কিছু না, তর্কের খাতিরে ও রকম অনেক স্ত্রীই বলে থাকে।

মি. সেন : তর্কের খাতিরে! But even when in love— how can you explain that. দেখ কবি, may be I am not a psycho-analyst, but certainly not a fool. যাক গে, I have no illusion about it— আছি, থাকতে হয়; this much...

সুচিত্রার প্রবেশ।

য়্যাঃ, নাও সিগারেট খাও। তারপর কল্যাণী... দেবী, নিজ গুণেই এলেন না...

সুচিত্রা : কেন, disturb করলাম?

মি. সেন : না—া—া....

সুচিত্রা : I am sorry. যাচ্ছি···

কবি : আরে কী আশ্চর্য, বসুন, সুচিত্রা দেবী...না, ও রকম করলে আমি কিন্তু এক্ষুনি চলে যাব।

সুচিত্রা : না আমার কাজ আছে, উল্টা দিতে এসেছিলাম।

মি. সেন : Let her, let her, জোর করে বসতে বললে আবার বলবে civil liberty-তে হস্তক্ষেপ করছে।...চালাকি, সব সময় আইন বাঁচিয়ে চলবে, বুঝলে কবি···আমি বাবা হুঁশিয়ার হয়ে গেছি এখন।

সুচিত্রা : তা আর জানি না! আইন চেন আর নাই চেন আইনের ফাঁকগুলো বেশ ভাল করেই রপ্ত করে রেখেছ...তুমি কি কম লোক!

মি. সেন : দেখলে, দেখলে কবি!

সুচিত্রা : আহা, ভয় খাবারই লোক কি না তুমি!

গমনোদ্যত।

মি. সেন : তুমি চলে যাচ্ছ!

সুচিত্রা : হ্যাঁ, কেন, আড্ডা মারব বলে তো আমি এখন আসিনি। সংসারের কাজকর্ম নেই?

মি. সেন : ও, তাহলে রাগ করে যাচ্ছ না, বেশ! তা if you don't mind দু'বাটি চা দিয়ে যেতে বলো তো। লক্ষ্মীটি!

সুচিত্রা : আহা, ঢং।

মি. সেন : কি হল!

সুচিত্রা : (হেসে) পাঠিয়ে দিচ্ছি।

প্রস্থান।

মি. সেন : Thanks···(কবিকে) আর একটু চা খাওয়া যাক, কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছি।

কবি : আমাকে প্রশ্ন করা বৃথা।

মি. সেন : ও, তুমি তো মিইয়েই থাক চা ছাড়া। তা বেশ, কিন্তু কটা বাজল! (ঘড়ি দেখে) এগারোটা, বারোটা, সাড়ে বারোটা, একটা, thats all right, — ঠিক আছে।

কবি : (উদাত্ত স্বরে)

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

মি. সেন : তা বিহঙ্গ না হয় পাখা বন্ধ করল কিন্তু এদিকে আমার কারখানাও যে সঙ্গে সঙ্গে অচল হয়ে পড়ছে।

কবি : কেন গোলমাল এখনও মেটেনি ?

মি. সেন : কোথায় আর মিটছে বলো, সব ব্যাটা গোঁ ধরে বসে আছে। কম ঝামেলা!…

কবি : কেন নতুন করে আবার কী চাইছে ?

মি. সেন : কী আবার চাইবে,— টাকা দাও, ভাতা দাও, কাপড় দাও—এই সব। হা-ভাতের দেশ! লোকগুলোও হয়েছে তেমনি— যত দেবে তত চাইবে। হারামি হারামি!

কবি : তা অনেক দিন ধরে তো চলছে, মিটিয়ে ফেল এইবার যা হয় একটা রফা করে। এই রকম ভাবে চলতে থাকলে তো business দারুণ hamper করবে। করবে না ?

মি. সেন : Hamper মানে ডুবিয়ে দেবে সব কিছু। এই তো আর কটা দিন মাত্তর বাকী আছে—এর ভেতরে যদি government-এর জরুরী অর্ডারটা supply করতে না পারি তো লাটে উঠে যাবে business। ষোল লাখ টাকার contract, চাড্ডি-খানি কথা না!

কবি : তা হলে মিটিয়ে ফেল যে করে হোক। টাকা চায় তো তাই দাও না— risk নিচ্ছ কেন ? কত আর তোমার লাগবে ?

মি. সেন : উঁ, না, ব্যাপারটা ভাই এখন একটু অন্য রকম দাঁড়িয়েছে কিনা! নইলে টাকা সে আমি দিয়ে দিতে পেছপা হতুম না। কিন্তু একবার দেব না বলে ফেলেছি কি না, এখন কথার খেলাপ করতে পারি না।…বুঝতে পারছ না তুমি যে এখন surrender করার মানেই হচ্ছে সব মাথায় তুলে দেওয়া। ব্যাটারা ভাববে strike-এর হুমকি দিয়ে জব্দ করে দিলুম। কি বিশ্রী একটা scandal বলতো! আর একবার যদি এই সুবিধে পেল তো regular unbearable করে তুলবে তোমার জীবন ভবিষ্যতে— তখন কথায় কথায় strike-এর হুমকি! মাথায় তুলতে আছে কখনও!

কবি : তা বলে মিটমাট তো তোমায় একটা করতেই হবে। ষোল লাখ টাকা তো আর তুমি তাই বলে risk করতে পার না।

মি. সেন : মিটমাট মানে একটু কায়দা করে করতে হবে আর কি। দেব, ঐ টাকাই দেব, তবে অন্য ভাবে— যে ভাবে দাবীটা উঠেছে ঠিক ও ভাবে নয়, বুঝতে পারলে ?

কবি : কি রকম ?

মি. সেন : ধর এই extra profit tax এর কিছুটা অংশ, ও তো গিয়েই আছে বুঝতে পারলে না, আমি dividend হিসেবে declare করলুম। কোম্পানীর কোন একটা function-এর ব্যাপারে …gesture টাও বেশ ভাল হয়, কেমন না! কিন্তু দাবী হিসাবে কখনই মেনে নেব না।

কবি : ঘুরিয়ে নাক দেখানোর tactics.

মি. সেন : হ্যাঁ, তার আর উপায় কি বল। Business-এর ব্যাপারে এসব একটুখানি করতেই হয়, particularly when you are dealing with the workers, who are always under the peculiar impression that they are being constantly exploited.

কবি : ধারণাটা সত্যিও তো বটে।

মি. সেন : হ্যাঁ, তা সে সত্যি, কিন্তু তোমার business টা তো বাঁচিয়ে কাজ করতে হবে। লাভের কিছুটা অংশই তুমি তাদের দিতে পারো, তার বাইরে তো আর নয়। আর তারপর business করতে গেলে সব সময় যে তোমার লাভই হবে, এমন কথা তুমি জোর করে বলতে পার না।…এই যে গতবার আমি some দেড় লাখ টাকার মতো loss দিলুম, কৈ সেটা তো আমি আমার কর্মচারী বা সাধারণ মজুরদের ঘাড় ভেঙে উশুল করিনি। সেই পুজোর সময় bonus-ও দিলুম, দু'মাসের করে ভাতাও দিলুম। বলতে গেলে তো আমার একটা পয়সাও দেয়া উচিত ছিল না, কারণ company loss খেয়েছে। শুনবে

সে কথা! তা লোকসানের ঝুঁকি যদি না নাও তো লাভের অংশই বা পাও কি করে তুমি।...তা সে ভাই অনেক ব্যাপার, business করতে গেলে! সাধারণ লোকে জানে না, বোঝে না, ভাবে বেড়ে লাভ খাচ্ছে বসে বসে কারবার ফেঁদে।...এই তো যুদ্ধ, আর কদিনই বা আছে, দেখ না ফেটে সব দরজা হয়ে যাবে businessman-দের। এই যে দেখছ inflated currency, ফেটে একেবারে চুপসে যাবে তখন বেলুনের মত।

কবি: যা হোক মিটিয়ে ফেল ঝামেলা।

মি. সেন: হ্যাঁ, মিটোতেই হবে, উপায় কি! ষোল লাখ টাকার contract, মাত্তর কটা দিন বাকী আছে— কি বিশ্রী position বল তো।...হত না, কক্ষনো এতটা develop করত না যদি আমি কলকাতায় থাকতুম। কর্মচারীগুলোও হয়েছে তেমনি বুদ্ধু, করব কি। এদিকে মাসের ভেতর পাঁচবার করে আমাকে ইল্লি-দিল্লি করতে হয়েছে।

কবি: খুব tour করতে হয় তো?

মি. সেন: Tour কি ভাই, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। কানের মধ্যে এখনও propeller ভোঁ ভোঁ করছে।

কবি: কি সব সময়ই planeএ?

মি. সেন: জরুরী সব war contracts—কত swiftly move করতে হয়! আর এ একদিন দু'দিন না, লেগেই আছে। ঐ চলছি, কোথায় দিল্লী, কোথায় বম্বে, কোথায় মাদ্রাজ, কোথায় করাচী। ওপর দিয়ে আসি ওপর দিয়ে যাই। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

কবি: শুধু ধোঁয়া, আচ্ছা ধোঁয়ার ভেতরে মাঝে মাঝে আগুন দেখতে পাও না?

মি. সেন: আগুন!

কবি: হ্যাঁ।

মি. সেন: মানে you mean fire.

কবি: Yes yes.

মি. সেন: No...not even now, perhaps I don't like to.

▭ ▭ **অন্ধকারে পটক্ষেপ** ▭ ▭

।।।।।।।।।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।।।।।।।।।

আধুনিক হাল ফ্যাশনের একখানি পরিচ্ছন্ন ড্রয়িংরুম। সুচিত্রা চুপটি করে বসে আছে এক কোণের একটি সোফায়। দূরে রেডিয়োগ্রামে জনৈক বিখ্যাত বিদেশী সুরকারের একখানি রেকর্ড বাজছে। ঘরটা ছায়াচ্ছন্ন— নিস্তব্ধ। নিবিষ্ট মনে বাজনা শুনছে সুচিত্রা। যন্ত্রসংগীতের শেষ অনুরণন তখনও মিলিয়ে যায়নি। সুচিত্রা হাতের ওপর গালটা চেপে বুকের ভেতর মুখ গুটিয়ে বসল।

হন্তদন্ত হয়ে মি. সেনের প্রবেশ।

মি. সেন: So you are here, খেতে গেলে না যে!

সুচিত্রা: শরীরটা ভাল নেই।

মি. সেন: আচ্ছা! উঁ, বেলা দশটা এগারোটা নাগাদ তো ভালই ছিলে। তারপর হঠাৎ...টেবিলে গিয়ে একবার বলতেও তো পারতে।

সুচিত্রা: বললুম না!

মি. সেন: ও, শরীর খারাপ।...তা হঠাৎ এত কি খারাপ হল শরীর যে...

সুচিত্রা: এত অত বুঝি না। ভাল লাগল না, গেলুম না।

মি. সেন: Say that, স্পষ্ট করে বললেই পার সেটা ভাল লাগল না। মাঝখানে শরীর-টরীর বলে কি সব বাজে excuse দেখাচ্ছ।

সুচিত্রা: হ্যাঁ, শরীর খারাপ বলেই ভালো লাগল না। —তুমি কি জেরা করছ আমায়—।

মি. সেন: ও শরীর-টরীর সব বাজে কথা— আসলে মনটাই তোমার ওই রকম। থাকে থাকে হঠাৎ আপনা থেকেই একটা vicious circle সৃষ্টি করে বসে। Get rid of that সুচিত্রা, I tell you honestly, এই রকম করতে করতে একটা অসুখ বিসুখ দাঁড়িয়ে যেতে পারে তুমি জান!

সুচিত্রা: সেই ভাবনায় তো আর তোমার ঘুম হচ্ছে না।

মি. সেন: না, ঘুম হলেও—মাঝে মাঝে ভাবি কথাটা।

সুচিত্রা: ধন্যবাদ।

মি. সেন: আহা, ছুড়িয়েই বা কি আনন্দ এই স্তুতিবাদ! প্রত্যেকটা expression of appreciation

যেন ক্রিকেট বলের মত spin করতে করতে আসে। ...আচ্ছা, সুচিত্রা! আমার পিঠের চামড়া কতটা পুরু বলে তোমার ধারণা?

সুচিত্রা: যথেষ্ট স্থূল। এবং সেটা তুমি ভালো করেই জান।

মি. সেন: উঁ?

সুচিত্রা: জানো বলেই লাগবার chance আরও কম—প্রত্যেকটা জিনিসই rationalise করে নিতে তোমার অসুবিধে হয় না।

মি. সেন: এতটা ভেবেছ নাকি আমার সম্বন্ধে! চমৎকার তো! সত্যি! কী অসাধারণ insight তোমার, মাঝে মাঝে আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাই। আচ্ছা সুচিত্রা, তুমি একেবারে আমার অন্তর পর্যন্ত দেখতে পাও, না?

সুচিত্রা: আমার দরকার! ...আর, তোমার অন্তর দেখতে পাব আমি?

মি. সেন: কেন বড্ড অন্ধকার বুঝি? সব কালো কালো। নজর চলে না, না ঘেন্নায় তাকাতে পার না?

সুচিত্রা: যে কারণেই হোক। বিষয়টা কোনদিক থেকেই খুব একটা গৌরবের নয় তোমার পক্ষে।

মি. সেন: তোমার কাছে আমার আবার অগৌরবের ভয়।

সুচিত্রা: হ্যাঁ। কিন্তু সেটা আদৌ সৌজন্যবোধ থেকে নয়,—

মি. সেন: তবে কী থেকে?

সুচিত্রা: Utter callousness থেকে,— কেনা বাঁদী-দের সম্পর্কে slave owner দের যে মনোভাব হয়, সেই থেকে। মানে তোমার সম্পর্কে আমি যাই ভাবি না কেন, তাতে করে তোমার এতটুকু এসে যায় না। আমার কাছে তুমি যে অগৌরবের ভয় কর না বলছ সেটাও এই কারণেই। Nothing else.

মি. সেন: As if it could have been otherwise! হুঁ, খিদেটা দেখছি তোমারও আমার কারখানার মজুরদের মত। আরে বাবা, first deserve it—ভিখিরীর মত শুধু 'পেলাম না' 'পেলাম না' করে কাঁদুনি গাইলে তো আর হয় না!

সুচিত্রা: দেখ, এতটুকু করুণা করবার অবকাশ তো আমি তোমাকে দিইনি! খামখা তুমি কার ওপর মেজাজ দেখাচ্ছ? দানবীর মহত্ত্বের প্রত্যেকটা অভিব্যক্তিই আমার কাছে ঔদ্ধত্য মনে হয়। Deserve it!

মি. সেন: ও, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলছ বুঝি?

সুচিত্রা: না না— আঙুল ফুলে কলাগাছ হবে কেন Mr. Sen.

মি. সেন: আভিজাত্যে ঘা পড়েছে বুঝি!

সুচিত্রা: হ্যাঁ রক্তের কৌলীন্য আমি দাবী করি না। কিন্তু তাই বলে মানসিক সংগঠনের অভাব ঘটবে কেন?

মি. সেন: সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তো নিজে খাবে না বলে একটিবার টেবিলে গিয়ে বসতেও পারলে না। কী সংগঠন মনের! চমৎকৃত হতে হয়।... তুমি না Hostess?

সুচিত্রা: কক্ষনো না।

মি. সেন: এ তোমার দায়িত্ব এড়াবার কথা।

সুচিত্রা: একটা নরক পরিপোষণের দিকে থেকে দায়িত্ব কথাটা খাটে না।...আমার আর কথা বলতে ভাল লাগছে না!

উঠে দাঁড়ায় সুচিত্রা।

মি. সেন: আচ্ছা, সাবিত্রীর ওপর তোমার এত হিংসে কেন বল তো?

সুচিত্রা: হিংসে! আমি হিংসে করব সাবিত্রীকে?

মি. সেন: তবে Do you take her to be your rival?

সুচিত্রা: না। I don't think of her at all. আমি ভাবি তোমার কথা।...Resurrection and the life!

মি. সেন : Bible আওড়াচ্ছ নাকি ?

সুচিত্রা : You must live.

মি. সেন : I don't hope to die.

সুচিত্রা : Savitri must go. You must live ·· must I live !!

মন্ত্রচালিতের মত বেরিয়ে গেল।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ **পটক্ষেপ** □ □ □ □ □ □ □ □ □

তৃতীয় অঙ্ক / ১ম দৃশ্য

কারখানা সংলগ্ন একটা চায়ের দোকান। দোকানের সামনে উনুনের ওপর বসানো প্রকাণ্ড একটি কলাই করা কেটলির মুখদিয়ে হুস্ হুস শব্দে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অনর্গল। কর্মক্লান্ত শ্রমিকেরা সামনের একখানি ভাঙা বেঞ্চে বসে আসন্ন ধর্মঘটের কথা জোর গলায় আলোচনা করছে। কেউ কথা বলছে, কেউ বা মাটির ভাঁড়ে করে গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছে। কেউবা চুমুক দিতে গিয়ে মুখ তুলে একটা পাল্‌টা জবাব দিতেও ছাড়ছে না।
পেতলের বোতাম লাগানো একটা খাকি ছেঁড়া কোট পরে একটা রোগা বুড়ো মতো লোক চা তৈরী করছে। আর হাফ প্যাণ্ট পরা নাদুস-নুদুস একটা কালো ছেলে চা সরবরাহ করেছ হাতে হাতে. আর বার বার বুড়োর ধমক খাচ্ছে চটপটে না হওয়ার দায়ে।

নগিন : ডেকে নিয়ে রসের কথা···এ বাবা···

বুধাই : চা লায় রে এ বাচ্চা, জলদি।

নগিনকে,— দুটো আঙুল বিড়ি ধরার মতো করে ধরে টান মেরে ইঙ্গিতে বিড়ি দিতে বলে

নগিন : লেই রে ভাই, ডাঁরা, আনাই।

গিট্টু : পণ্ডিতের গর্দানাটা কত মোটা রে···দেখ্ তো শালা বেড়বে কি না !

ওসমান : এই যা যা থাম, খুব হয়েছে।

গিট্টু : কি বলছিস রে !

ওসমান : কি বলছিস্ রে— তুই কি বলছিস্ !

গিট্টু : যা কলা।

ওসমান : যা কোলা কি· যা কোলা কি ? একটা কথা বললেই হল ! কি করেছে বড়বাবু পণ্ডিতের ঘরে।

নগিন : আরে সে কি করেছে তোমায় কি আর দেখিয়ে করবে বড়বাবু ! কি করেছে···কি বলছিস রে তুই ওসমান !

ওসমান : আলটপকা যার তার নামে ওসব কথা ঠিক না।

গিট্টু : আলটপকা, ও শালা এখনও আলটপকা দেখছে। শালা চোখের ওপরে গাড়ী নিয়ে এল, গাড়ী থেকে নামল, শালা পণ্ডিতের ঘরে ভি ঢুকল, তবু বলছে আলটপকা।

ওসমান : ঘরে ঢুকল তুই দেখেছিস !

গিট্টু : আরে আমি দেখিনি পাড়ার বিলকুল লোক দেখেছে···ছোট কচির মাকে তো বিশ্বাস করবি, প্রেমলাল, নগিনের বউ···যা না শুধোবি। বাজে বাত্ বলছিস কেন !

নগিন : এমন দরদ দেখাচ্ছে যেন পণ্ডিতের ও মাগ— শালা আমরা যেন সব ঝুট মুট বকে মরছি।···আর বেশী কি কথা তুই পণ্ডিতকেই শুধোগে যা না।

গিট্টু : শেষকালে ঢুকবি তো ঢোক পণ্ডিতেরই ঘরে, যা শা না।

নগিন : ঐ যে সেই একদিন অফিসে ডেকে নিয়ে

গেললো না, ব্যস, সেই দিনই বিগড়ে গিয়েছে মাথা।

গিট্টু : আরে হাঁ হাঁ ঐ হয়েছে, নইলে এত পীরিত যে শালা শাঁক বাজিয়ে ঘরে তুলে নেয়।

নগিন : মোটা হাতে মেরেছে বাবা মোটা হাতে মেরেছে। পীরিত কি আর এমনি হয়!

ছোট কচি, বুধাই ও প্রেমলালের প্রবেশ।

গিট্টু : ঐ যে ছোট কচি আসছে।

নগিন : এই কচে।

ছোটকচি : কি রে।

নগিন : শোন শোন।

গিট্টু : চারিআপ ম্যান।

ওসমান উঠে দাঁড়ায় যাবার মন করে।

উঠছিস্ কেন· বস বস। শুনে যা ছোট কচি কি বলে, —এই কচে!

কচি : আরে বোল না।…এ বাবা, জলদি…বেশ কড়া করে দিও।

চা দিতে ইঙ্গিত করে।

বুধাই : (নগিনকে) কইরে তোর বিড়ি, চুস শালা…

উঠে দাঁড়ায়।

নগিন : আরে বস না, এই বাচ্চা বিড়ি নিয়ে আয় না …প্রেম, পিলাও না দোস্ত…আছে!

ছোট কচি, টিনের কৌটো খুলে সকলকে বিড়ি দেয়।

এই যে· বাবু তো বাবু কচিবাবু। (বুধাইকে) লেঃ· শালা বিড়ি বিড়ি করে হামলে মলো।…ওসমান পেইছিস্।

গিট্টু : হাঁ। এইবার হয়ে যাক মোকাবিলা।

কচি : কি মোকাবিলা।

নগিন : আরে সেই বড় বাবুর ব্যাপারটা রে। ওসমান শালা বিশ্বাসই করছে না।

কচি : কেন এয়েছেলো তো! ওসমান জানিস না।

গিট্টু : ও শালা খবরই রাখে না তার; আবার বললে বলে দুস ও মিথ্যে কথা, লাও।

ওসমান। না সে আসতে পারে, তবে পণ্ডিতকে নিয়ে যে কথাটা বলা হচ্ছিল সেটা ঠিক না।

গিট্টু : এখন বলছে আসতে পারে।

ওসমান : হাঁ। তা সে না হয় হল, কিন্তু ডেকে নিয়ে রসের কথা, শাঁক বাজিয়ে ঘরে তুলে নিয়েছে, তারপর মোটা হাতে মেরেছে— এই সব কথায় আমার আপত্তি আছে।

গিট্টু : আরে সে কে বলছে, তুই যে বলছিস বড়বাবু পণ্ডিতের ঘরেই ঢোকেনি।

ওসমান : এই ঝুটমুট বলিসনি। তুই বলিছিস, নগিন বলেছে; এই তো বুধাই ছিল বলুক না, বুধাই!

বুধাই : আমি বাবা নেই এর মধ্যে।

ওসমান : বললেই হল একটা কথা। পণ্ডিত শালা খেটে মরছে তোদেরই জন্য আর…খারাপই যদি লাক হবে পণ্ডিত তো ইউনিয়ন পাঠায় কেন পণ্ডিতকে?

নগিন : আরে ও ভি তো আমারও কথা· পাঠায় কেন ইউনিয়ন পণ্ডিতকে।

ছোট কচি : এ কি কথা বলছিস রে, ইউনিয়ন পাঠায় কি রে!

নগিন : ইউনিয়নই তো পাঠিয়েছে।

ছোট কচি : আরে হ্যাঁ হ্যাঁ· কপচাস্‌নি মেলা।… ইউনিয়ন পাঠিয়েছে…কোন ইউনিয়ন…তোদেরই তো ইউনিয়ন!!

ওসমান : সে ইউনিয়নে তুই নেই· গিট্টু নেই?

নগিন : সে তো আছি।

ওসমান : তবে, ইউনিয়ন ইউনিয়ন করছিস। ইউনিয়ন কি তোদের বাদ দিয়ে নাকি!… তো ছিলি তো তোরাও, পাঠালি কেন?

নগিন : সে তো তুইও ছিলি, ছোট কচি ছিল, বুধাই ছিল, শুধু কি আমরা?

ছোট কচি : সে কে না বলছে। তবে ঝুটমুট ইউনিয়ন পাঠিয়েছে ইউনিয়ন পাঠিয়েছে বলছিস কেন!… এই রকম মগজ নিয়ে কথা বলবি তার ইউনিয়ন আর কত ভাল হবে!

ওসমান : বেশ তো এয়েছেলো বড়বাবু পণ্ডিতের ঘরে মানলুম, কিন্তু পণ্ডিতের মুখ থেকে একবার শোন্, কি ব্যাপার—কি বলেছে বড়বাবু পণ্ডিতের কানে কানে।

হ্যাঁ তারপর যদি বুঝিস যে না এমন সব কথা বলেছে পণ্ডিত বড়বাবুকে যে তাতে করে ইউনিয়নের বেইজ্জতি হয়েছে, তখন বলতে পারিস্।...তখন সে তুই পণ্ডিত কেন, পণ্ডিতের চোদ্দ পুরুষ তুলে গাল দে না. ওসমান কথা বলবে না। কিন্তু না শুনে মেলে খাম্খা একজনের নামে এই রকম হামলা করার কি কোন মানে হয়?

ছোট কচি : আরে বড়বাবু যে পণ্ডিতের ঘরে এয়েছেলো এ কথা ওসমান হয়তো জানে না, কিন্তু আর সবাই জানে। কিন্তু তাই বলে পণ্ডিত যে বেফাঁস একটা কিছু কবুল করেছে বড়বাবুর কাছে এ কথা তো কেউই বলছে না। তুললে কে এ কথা?

ওসমান : আরে ভাই, কে তুললে কে জানে. আমি তো নগিনের মুখে এই প্রথম শুনলাম।

ছোট কচি : নগিনটা ঐ রকম।

নগিন : নগিন কি রে. গিট্টুই তো আমায় বললে।

গিট্টু : এই শালা, ডেকে লিয়ে রসের কথা কে বলেছে।

নগিন : যাগ গে বাবা ঘাট হয়েছে।...সবাই চুপচাপ থাকে আর আমি শালা মুখ খুললেই মুস্কিলে পড়ি।...আজ ছোট কচি খুব একহাত আমায় নিলে, লে বাবা লে, কিন্তু কাল রাতে মঙ্গল মিস্ত্রী যখন পণ্ডিতের নামে ওর কাছে কত কথা বললে সে বেলা কিছু হল না। আমি তো বাবা সেই কথাই বলিছি। মিথ্যেই যদি হবে তো ছোট কচি তখন মঙ্গল মিস্ত্রীকে দু'কথা শুনিয়ে দিলেই পারতো। আমরাও সমঝে যেতুম। তখন তো দেখি রা কাড়লে না ছোট কচি।

ছোট কচি : ছোট কচি কি বলবে তখন। আর মঙ্গল মিস্ত্রীকে কি তোকে নতুন করে চেনাতে হবে!

ওসমান : শালা একের নম্বর বিলাক্ লেগ্ ও শালা আসে কেন এখানে!

ছোট কচি : আসে কেন—কাজে আসে। সে বোঝ না! কিন্তু সে দু'কথা বলে গেলেই শালা তোমার আমার যদি মাথা ঘুরে যায় তো ইউনিয়নে আছি কেন! সে ত বলবেই।

গিট্টু : নগিনটা বড় কান পাতলা।

নগিন : যা শালা তুইও তো সায় দিচ্ছিলি এতক্ষণ।

গিট্টু : সায় দিচ্ছিলি এতক্ষণ...ঐ জন্যই ওসমান দেখি সব সময় শালা মুখ গোমড়া করে আছে!...যাক ভাই কিছু মনে করিসনি ওসমান।

ওসমান : যাক যাক ঢের হয়েছে, আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। ও সে কার কথায় কে কি ভাবল আর বললে,...আরে শালা এই যদি করবে তো লড়বে কখন! দিল্লাগির সময় এটা! আর দুরোজ বাদে কারখানায় ধর্মঘট করতে যাচ্ছিস তোরা! লজ্জা করে না!

নগিন : ধর্মঘট করবো তার আবার লজ্জা কিসের?

ওসমান : ধর্মঘট করবো, মুখে তো দেখি কিছুই আটকায় না।...শালা এই হিম্মত নিয়ে ধর্মঘট করবে! ভেসে যাবে, বুঝলে ভেসে যাবে। ঐ মঙ্গল মিস্ত্রী এসে একটি ভাঁওতা মারবে আর দেবে ফাঁসিয়ে বিলকুল।

গিট্টু : আরে রাখ রাখ ভাঁওতা মেরে ফাঁসিয়ে দেবে সব সমঝী!

ছোট কচি : দেবে কি দিয়েছে তো। এই দ্যাখ না কাল রাতে মঙ্গল মিস্ত্রী এসে একটা চাল মেরে গেল, আর অমনি তোরা তার কথামত আজ ইউনিয়নের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস ; চাপাচ্ছিস কি না উত্তর দে ! তো ফাঁসাবে না কি বলছিস !

গিট্টু : আরে ওটা তো কথার পিঠে কথা, তাই বলে কি আর সত্যি সত্যি বলিছি।

ওসমান : হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা তুমি ঠিক করেছ যাও, ঠিক করেছ। এই করে ধর্মঘট বানচাল হয়ে যাক, তার-পর বলো আমরা কি আর সত্যি সত্যি বানচাল করিছি।

নগিন : ধর্মঘট বানচাল করার কথা ওঠে কিসে রে, খুব...ঐ পিসিমা পিসিমা ভাব দেখাসনি ওসমান বলছি। শালা ইউনিয়ন তোর, ইউনিয়ন আমারও আছে।

ওসমান : আরে হাঁ হাঁ রোয়াবী মারিস না বেশী নগিন। ইউনিয়ন তোর তো বেইজ্জতি করিস কেন ইউনি-য়নের। মঙ্গল মিস্ত্রীর কথা মতো পণ্ডিতের নামে যা তা বলিস কেন ? পণ্ডিতের নামে একটা খারাপ কথা বললে যে ইউনিয়নেরই ইজ্জত চলে যায়, এই কথা বুঝিস না কেন ?...বাইরের লোক কে কি বলেছে সেই কথামত তুই ঘরের মা-বোনের ইজ্জত যাচাই করবি ! বোল !

নগিন : বড় বেশী বাড়াচ্ছিস ওসমান। এটা ঠিক না... নগিন বেইমান না।

ওসমান : তো করিস কেন বেইমানি !

নগিন : কে বেইমান, তুই চুপ কর। একদম চুপ...

ওসমান : হাঁ হাঁ তো লে লে (বড় একটা চাকু ফেলে দেয় নগিনের সামনে) লে, দেখা দে আব ইমান... লে, মার, মার— নিজের গলাটা এগিয়ে দেয়।

নগিন। বেইমান—ন—ন—ন। কেঁদে ফেলে।

ঈশ্বর পণ্ডিতের প্রবেশ। মাথায় পট্টি বাঁধা, হাত গলায় ঝোলানো। সঙ্গে দু-তিন জন সহকর্মী মজুর।

ছোট কচি : আরে পণ্ডিত তুমি...

ঈশ্বর : এই যে।

ছোট কচি : তুমি, এ কি, কি হল কি ?

ঈশ্বর : (চা চায়) এ বাবা...থোড়াসে...উঁ, কি জানি বাবা কাল রাতে কারখানা থেকে বাড়ী ফেরবার পথে পেছনে থেকে এসে কে যেন লাঠি চালালো, (পট্টি দেখিয়ে) এটা তেমন কিছু না, হাতটাই চোট খেয়েছে জোর। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতেও পারলাম না— তা দুটো হাঁক ডাক করতেই দেখি দৌড়ে পালিয়ে গেল লোকটা।...বাজে বদমাইস টদমাইস হবে...তারপর এখানে গোলমালটা কিসের ?

ওসমান : বলছি, তারপর শুনি তোমার ঘরে নাকি কাল বড়বাবু এয়েছেলো ?

ঈশ্বর : আরে হ্যাঁ সেই কথাই তো বলতে এলুম।...বড় বাবু এল,...শুধু এল, গাড়ী চড়িয়ে আবার কার-খানায় নিয়ে গেল ! তারপর কথায় কথায় সেখানে বাধল ঝগড়া, আমি রাগ করে বেরিয়ে এলুম...বাড়ী

বলবো সরকার বাহাদুর, আপনারা বলবেন জিন্দাবাদ।

—সরকার বাহাদুর...

জিন্দাবাদ। মুর্দাবাদও শোনা গেল।

ন্যাশনাল ফ্যাক্টরী—

তুমুল হট্টগোল।

মি. সেনের বাবা, মি. সেন, কবি, মিসেস সেন ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বেরিয়ে এলেন খিলেনের পথ ধরে। পেছনে পেছনে এল মঙ্গল মিস্ত্রী আর কিছু শ্রমিক। ভেতরে তুমুল হট্টগোল চলছে। পণ্ডিত লাফিয়ে ওঠে ডায়াসে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলতে থাকে। ডায়াসের ওপর তখনও কিছু নিম্নপদস্থ বাবু কর্মচারীরা বসে থাকেন।

পণ্ডিত : ভাঁইয়োঃ বহুৎ আপশোষ কি বাত ইয়ে হ্যায় কি...শুনিয়ে ভাইয়োঁ...

ভীষণ চিৎকার। লাঠিসোঁটা উঁচিয়ে কারা যেন পণ্ডিতকে আক্রমণ করতে যায়, দেখা যায়। ঢিল মারছে কারা যেন পণ্ডিতকে। পণ্ডিত হাত তুলে সেগুলো রুখছে আর চেঁচাচ্ছে।

আরে বাবা এয়সা গোলমাল করনেসে কুছ শুনা নেহী জায়েগা।...মোখালিফ পার্টি কি তরফসে সব কুছ বোলা গিয়া, আব হামারি তরফসে কুছ বোলনেকা মৌকা দো। ...শুনিয়ে ভাইয়োঁ, মারপিট করনেসে কিসিকা ফায়দা নেহি হোগা...ভাইয়োঁ শুনিয়ে (হাত জোড় করে) ময় হাত জোড় কর আপ লোগোঁসে আরজ করতাহুঁ...বৈঠ যাইয়ে আপলোগ ...ভাইয়োঁ শুনিয়ে...

কয়েকজন মজুর ডায়াসের ওপর লাফিয়ে উঠে পণ্ডিতকে ঘিরে দাঁড়াল। গোলমাল তখনও চলছে।

▭ ▭ **অন্ধকারে পটক্ষেপ** ▭ ▭

। । । । । । । । । । **তৃতীয় দৃশ্য** । । । । । । । । । ।

মি. সেনের অপিস ঘর। মি. সেন অনুপস্থিত— চেয়ার টা শূন্য পড়ে আছে। লাঞ্চ থেকে এখনও ফিরে আসেন নি। শুধু ম্যানেজার রেবতী ঘোষ ও মি. মুখার্জী সেন সাহেবের ঘরে বসে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করছেন।

মি. মুখার্জি : কী কাণ্ড বলুন !...এইবার দেখুন কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। হুঁঃ।

রেবতীবাবু : তা সে তো আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম, এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। শুনলেন কৈ আপনারা !

মি. মুখার্জি : কি শুনলেন কৈ, আমি বলিনি ! বলিছি কি না বলুন না আমি আপনাকে। ...তা আপনি তখন একটা কথাও বললেন না, স্রেফ হুঁ দিয়ে গেলেন সাহেবের কথায়। এখন সামলান তাল. ম্যানেজার হয়েছেন !

রেবতীবাবু : কি, আমি এর ভেতরে নেই। সে বুঝবেন আপনি আর সাহেব।

মি. মুখার্জি : ওঃ. খুব যে বলে নিচ্ছেন আড়ালে ! হাঙ্গামাটা বাধুক না একবার দেখি।...আরে মশাই হাজার হলেও যুগের হাওয়া গেছে পালটে ; ঝট্ করে এখন একটা কাজ খেয়াল মাফিক করে ফেললেই কি আর হয় ! আগে হতো, সে দেখিছি দাদামশাইর আমলে জমিদারীতে...এখন প্রতিপত্তি কতো ছোটলোকের !

রেবতীবাবু : কি বলব বলুন ! ম্যানেজারী যা করছি তা তো জানতেই পারছি।

মি. মুখার্জি : কেন টাকা তো ভালই পাচ্ছেন।

রেবতীবাবু : হ্যাঁ, টাকা পাচ্ছি বটে, কিন্তু তাই বা কৈ ! ছ-সাত শো টাকা কি আবার টাকা নাকি এই বাজারে। এক এই কলকাতার সংসারে খরচ যোগাতেই আমার চার-পাঁচ শো টাকা বেরিয়ে যায়। তার ওপর আবার দেশের সংসার আছে, নিজের পকেট খরচা বাবদও কিছু টাকার দরকার হয়... পোষায় কি করে বলুন ?

মি. মুখার্জি : কেন, সাত শো টাকা তো আপনার এলাওয়েন্স টেলাওয়েন্স ধরে মাইনের মধ্যেই পড়ল। কিন্তু তার ওপর কমিশনটা যোগ করুন।

রেবতীবাবু : কি, whole sale-এর ওপর। সেটা পেলে তো চুকেই যেত ল্যাঠা। কিন্তু দিচ্ছে কে।

মি. মুখার্জি : কেন, এইবার হয়ে যাবে।

রেবতীবাবু : হ্যাঁ হচ্ছে! আজ না কাল করতে করতে হচ্ছে তো আজ এক বছর ধরে।···আর হলে আপনিও তো পাবেন।

মি. মুখার্জি : আশা তো রাখি। এখন···আচ্ছা দিচ্ছে না কেন বলুন তো এখনও।

রেবতীবাবু : হাড়কেপ্পন, দেখছেন কি। টাকা কি সহজে ছাড়তে চায়! দিতে একেবারে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর কলজে ফেটে যাচ্ছে।

মি. মুখার্জি : দেবে দেবে, এইবার দিয়ে দেবে। এই তো সেদিনও নানান কথা হচ্ছিল সাহেবের সঙ্গে···

রেবতীবাবু : তাই নাকি?

মি. মুখার্জি : হ্যাঁ, তা সে এ সব কথা না, ওদিকে খুব হুঁশিয়ার, হুঁ ; কথা হচ্ছিল এমনিই সব ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে···মন্দ বলছিল না···বেশ বোধ আছে লোকটার মশাই!

রেবতীবাবু : তা আছে, এমনিতে যাই বলি না কেন, লোকটার···দেখিছি তো!

মি. মুখার্জি : আচ্ছা রেবতীবাবু!

রেবতীবাবু : উঁ।

মি. মুখার্জি : আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করছিলাম···

রেবতীবাবু : কি?

মি. মুখার্জি : আচ্ছা সাহেবের পারিবারিক জীবনটা কি রকম! কথায়-বার্তায় বেশ মনে হল সেদিন যেন কোথায় একটা কাঁটার মত বিঁধে আছে। ঠিক বুঝতে পারলুম না।

রেবতীবাবু : কেন জানেন না···ওর স্ত্রী তো শুনি পাগল!

মি. মুখার্জি : পাগল! আপনি ঠিক জানেন?

রেবতীবাবু : ঠিক মানে...

মি. মুখার্জি : আমার কিন্তু মনে হয় ওটা ঠিক নয়।

রেবতীবাবু : তা হলে আপনিও ধরেছেন ব্যাপারটা।

মি. মুখার্জি : না, ধরিছি মানে···এই তো সেদিনও দেখলুম মশাই বউটাকে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। বেশ ধীর স্থির, পাগল বলে তো ঘুণাক্ষরেও মনে হল না।

রেবতীবাবু : ঠিকই ধরেছেন। বউটি পাগল একেবারেই নয়, সাহেবই ওকে পাগল সাজিয়ে রেখেছে। ঐ যে কে এক সাবিত্রী দেবী আছেন না, কবিপত্নী··· হচ্‌পচ্‌ ব্যাপার মশাই সব বড়লোকের আর বলব কি! এমন সুন্দর বউ থাকতে···হুঁঃ।

মি. মুখার্জি : কবি— বন্ধুটি খুব এক্সপ্লইট্‌ করছে, না?

রেবতীবাবু : এখন যে কে কাকে এক্‌স্‌প্লইট্‌ করছে বলা মুস্কিল। কবিই সাহেবকে ঠকাচ্ছে, না সাহেবই কবির মাথায় হাত বুলোচ্ছে··· any way ব্যাপারটা খুব unholy লাগে আমার কাছে।

নকড়ির প্রবেশ।

নকড়ি : তারপর গেলেন কোথায় সাহেব?

মি. মুখার্জি : একটু বেরিয়েছেন। হয়তো লাঞ্চ সেরে আসবেন।

রেবতীবাবু : তা গিয়েছেনও তো অনেকক্ষণ হল।

নকড়ি : অনেকক্ষণ! কতক্ষণ, আধ ঘন্টা?

মি. মুখার্জি : হ্যাঁ তা হবে, আধ ঘন্টার বেশীই হবে।

নকড়ি : অ, তা হলে এক্ষুনি এসে পড়বেন।

রেবতীবাবু : হ্যাঁ, এই এলেন বলে আর কি। তা তাড়া কিসের এত, বসো না।

নকড়ি : না তাড়া মানে— আ[illegible] না তাড়ালেই বসি।

রেবতীবাবু : বসো বসো, তোমায় তাড়াবো আমি! কোম্পানীর লক্ষ্মী পেঁচা হয়ে বসে আছ তুমি··· নাও সিগারেট খাও।

কেস খুলে ধরেন।

মি. সেনের প্রবেশ। সকলে হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

মি. সেন : বসুন বসুন।...তারপর নকড়ি।

সকলের আসন গ্রহণ।

নকড়ি : ওদের সব নিয়ে এসেছি।

মি. সেন : উঁ, হুঁ— শুনছি সব, বসো

সিগারেট ধরায়।

মি. মুখার্জি : (রেবতীবাবুকে) আমি আসছি। (নকড়িকে) আপনি একটু শুনবেন।

নকড়ি : আমাকে বলছেন! অ—

মি. মুখার্জি ও নকড়ির প্রস্থান।

মি. সেন : রেবতীবাবু, আপনি নিশ্চয়ই যাচ্ছেন না এক্ষুনি।

রেবতীবাবু : না।

মি. সেন : একটু বসে যান kindly.

মি. সেন : এখন yesterday-র কথা বলছি আমি, কালকে after the announcement আমরা তো চলে গেলুম...তারপর কারখানায় শুনলুম গণ্ডগোল হয়েছিল। আপনি খবর রাখেন!

রেবতীবাবু : আমিও অবিশ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিছলাম, তবে ব্যাপারটা খানিকটা জানি।

মি. সেন : কি সেটা বলুন আমায়! এ যে দেখছি যাই করো কিছুতেই নিস্তার পাবার যো নেই। বেটা-চ্ছেলেদের কৃতজ্ঞতা বলে কি কোন বোধ নেই, দু-মাসের bonus declare করলুম! হুঁ, ব্যাপারটা কি শুনি।

রেবতীবাবু : ব্যাপারটা মানে পণ্ডিতদের যে একটা পালটা দল আছে, সে তো আপনি জানেনই। এখন ওদের ইচ্ছে ছিল যে বোনাস বাদেও, ...কিছু দিন আগে ওরা যে কতকগুলো দাবী-দাওয়া করেছিল না···

মি. সেন : দাবী-দাওয়া দেখুন আমি সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি এবারে। হ্যাঁ, তারপর···

রেবতীবাবু : তা ভেবেছিল যে এই সঙ্গে তার কিছুটা অন্তত বুঝে নেয়। কিছু মঙ্গল মিস্ত্রীর দল নাকি সে কথায় রাজী হয়নি···এই আর কি গণ্ডগোল। ওরা বলে ধর্মঘট করতে হবে, আর এরা বলে তা হয় না। শেষ পর্যন্ত শুনলুম বেশীর ভাগ মজুরই ধর্মঘটের পক্ষপাতী নয় বলে আপাততঃ ধর্মঘটের ব্যাপারটা নাকি ইউনিয়ন বাতিল করেছে! এই··· তা হাঙ্গামা যা হয়েছে এইটুকুই।

মি. সেন : না শুনলুম লাঠি-সোঁটা চলেছে।

রেবতীবাবু : লাঠি হয়তো এনেছিল কেউ কেউ, কিন্তু খুন-জখম তো জানি কেউই হয়নি। আর বেটাদের কথা বলবার ধরণটাই এই রকম যেন সব সময় যুদ্ধ করছে মনে হয়। সাম্যভাব তো কখনই দেখলুম না।

মি. সেন : তা হলে ধর্মঘটের ব্যাপারটা যে ইউনিয়ন বাতিল করছে, এটা পাকা খবর তো?

রেবতীবাবু : আমি তো যতদূর জানি পাকা খবর বলেই জানি, এখন··· আজকে অবিশ্যি আরও খবর পাব।

মি. সেন : যা হোক নিজেদের সুবুদ্ধিতে যদি বাতিল করে তবেই ভাল। নইলে ধর্মঘটের হুমকি কিন্তু আমি কিছুতেই সহ্য করব না এবার, এ আমি বলে দিচ্ছি। আপনি দেখুন ব্যাপারটা কি। Any sort of action which hampers the cause of the company must be ruthlessly dealt with. Of course unnecessary provocation যেন কোন ক্ষেত্রেই দেওয়া না হয়। মুখুজ্জেকে এ বিষয়ে আপনি একটু সাবধান করে দেবেন। Threatening always must be the means to an end—এটা ভুললে চলবে না। যান, আপনি দেখুন।

নকড়ির প্রবেশ।

নকড়ি : ওদের সব নিয়ে এয়েছি, ভেতরে আসবে?

মি. সেন : হ্যাঁ, ভেতরেই আসতে বলো, আর মুখুজ্জেকে এখানে আসতে বারণ করে দাও। They may be somewhat prejudiced by his presence. ভাবতে পারে আবার হয়তো মারবে ধরবে। রেবতীবাবু একটু বসে যান।

নকড়ির প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ; সঙ্গে আট দশ জন ময়লা কাপড়ে মাথা ঢাকা ত্রস্ত মজুর।

নকড়ি : এই যে, আও ভিতর আও। উধার যাকে ঠারো। বাবু তুমসে বাত-চিত করেগা। ···যাও, উধার যাকে বৈঠ, হুঁ, যাও উধার, একদম উধার...

জনৈক শ্রমিক : হাঁ বাবা।

মি. সেন : তুমহারা সর্দার কোন্ হ্যায়?

নকড়ি : বোলো, পুছতা হ্যায়। যাড় রুরো।

জনৈক বৃদ্ধ শ্রমিক। সর্দার তো কোই নেহি হ্যায় সরকার। হাম লোগ তো এসেছি···

মি. সেন : তুমহারা নাম কেয়া হ্যায়।

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী!

মি. সেন : নাম কেয়া হ্যায় তুমহারা?

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী হামারো নাম রামখেলন।

মি. সেন : রামখেলন।

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী হ্যাঁ।

মি. সেন : ঘর কাঁহা?

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী দারভাঙ্গা।

মি সেন : দারভাঙ্গা জিলা, কাঁহা?

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী চিকড়িঘাট।

মি. সেন : চিকড়িঘাট, নয়া সড়ক সে কেত্তি দূর?

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী পঁচিশ মাইল।

মি. সেন : পঁচিশ মাইল।

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী হাঁ।

মি. সেন : নয়া সড়কসে পচ্চিম তরফ?

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী হাঁ পচ্চিম তরফ, (সঙ্গীদের প্রতি) সরকার তো সব জান্তেহি হ্যায়।

ক্ষীণ হেসে সায় দেয় সব।

মি. সেন : ঔর, ইন লোগোঁকা···

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী সরকার কোই কো জিলা দারভাঙ্গা, ঔর কোই কো ছাপরা জিলা—

মি. সেন : সব বিহার কা আদমী হ্যায়?

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী সরকার বিহার।

মি. সেন : উঁ...আচ্ছা আব তুমহারা কেয়া কাম করনেকা মতলব হ্যায় ইয়া নেহি?

বৃদ্ধ শ্রমিক ও আর দু-একজন : আপহি কা কৃপা হ্যায় জী সরকার।

মি. সেন : কৃপা হো তো কাম করোগে তো?

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী হাঁ সরকার, কামকে লিয়ে হাম সব তো তৈয়ার হ্যায়, লেকিন···

মি. সেন : লেকিন কেয়া, হাম তুম লোগোঁকো ফির কাম দেগা। খিলানেওয়ালা তো চাহাতা মগর ছিনলেনেওয়ালাকে সাথ তো অলগ ব্যবহার করনা পড়তা হ্যায়। ঠিক হ্যায় তো?

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী হ্যাঁ সরকার, ঠিকই বাত হ্যায়।

সমস্বরে : ঘাট হো রাজাজী, হামলোগ ঔর কভি কুছ নেই বোলেগা।

মি. সেন : তুম কবল মাজরাহা, বালটি মাজরাহা বাত্তি মাজরাহা— উ তো হাম সব মান লিয়া। মান লিয়া কেঁও কি ইয়ে চীজ নেই মিলনেসে তো কামকা বহুৎ অসুইন্তা হোতা হ্যায়। ব্যস, উ মান লিয়া তো ফিন তুম নয়া দাবী পেশ কর দিয়া—কেঁও কি মজুরী বঢ়ানা চাহিয়ে। ইয়ে কেয়া বেইমান নেমকহারামকো কাম নেহি হ্যায়? ঔর ইস লিয়ে তুম লোগ বিলকুল মজদুরোঁকে বোলতে রহে কি কোম্পানীকা কাম ছোড় দেও— ইয়ে কেয়া ইমানদারী হ্যায়?

সমস্বরে : কসুর মাফ কিজিয়ে সরকার।

মি. সেন : কেত্তি দফে হাম তুম সর্দার লোগোঁকো বোলা হ্যায় কেয়া ইয়ে অর্ডার ঠিক ঠিক supply করোগে তো কোম্পানীসে লেবারকো বহুৎ বকশিস্ মিল যায়েগা। ব্যস শুনাই পড়তা নেহি। উ যব মিলেগা তব মিলেগা, মগর মজুরী বঢ়ানেকে লিয়ে যো দাবী পেশ কিয়া হ্যায় আবভি উ মান লেও তুম, —মতলব ইয়ে থা কি নেহি?

সমস্বরে : কসুর মাফ কিজিয়ে সরকার, ঔর কব্ভি এইসা না হোগা। গোড় লাগতাঁ হু মেরে রাজা।

মি. সেন : আব দেখো, মন ঠিক করে লেও। হামরে, ইহাঁ কাম করো তো করো, ঔর নেই তো দুসরি জাগা পর কাম দেখো।···

বৃদ্ধ শ্রমিক : নেহি ও তো ঠিক বাত হ্যায় জী সরকার। হামকো কুছ ভি কাম দিজিয়ে কৃপা করকে। উ তো করনাই হোগা,— ঔর দুসরি জাগাপর হামকো কোন্ কাম দেগা সরকার।

মি. সেন : দেখো গোলমালওয়ালা আদমী হ্যাম নেহি হ্যায়। মগর হল্লামচানেওয়ালেকে সাথ হামারা কভি নেহি আপোষ হো সকতা।

বৃদ্ধ শ্রমিক : জী সরকার।

মি. সেন : তো যাও শান্ত হোকে আপনা আপনা কাম করো। সব কুছ আচ্ছা হো যায়েগা…(নকড়িকে দেখিয়ে) ইয়ে বাবুকো সাথ যাও, সব কুছ্ বন্দবস্ত্ কর দেগা।

নকড়ি : মন ঠিক করকে কাম করেগা, অঁা। ইয়ে সরকার, ইন সরকারকি কৃপা সে কমসে কম লাখো আদমীয়োঁকো রোজ ভর পেট খানা মিলতা হ্যায়, ঔর তুম লোগ, কেয়া বোলেগা বাবা তুম তো সব বুদ্ধু আদমী হ্যায়,…তো চলো, চলো!

সকলে গড্ডালিকা প্রবাহে প্রস্থান করে।

মি. সেন : (রেবতীবাবুকে লক্ষ্য করে) বেটারা একেবারে বেপরোরা ভাবে ভুত। এদের আবার ইউনিয়ন, এদের আবার দাবী…silly ideas.

হঠাৎ নেপথ্যে ভীষণ গণ্ডগোল শোনা যায়।

খানিকক্ষণ কান তারিয়ে শুনে।

খুব একটা গণ্ডগোল চলছে বলে মনে হচ্ছে না রেবতীবাবু?

রেবতীবাবু : হঁ্যা, ব্যাপার কি? (উঠে দাঁড়ান। মি. সেনও জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ান) কারখানার বাইরে হল্লা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

মুখুজ্জ্যের প্রবেশ।

মি. সেন : What's the trouble, মুখুজ্জ্যে?

মি. মুখার্জি : কি, আপনি এখন বেরুচ্ছেন নাকি?

মি. সেন : হঁ্যা কেন?

মি. মুখার্জি : একটু বসে যান, গণ্ডগোলটা থামুক।

মি. সেন : গণ্ডগোল থামবে? কেন কি, ব্যাপার কি?

মি. মুখার্জি : নিজেদের মধ্যেই মারপিট করছে বেটারা। মঙ্গল মিস্ত্রীর যেমন সব ব্যাপারেই আগ বাড়িয়ে গিয়ে কথা বলা অভ্যেস— দিয়েছে আচ্ছা করে মার।

রেবতীবাবু : কে, মারলো কারা, পণ্ডিতের দল নাকি?

মি. মুখার্জি : আরে না মশাই, ওর নিজের দলের লোকেরাই ধরে পিটে দিয়েছে। অত খবরদারী সইবে কেন? আরে দল সামলাবি তা কি ঐ করে সামলাতে হয় নাকি— ও বেটা নিজের দলের লোক গুলোকে ধরে পিটবে, মারবে, গালাগালি দেবে, চাকরি বাতিল করবার হুমকি দেখাবে— অতটা কখনও সহ্য করে।

মি. সেন : রেবতীবাবু, এই মাত্তর আমি বলছিলাম না যে unnecessary provocation এর ফল বড্ড খারাপ হবে। হুঁ, আচ্ছা মঙ্গল মিস্ত্রীর এতটা সাহস আসে কোত্থেকে— সাধারণ মজুরদের ওপর এই রকম হামলা করতে তো কেউই তাকে বলেনি! আসল কথা হচ্ছে you want to wash your hands clean of these bothering responsibilities and hope to get it done by some other hand like Mangal Mistrry's. And why— you ought to have interfered in such matters. Job টা কি আপনার, বলুন!

মি. মুখার্জি : যা বলছেন, তাই করছি

মি. সেন : ও যা বলছি তাই করছো! But I ask you why don't you know your own job. যা বলছেন তাই করছি। ধন্য হয়ে গেলুম আর কি! নিজের কোন initiative নেই। দেখছেন চার দিক কারখানায় এখন নানা রকম হাঙ্গামা হচ্ছে…

But you,—you are always waiting for orders to come...you have no right to spoil your soul.' At least I did not teach this lesson. This is 'very unfortunate Mukherjee, very unfortunate.

মি. সেনের প্রস্থান

□ □ □ □ □ □ □ □ **অন্ধকারে পটক্ষেপ** □ □ □ □ □ □ □ □

চতুর্থ অঙ্ক / ১ম দৃশ্য

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ দৃশ্য সজ্জা। চায়ের দোকান— বেঞ্চের ওপর ভিড়টা এখনও ঠিক জমেনি, তবে চায়ের দোকানের ভেতরে লোক ঘুর-ঘুর করছে দেখা যাচ্ছে। একখানা ভাঙা বেঞ্চে চিৎপাত হয়ে শুয়ে কে যেন মিঠে সুরে কাওয়ালী ভাঁজছে। শ্রমের অবসাদ ঝিমিয়ে পড়েছে সুরের রেশ ধরে। চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চে বুধাই ও দু চারজন মজুর— বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে।

বুধাই : (চায়ের দোকানের ভেতরের লোকেদের কথার প্রত্যুত্তরে বুধাই ঝামটা মেরে বলে ওঠে) কে বলেছে কে তোকে শুয়েছিল? শুয়েছিল! শালা আমার চোখের সামনে ঘটল আর আমি জানি না। বাজে বাত্ বলছিস কেন!...কে, সাত জুতোর বাড়ি খাব যদি শালা মিথ্যে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাব।

চায়ের দোকানের ভেতরে একটু হল্লা হচ্ছে। কে যেন ভেতর থেকে উত্তর করে।

জনৈক শ্রমিক : (নেপথ্য থেকে) খাবি!

বুধাই : আলবৎ খাব।...জানে না শোনে না, বাজে রোয়াবী ছাড়ছে।...এ বাবা, জানো মাইরী এমন হারামীর বাচ্ছা শালা।...(দোকানীকে) এ বাবা, বলছে কাজ ছেড়ে দিয়ে গা জুড়োবার আর জায়গা পেলে না! কারখানা কি আরাম করবার জায়গা... এই বলতে না বলতে মেরেছে শালা ঠোকর। ইচ্ছে হচ্ছিল দিই বেটাকে মেসিনে চাপিয়ে— সিককাবাব হয়ে বেরিয়ে আসুক।...দেখছিস্ আঙুলে পট্টি জড়িয়ে ছট্‌ফট্ করছে আর চেঁচাচ্ছে... শেষকালে ঠোকর মেরেও যখন গায়ের জ্বালা গেল না তখন দিলে শালা ছেঁটে, লাও।... নাঃ, আবার বাধালে

গোলমাল বুঝলে ! এ বাবা, এবার শালা এস্পার কি ওস্পার— জানলে !

চার পাঁচ জন লোকের একটা জটলা গড়িয়ে আসে বেঞ্চিটার দিকে।

নগিন : কি চেঁচাচ্ছিস রে ?

বুধাই : কেমন দিয়েছে আজ !

নগিন : কে ?

বুধাই : শুনিসনি !

নগিন : কি, বংশীর ব্যাপার তো ? হুঁ, আরে ও তো বাসি খবর, এ বেলার খবর জানো !

বুধাই : এ বেলার আবার খবর কি রে ?

গিট্টু : আরে খবর তো এ বেলাকার। হপ্তা নিতে যাস্‌নি !

বুধাই : না।

গিট্টু : তো কাল গিয়ে দেখবি।

বুধাই : আরে বল না শালা।

নগিন : দু শিফটে ক ঘন্টা কাজ করেছিলি গেল হপ্তা ?

বুধাই : কেন সবাই যা করেছিল।

নগিন : মরেছো...তিন দিনের মাইনে শালা বিলকুল কেটে নিয়েছে মাইরী, ম্যানেজার বললে কিনা বাইশ ঘন্টা পূরো কাজ হয়নি।

বুধাই : তারপর ?

নগিন : তারপর কেউ হপ্তা নেয়নি, সব চলে এয়েছে রাগ করে। রাত্তিরের শিফ্‌টে কাজ ছিল যাদের তাদেরও ঐ অবস্থা···শালা মাইনে নিতে গিয়ে হাঁ হয়ে গেছে সব।

গিট্টু : শালা ছাঁটাই করবার আগে এইসব পাঁয়তারা কষছে ম্যানেজার।...আর এমন ত্যাঁদোড় মাইরী যে কোনদিন শালা কারখানায় ঢুকে পর হাজ্‌রের খাতায় নাম তুলতে দেবে না— বলে কিনা যাও না কাজে— পূরো দু শিফ্‌ট কাজ করে এসো— খাতায় নাম তুলো, এই রকম বেইমানী।

বুধাই : তা পিয়ারীর দল হাঁ হয়ে কি কাজে গেল শেষমেশ দেখলি !

নগিন : কি জানি, গিট্টু জানে হয়তো, গিট্টু !....হ্যাঁরে পিয়ারীর দল কি কাজে যাবে বললে নাকি রে রাত্তির বেলা ?

গিট্টু : কি জানি, বসে তো পড়ল সব দেখলাম। বোধ হয় যাবে না কাজে।···পণ্ডিত তো রয়ে গেল দেখলাম।

ওস্‌মানের প্রবেশ।

কে এল রে, পণ্ডিত নাকি ?

নগিন : ওস্‌মান শালা আসছে।

গিট্টু : ওস্‌মান এসেছে তো ডাক, ওর কাছ থেকে টাটকা খবর পাওয়া যাবে।

নগিন : ওস্‌মান, এই ওস্‌মান, শালা কালা নাকি রে মাইরী, এই ওস্‌মান !

ওস্‌মান : কি বে !

নগিন : কারখানা থেকে ফিরছিস্‌ ?

ওস্‌মান : হাঁ··· কেন ?

নগিন : পিয়ারীরা কি বসেই আছে না শেষমেশ কাজে গেছে, খবর রাখিস ?

ওসমান : ফিটার মিস্ত্রীর ডিপার্টে তালা বন্ধ করে দিয়েছে, জানিস না ?

নগিন : না।···একদম সটাসট্‌ তালাচাবি ? তারপর···

ওস্‌মান : তারপর শুধু সঙ্গে একটা নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে এই বলে যে ডিপার্ট আজ থেকে বন্ধ থাকল।

নগিন : ব্যস, শালা কেন বন্ধ, কিসের বন্ধ, কত দিনের জন্যে বন্ধ— এসব কথা কিছু নেই ?

ওস্‌মান : কৈফিয়ৎ আর দেবে না হুঁঃ। শুধু ঐটুকু— আজ থেকে ডিপার্ট বন্ধ রইল।

গিট্টু : শালা বিলকুল হারামী মাইরী।

বুধাই : যা শালা, যেটুকু বাকি ছিল তাও হয়ে গেল। (হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে) ই—ন—কিলাব।

চায়ের দোকানের ভেতর থেকে সমস্বরে ধ্বনি ওঠে জিন্দাবাদ। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের নেতৃত্বে আরও অনেক মজুর এসে জমায়েত হয়।

ঈশ্বর : ব্যাপারটা কি, এখন কেন বোনাস দেয় না

কোম্পানী। এখন কেন মুখের কথাটা পর্যন্ত বলে না যে, যা হোক বাবা মানিয়ে গুছিয়ে কাজ কর, সময় আসলেই তোমাদের দাবী-দাওয়াগুলো বিবেচনা করা হবে। কেন? না— তা হলে তো আমরা ধর্মঘট এখন নাও করতে পারি, কিংবা দুদিন পরে করতে পারি। কিন্তু তাতে করে হয় এই যে মালিক ছাঁটাই-এর ছুতো পায় না, না বলে না কয়ে ঝটাপট কতকগুলো ডিপার্ট বন্ধ করে দিতে পারে না—এই হয় মালিকের অসুবিধা। অবিশ্যি ছাঁটাই মালিক করছেই, একটা কোন ছুতো ধরেই সাফ বলে দিচ্ছে কাল থেকে আর তুমি কাজে এস না। কিন্তু তেমন একটা বড় ছুতো না পেলে বেশী মজুরকে একসঙ্গে জবাব দিতেও কোম্পানী দুনোমনা করছে। কিন্তু ধর্মঘট করলে কোম্পানীর আর কোন খুচরো ছুতোর দরকার হয় না, পাঁচ-সাতশো মজুর এই মওকায় মালিক অনায়াসে ছেঁটে ফেলতে পারে। তাই আজ দেখি মঙ্গল মিস্ত্রীর দলের মুখে পর্যন্ত ধর্মঘটের কথা। এতদিন ধর্মঘট যারা বানচাল করেছে আজ তারাই মজুরদের মধ্যে ধর্মঘট করো ধর্মঘট করো বলে উস্কানি দিচ্ছে। এটা ভেবে দেখা দরকার।

ওস্‌মান : কিন্তু পণ্ডিতজী ধর্মঘট ছাড়া এখন উপায়ই বা কি?

বুধাই। হাতিয়ার তো বাবা ঐ একই হ্যায়।

ঈশ্বর : ওতো ঠিক কথা। ধর্মঘটই করতে হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এবারে যেন আমাদের মধ্যে কোন ভাগাভাগি না হয়। হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। মজদুর-মজদুর। দু হাজার মজুরের এবার দু হাজার মজুরকেই ধর্মঘট করতে হবে। কিছু মজুর ছাঁটাই করে কিছু মজুর দরকার মত রেখে দিয়ে কারখানা চালু রাখার যে প্ল্যান কোম্পানী করছে—এই প্ল্যান বান্‌চাল করতে হবে। তবেই মালিকের কারসাজি বরবাদ হয়ে যাবে— ধর্মঘট করে কিছু ফয়দা ভি মজুরের হতে পারে— ছাঁটাই বন্ধ হবে।

ধ্বনি ওঠে — ঠিক বাত, ঠিক কথা, সাচ্‌ হ্যায়।

এখন তহবিল। টাকা চাই, চাল চাই, ডাল চাই— মজুর ইউনিয়নের স্ট্রাইক ফণ্ড্‌ খুব জোরদার করে তুলতে হবে। কারণ বিশ দিন কি পঁচিশ দিন কি এক মাস কি দুমাস এই ধর্মঘট চালাতে হবে তার কোন ঠিক নেই।

ওস্‌মান। এখানে আমার একটা কথা আছে।

ঈশ্বর। বল।

ওস্‌মান। কথাটা এই যে, এখনও আমি আমাদের লোকের মুখে এই কথাটা শুনতে পাই যে, ইউনিয়নে ভিড়ে খামখা ধর্মঘট করে কি হবে। আগে মাইনে বাড়ুক তারপর ইউনিয়নে যোগ দেব— ইউনিয়নের কথা শুনবো। এটা কিন্তু খুব ভুল কথা— ভুল কথা এই জন্যে যে, বাইরে থেকে শুধু ইউনিয়ন মাইনে বাড়িয়ে দিক বললেই মাইনে বাড়তে পারে না। মাইনে বাড়াতে হলে, মজুরদের ওপর মালিকের খুশী-মত হামলা বন্ধ করতে হলে, ইউনিয়নকে জোরদার করে তুলতে হবে। ইউনিয়ন তো বাইরের একটা জিনিস নয়! —নিজের জান-প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মজুররাই মিলে মিশে এটা করেছে। ইউনিয়ন বলতে মজুরদেরই একটা জোট বোঝায়— মজুর আছে তো ইউনিয়ন আছে, মজুর নেই তো ইউনিয়নও নেই। সেই জন্যে ইউনিয়ন অমুক করে দিক তবে ইউনিয়-নের কথা শুনবো— এটা কোন কথা হতে পারে না। আমার কথা এই যে, ধর্মঘট করবার আগে যেন সকলেই এই কথাটা ভাল করে বুঝে নেয়। এখন ইউনিয়নকে দাও, দিলে তো পাবার আশা করতে পারো— দু হাতে দিয়ে স্ট্রাইক ফণ্ড্‌ এখন জোরদার করে তোল— নিজেদের ন্যায্য দাবীর কথা বুঝিয়ে বলে পাবলিকের কাছ থেকে চাঁদা চেয়ে নাও— সাচ্চা কাজে সাচ্চা মানুষের মন পাও, যে হাঁ এদের দাবী ঠিক—ভাল কাজের জন্য এরা লড়ছে—তবেই ধর্মঘট করে জিত হবে— মাইনে বাড়বে। এখন দিয়ে যাও— দু হাত ভরে দিয়ে যাও— ইউনিয়নকে বাঁচাও, দেখবে ইউনিয়নও তোমাদের বাঁচাবে।

(স্লোগান) ইন্‌ কিলাব জিন্দাবাদ

মজদুরোঁকা দাবী কায়েম্ করো।

এই সময় বাঁদিকের উইং দিয়ে চায়ের দোকানের ধার ঘেঁষে কয়েকজন শ্রমিক চাদর ধরে স্ট্রাইক ফণ্ড সংগ্রহ করতে থাকে এবং গান করতে করতে এগিয়ে আসে।

ইয়ে ঝাণ্ডা তুঝ্‌সে কহতা হ্যায়,
দিনরাত জুলুম কেঁও সহতা হ্যায়
খামোস সদা কেঁও রহতা হ্যায়,
উঠ হোসমে আবেদার হো যা।

যে যার সাধ্যমত টাকা পয়সা দিয়ে দেয় খুশী হয়ে।

▭ ▭ **পটক্ষেপ** ▭ ▭

। । । । । । । । । । । । ২য় দৃশ্য । । । । । । । । । । ।

মি. সেনের অাপিস ঘর। পরনে লঙ্‌স, হাতকাটা গেঞ্জি, বাঁ কপালে সরু রুফালি প্লাস্টার গুণ চিহ্নের মতো করে আঁটা। মি. সেন, রেবতীবাবু ও মি. মুখার্জির সঙ্গে মুখে কথা কইছেন আর হাতে কাজ করছেন।

মি. সেন : অত কথা বলতে হবে না। অত কথা বলতে হয় না। কাজের রীতি বোঝেন না আপনারা তার...প্ল্যান একটা ঠিক করে নিয়ে চটাপট অর্ডার-গুলো সব dispose of করে দিন। এত unsteady হলে হয়!... হেড আপিসে বসে আপনারাই যদি এই রকম bungling করেন তো আর সব ব্রাঞ্চ আপিস গুলোর কাজ চলে কি করে বলুন তো? জানি time is bad, market is dull, still you have got to rise to the occasion না কি বলুন না?

রেবতীবাবু : না সে তো বটেই।

মি. সেন : তো তবে! আর এসব ব্যাপারে কোন রকম delicacy করবেন না। Company-র মধ্যে hanger-on দেখলেই straight-way chuck them out, এর ভেতরে আর কোন কথা নেই।

মি. মুখার্জি : Hanger-on আবার কি ধরণের সব, কয়লার ঘাটতির জন্যে মেশিন বন্ধ হল তো এক একজন দশ-পনেরো দিন ধরে বসে আছে।

মি. সেন : হুঁ তা sack করতে হবে! বসিয়ে বসিয়ে কোম্পানী খাম্‌কা হপ্তা গুণতে পারবে না।

রেবতীবাবু : না, তারা বলে যে কয়লা নেই তার আমরা কি করবো— মেসিন চালু রাখার সরঞ্জাম জোগাবে তো কোম্পানী।

মি. সেন : Oh ho, no argument please, এখানে কয়লা কে যোগাবে আর না যোগাবে সে কথাই উঠছে না। কী বলছেন আপনি? এই সব কথা কইতে গিয়েই তো মুস্কিল বাধান আপনারা। দরকার কি এত কথায়... সোজাসুজি কয়লা নেই, মেসিন বন্ধ, সুতরাং কাজও বন্ধ— no job, ব্যাস finish... আপনি কি ভাবছেন কয়লা না থাকার ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে বললেই হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাবেন আপনি!...হুঁ, তা কি হয়, না হয়েছে কখনও— silly idea.

রেবতীবাবু : না, আমিও তাই বলছি— তারা বললেই বা আমরা শুনবো কেন!

মি. সেন : না, 'বললেই বা শুনবো কেন' না, আমি বলছি যে তাদের সেটুকু বলার opportunity-ই বা আপনি দেবেন কেন, বুঝতে পারলেন না?

রেবতীবাবু : হুঁ বুঝিছি।

মি. সেন : Post-war time-এ accommodate যখন আপনি তাদের করতেই পারছেন না, get that, so no talk, straight action— dismiss... মুখুজ্জো বুঝতে পারলে আমার পয়েন্টটা...

মি. মুখার্জি : আমি তো এই কথাই বলে এসেছি বার-বার। তা আপনি আবার মাঝে unnecessary provocation দেওয়া হচ্ছে বলে একদিন খুব চটাচটি করলেন, তারপর থেকে আমি আর...

মি. সেন : ও-সব ব্যাপারে একরকম মাথাই ঘামাই না, কেমন?

মি. মুখার্জি : না, মাথা ঘামাই না নয়, করি সব, তবে

করবার আগে ব্যাপারগুলোর সম্বন্ধে আমি হয় আপনি নয় রেবতীবাবুর কাছে একবার refer করি।

মি. সেন : তা সে তুমি বেশ করো, সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধিতে ঝট্ করে একটা কাজ করবার আগে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া ভালই। তাতে risk-ও কম ; কিন্তু তাই বলে নিজের initiative-টার এই রকম গলা টিপে হত্যা করবার কি কোন মানে হয়! দেখ মুখুজ্জো, don t be sentimental—শুনবে না, বুঝতে চেষ্টা করবে না, মাঝখান থেকে সামান্য একটা ব্যাপারে চট করে react করে গেলে। আমি জানি,দেখ মুখুজ্জো, আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা কোরো না, পারবে না এই বলে দিচ্ছি।...যেদিন তোমায় ঐ কথা বলেছি আমি ঠিক তার পরদিন থেকেই তুমি আমার সঙ্গে hide and seek play করতে আরম্ভ করেছ— আমি এদিক দিয়ে ঢুকি তো তুমি ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাও, আবার আমি ওদিক দিয়ে ঢুকিতো তুমি এদিকদিয়ে বেরিয়ে যাও—না ডেকে পাঠালে দেখাটি করবার পর্যন্ত তোমার সময় হয় না! বল ঠিক বলিছি কি না! তোমার অভিমান— আমি তোমায় শুধু সতর্ক করে দিয়েছিলুম যে মজুরদের যেন কোন মতেই unnecessary provocation দেওয়া না হয়। এখন তুমিই যে সেই provocature এমন কথাও আমি বলিনি। যা হোক তখন বলেছিলাম কেন? ষোল লাখ টাকা contract-এর খাঁড়া তখন তোমার মাথার উপর ঝুলছে! মজুরদের তখন তোমায় ঠাণ্ডা রাখতেই হবে যে করে হোক। কিন্তু আজ!...আজকের অবস্থা ঠিক তার উল্টো। অবিশ্যি তাই বলে আমি একথা বলছি না যে মুখুজ্জো এইবার তুমি ধরে ধরে সব মজুর ঠেঙ্গাও। শুধু জিনিসটা একবার বুঝে দেখ। আজ এই পড়তির বাজারে এত লোক তুমি কারখানায় কখনোই পুষতে পারো না! কোথাকার রেভিনু্য আজ কোথায় নেমে গেছে। বললেই তো আর হলো না, পারবে কি করে কোম্পানী! এই তো আবার দেখছি আমায় ইল্লি দিল্লী করতে হবে। নইলে কোম্পানীই টিঁকবে না।...সুতরাং আজকের দিনে তাদের provoke করেছে post-war crisis—সুতরাং willy nilly তোমায় ছেঁটে ফেলতেই হবে। আগেকার scale এ কোম্পানীর ঠাট তুমি তো আর কিছুতেই বজায় রাখতে পারো না। সুতরাং এখন, অবিশ্যি provoke করতে আমি বলছি না। এখন যদি কোন কারণে কারখানায় ধর্মঘট হয় তো হোক, safely ছেঁটে ফেলতে পারা যাবে।

নেপথ্যে : মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো!
আট ঘন্টা টাইম কায়েম করো!
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

মি. সেন : ইউনিয়নের লোকেরা বুঝি?

রেবতীবাবু : হ্যাঁ।

মি. সেন : বেটাদের বড্ড তেল হয়েছে। সকাল নেই দুপুর নেই রাত দিন চিল্লাচিল্লি আর গলাবাজী··· দাঁড়ান না, আর দুটো দিন যেতে দিন! আবার মন্বন্তর আসছে না। শালারা কটা মজুর আর চাষীর প্রাণ বাঁচাতে পারে দেখে নেবেন।

মি. মুখার্জি : রক্তবীজের জাত শালারা মরেও মরে না।

রেবতীবাবু : যা বলেছেন, একেবারে চা র পো কা র গুষ্টি!— ঐ যে আমাদের শাস্ত্রে আছে না, এক ফোঁটা অসুরের রক্ত মাটিতে পড়ল আর অমনি সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ অসুর উঠে দাঁড়াল! তা এদের দেখি···

নকড়ির প্রবেশ।

নকড়ি : (গলা খাঁকারি দিয়ে) এই যে আছেন দেখছি।

ব্যস্তভাবে চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়।

রেবতীবাবু : বলতে বলতে এসে পড়েছে।

মি. মুখার্জি : অনেকদিন বাঁচবে।

নকড়ি : তাই কামনা করুন, তাই কামনা করুন। মরতে আমার দারুণ ভয়! সে একেবারে···এই যে মাঝে মাঝে লোক মরে সব দেখি এদিকে ওদিকে, আমার একেবারে...কি বলছেন!

মি. সেন : তারপর আমার সে লোকের কি করলে নকড়ি ?

নকড়ি : লোকের !···কি আবার করবো, নিয়ে এইছি একেবারে সঙ্গে কব্জা করে।

মি. সেন : এনেছ, তো কই সে লোক কই ?

নকড়ি : বাইরে বসিয়ে রেখে এইচি, ডাকবো বলছেন ?

মি. সেন : আচ্ছা দাঁড়াও··· রেবতীবাবু কি বলেন, মুখুজ্যে কথা বলে দেখবে না কি এখনই !

নকড়ি : হ্যাঁ সে দেখুন আপনারা বিবেচনা করে। আমার লোক আনার কথা...

মি. মুখার্জি : লোক আনার কথা এনে ফেলেছি, কেমন ? ও করলে চলবে না, regular দায়িত্ব নিতে হবে।

মি. সেন : হ্যাঁ, সে তুমি লোক এনে দিলেই যে তোমার দায়িত্ব চুকে গেল...

নকড়ি : আহা কি আশ্চর্য আমি কি বলিছি সে কথা ?

মি. সেন : তো বল সে কথা। শেষকালে যে বলবে পেলুম না মজুর···

নকড়ি : তা সে গ্যারান্টি তো আমিই রইলুম, বলছিই তো।

মি. সেন : হ্যাঁ।···তাহলে এখানেই ডেকে পাঠানো যা'ক, কি বল মুখুজ্জ্যে।

রেবতীবাবু : আপনার কথা বলবার দরকার হবে কি ? বলছিলাম···

মি. সেন : না, personally লোকটিকে আমি একটু খানি দেখতে চাই···আসুক না।

রেবতীবাবু : তা আসুক, আসুক···

মি. সেন : কথা-বার্তা যা in details-এ বলবার সে আপনি আর মুখুজ্যেই বলবেন তাকে আলাদাভাবে, নকড়িও থাকবে সেখানে··· আমিশুধু এখন দু-চারটে কথা বলেই···

রেবতীবাবু : তা বেশ তো ডাকুন না !

মি. সেন : উঁ, তাহলে নিয়ে এসো নকড়ি তোমার লোককে একবার।

নকড়ি: হ্যাঁ, দু-চারটে কথা বলেই দেখুন না....বেশ নাম করা ঠিকাদার, কমসে কম বিশ-ত্রিশ হাজার জন-মজুরের ওপর তো রেখেছে একতিয়ার !...চাড্ডি খানি কথা হল না !

মি. সেন : বেশ বেশ ডাকো ডাকো !

নকড়ি : উঁ...হুঁ

নকড়ির প্রস্থান।

মি. সেন : Dead lock আমি কিছুতেই হতে দেব না কারখানায়। শেষকালে যে ধর্মঘটের ভয় দেখিয়ে আমার কারখানার কাজ বন্ধ করবে সে আমি হতে দেবো না, কিছুতেই না।

মি. মুখার্জি : আর হলেও তো সে আপনার সমস্ত মজুর বসে যাচ্ছে না। মঙ্গল মিস্ত্রীর দল তো রয়েছে।

মি. সেন : হ্যাঁ রয়েছে, কিন্তু এইতো সেদিন তুমি আমায় বললে যে মঙ্গল মিস্ত্রীর দলের লোকেরাই নাকি শেষ কালে মঙ্গল মিস্ত্রীকে ধরে ঠেঙ্গিয়েছে !

মি. মুখার্জি : ঠেঙ্গালেও দল তো যা হয় একটা আছে তার !

রেবতীবাবু : না সে থাকলেও মঙ্গল মিস্ত্রীর দলের ওপর entirely নির্ভর করা চলে না।

মি. সেন : কি বলেন, চলে কি ?

রেবতীবাবু : না সে আমার তো ঠিক মনে হয় না।

মি. মুখার্জি : Entirely নির্ভর করবেন কেন, সে কে বলছে ? আমি বলছি কিছুটা তো আন্দাজ...

রেবতীবাবু : হ্যাঁ, তা চলতে পারে, সে পারা যায়।

মি. মুখার্জি : তো সেই কথাই বলছি।...রেবতীবাবু আপনি একটু বসুন, আমি দেখি···মঙ্গল মিস্ত্রীটা এখনও এল না ?...

রেবতীবাবু : উঠছেন, আপনি থাকলে ভাল হত না ?

মি. মুখার্জি : কথা তো আমি বলিছিই...আর···

রেবতীবাবু : আচ্ছা দেখুন আপনি তাহলে ওদিকে···

মি. সেন : হ্যাঁ তাই যাও, তাই যাও···

মুখুজ্যের প্রস্থান। নকড়ির প্রবেশ, সঙ্গে ঠিকাদার। ধুতি শার্ট পরা বাবু গোছের লোক। কথা বলে ভাঙা-বাংলায়।

নকড়ি : এস ভেতরে চলে এস। খোলাখুলি ভাবে কথা কয়ে নাও একবার সাহেবের সঙ্গে।…ঐ যে বসে আছেন…

ঠিকাদার : (হেসে) প্রণাম !

মি. সেন : বসুন।

রেবতীবাবু : বসুন আপনি ওখানে বসুন !

নকড়ি : হঁ্যা, মুখোমুখি একবার মোকাবিলা একটা হয়ে গেলে তুমিও নিশ্চিন্দি, আমাদেরও ঝামেলা খানিকটা কম হয়।

ঠিকাদার : সে তো ঠিকই বলিয়েছেন।

মি. সেন : মোটামুটি আপনি তো সবই শুনেছেন ! এখন দরকার হলে লোক ঠিকমত আমায় দিতে পারবেন তো ?

ঠিকাদার : হঁ্যা সে আপনি যখনই বলিয়ে দেবেন তখনই লোক আসিয়ে যাবে। এ কথা তো আমি বলিয়েই দিচ্ছি, ইয়ার ভিতর আর…

মি. সেন : মোটামুটিভাবে machineগুলো handle করবার মত অন্তত কিছু লোক আমার হয়তো দরকার হবে।

ঠিকাদার : সে ভি পাবেন, মেকানিক তো আছে অনেক, আর এ মেসিনে কাজ করিয়েছে এমন লোকও আমার হাতে আছে।

রেবতীবাবু : অবিশ্যি সব গুলো machine আমরা চালাব না। নেহাৎ যে কটা না হলে নয় তা-ই চলবে।

মি. সেন : হঁ্যা সব কটা চালু হবে না।

ঠিকাদার : সে আপনারা এখন যে রকম বলেন। চারটা মেশিন চালু করেন তো চার চার ষোল, দু শিফটে পড়বে গিয়ে আপনার তা হলে বত্রিশজন…গড়পড়তা চল্লিশজন মেকানিক হলেই আপনার কাজ চলিয়ে যাবে।

মি. সেন : এখন আমরা একটা শিফ্‌টেই কাজ চালাব।

ঠিকাদার : বেশ তো তাই হবে, ঐ ষোল জনা হলেই কাজ চলিয়ে যাবে।

মি. সেন : এই গেল আপনার মেসিনম্যান, আর এমনি মজুর লোক।

ঠিকাদার : মজুর লোকের সম্বন্ধে কোন হরজা হবে না। সে ঠিক হইয়ে যাবে।… একটা শিফ্‌ট তো চালাবেন ?

মি. সেন : হঁ্যা একটা শিফ্‌ট !

ঠিকাদার : তো ঠিক আছে। কোন গোলমাল হবে না।…এখন কথা হইছে যে আমার লোকের উপর যেন কোন হামলা না হয়— এইটা আপনাকে একটু দেখতে হবে। ব্যাপার হইছে যে এবার সব জায়গাতেই গণ্ডগোলটা একটু বেশী রকম হইছে, অনেক জাগা মারিয়েও দিছে আমার লোকরে…

মি. সেন : না না, এখানে সে ভয় নেই। হামলা-টামলার ভয় করবেন না। বড সাহেবকে আমি বলেও রেখেছি ব্যাপারটা। দরকার হলে ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে ; চাই কি এমন তেমন হলে ফৌজের সাহায্যও আমি পাব। সে আশ্বাসও পেইছি।

ঠিকাদার : বেশ বেশ ভাল। না আমিও বলিয়ে রাখলাম আপনার কাছে ; মানে অনেক জাগা আবার কোন কিছুর যোগার থাকে না, কাজের সময় নানান গোলমাল হয়। তা সে আপনার এখানে সে রকম অসুবিধা কিছু হবে না বলিয়েই আমার মনে হইছে …তো বাস আর কিছু না এই কথাই থাকল !

মি. সেন : হঁ্যা এই কথা, আর যদি কিছু বলবার থাকে তো আপনি এঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন দরকার হলেই। আর নকড়ি রইল। ওর সঙ্গেও আপনি কথাবার্তা বলতে পারেন।… আসল কথা, আমার কারখানা আপনাকে চালু রাখতে হবে।

ঠিকাদার : সে আমি রাখিয়ে দেবো, কিছু ভাববেন না।

মি. সেন : ব্যস, তাহলেই হল।

ঠিকাদার : আচ্ছা, এখন তাহলে আমি উঠিয়ে পড়ি।

মি. সেন : আচ্ছা, আসুন তা' হলে।

নকড়ি : আজকেই তো আবার আপনাকে রওনা হতে হবে।

ঠিকাদার : হ্যাঁ, মানে এখন যাব পানিহাটি, সেখানে দুদিন থাকিয়ে কটক রওনা হব।

নকড়ি : কটক রওনা হবেন? অ···আজকে যাচ্ছেন পানিহাটি! তা বেশ, এদিকে কথাবার্তাও আমাদের পাকাপাকি হয়ে থাকলো।

ঠিকাদার : হ্যাঁ, আর ও তো হইয়েই ছিল উনার জন্য আর কি। তবে দেখাটা করিয়ে গেলাম একবার বাবুর সঙ্গে...আচ্ছা তো নমস্তে, নমস্তে।

মি. সেন : নমস্তে।

রেবতীবাবু : নমস্তে, নমস্তে।

নকড়ি : আমি চললুম তাহলে।

মি. সেন : চললে!

নকড়ি : আর...

মি. সেন : আচ্ছা এস।

নকড়ি ও ঠিকাদারের প্রস্থান। মি. মুখার্জির প্রবেশ।

মি. মুখার্জি : মঙ্গল মিস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল।

মি. সেন : হুঁ, কি বলে!

মি. মুখার্জি : এখনও এলনা এখনও এলনা করছিলাম না, তা সে বেটা দেখি ঠিক এয়েছে। এসে চুপটি করে সিঁড়ির ওপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমি তো দেখেই বুঝেছি, ব্যাপার সুবিধে নয়।

মি. সেন : কি রকম?

রেবতীবাবু : একেবারে দলছাড়া ··

মি. মুখার্জি : আমরা যে রকম আন্দাজ করেছিলাম আর কি... কিছু লোক ভেঙে চলে গেছে পণ্ডিতের দলে।

মি. সেন : সে তো এক রকম জানাই ছিল। ও মার যেদিন খেয়েছে সেই দিনই আমি বুঝিছি। যা হোক...

মি. মুখার্জি : এই তো ব্যাপার, এখন···

মি. সেন : কুছ পরোয়া নেই, অত ভাবতে হবে না। ব্যবস্থা যা সে তো আমরা এদিকে মোটামুটি করেই ফেলেছি। তুমি বরং নকড়িকে আর একবার খবর করো।

নেপথ্যে ভীষণ হট্টগোল শোনা যায়। শোনা যায় মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো, আট ঘন্টা টাইম কায়েম করো, পুরা রেশনিং চালু করো ইত্যাদি।

মি. সেন : আবার গণ্ডগোল কিসের?

রেবতীবাবু : পণ্ডিতের দল বলেই মনে হচ্ছে।

মি. সেন : পণ্ডিতের দল। কারখানার ভিতর ওদের ঢুকতে দিলে কে?

মি. মুখার্জি : ঠিক ভেতরে ঢোকেনি. এখনও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মি. সেন : কারখানার ভেতরে যেন ওদের কোন মতেই ঢুকতে না দেওয়া হয়। তুমি যাও দারোয়ান আর সান্ত্রীদের গেট আগলাতে বল। রেবতীবাবু আপনি দেখুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কারখানার ভেতরে কোন রকম হাঙ্গামা আমি কোনমতেই বরদাস্ত করব না, কিছুতেই না।

রেবতীবাবু ও মুখুজ্যের প্রস্থান।

মি. সেন হন্তদন্তভাবে টেলিফোনটা মুখের কাছে তুলে নিয়েই কি একটা নম্বর বলে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ আবার কি মনে করে রিসিভারটা চেপে ধরে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

Hullo, give me Regent 53390, yes Regent 53390··· (হঠাৎ রিসিভারটা চেপে ধরে) Perhaps not yet, not yet. O. K. Let me see.

চারদিক থেকে আওয়াজ ওঠে— ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো। আট ঘণ্টা টাইম চালু করো। পুরা রেশনিং দেনে হোগা।

মি. সেন : দেনে হোগা! What an idea!

মি. মুখার্জির প্রবেশ।

মি. মুখার্জি : ওরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

মি. সেন : ওরা, কারা ওরা যে আমায় ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে? কে ওদের ফ্যাক্টরী-কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকতে permission দিলে!...Cheek.

মি. মুখার্জি : ফ্যাক্টরী কম্পাউণ্ডের মধ্যে ওরা বাধা দেবার আগেই ঢুকে পড়েছিল; আর তা ছাড়া···

মি. সেন : রেবতীবাবু গেলেন কোথায়?

মি. মুখার্জি : রেবতীবাবু ওদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন।

মি. সেন : বেশ তো তাকেই কোম্পানীর পক্ষ থেকে কথা বলতে বল।

মি. মুখার্জী : সে কি করে সম্ভব হয়! তারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কি সব বক্তব্য আছে···

মি. সেন : বেশ, নিয়ে এস। তবে দু-তিন জনের বেশী লোককে যেন ঢুকতে দিও না ভেতরে।

মি. মুখার্জী : না ঐ দু-তিন জনাই দেখা করবে; পণ্ডিত আছে আর জন তিনেক ইউনিয়নের লোক।

মি. সেন : পণ্ডিতও আছে নাকি? উঁ!···বেশ ডাকো।

মি. মুখার্জির প্রস্থান।

দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষে এসেছি এতোদিন···

বাইরে ভীষণ হট্টগোল। রেবতীবাবু, মুখুজ্জো ও জন কয়েক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রবেশ। পেছনে ঈশ্বর পণ্ডিত ও কয়েক জন শ্রমিক প্রতিনিধি। সকলের শেষে মহাবীর শাস্ত্রী, ও গজাননের প্রবেশ।

রেবতীবাবু : আপনাদের ভেতরে কথা বলবেন কে?

ঈশ্বর : কথা— আমি বলতে পারি।

মি. সেন : বলতে পারিনা; যে পারে সে এগিয়ে আসুক।

ঈশ্বর পণ্ডিত এগিয়ে আসে।

কি বলতে চাও?

ঈশ্বর : বলবার বিষয়বস্তু যা তা এই চিঠির ভেতরেই পরিষ্কার করে বলা আছে। মৌখিক শুধু এই কথাটাই শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমার আপনার কাছে বলবার আছে· অবশ্যি এ বিষয়েও যথারীতি উল্লেখ করা হয়েছে চিঠির মধ্যে— তবু বলছি যে ছাঁটাই যদি বন্ধ হয় তা হলে আমরা এখনও আগেকার মত কাজ করতে রাজী আছি। আর—

মি. সেন : যাক গে সে চিঠিতে যখন mention করাই আছে তখন এ কথা আর নতুন করে বলবার কোন প্রয়োজন নেই। আর ছাঁটাই বন্ধ হলে কাজ আরম্ভ করবো— এটা কোন শর্ত হতে পারে না।··· আর কিছু বক্তব্য আছে।··· (চিঠির দেখে) মাত্তর চল্লিশঘণ্টা সময়ের মধ্যে সদুত্তর চাওয়া হয়েছে, উত্তরটা সৎ না-ও হতে পারে। কারণ এই সামান্য সময়ের মধ্যে ডিরেক্টরস্ বোর্ডের মিটিং 'কল' করা এক রকম অসম্ভব।

ঈশ্বর : দু দিনে চব্বিশ চব্বিশ আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। সাত-আটশো মজুর আর কত ঘণ্টা উপোস করে থাকলে আপনার ডিরেক্টরস্ বোর্ডের মিটিং হতে পারে?

মি. সেন : না খেয়ে আমি থাকতে বলিনি।

ঈশ্বর : হ্যাঁ, বলেননি কিন্তু ঘটিয়েছেন।

মি. সেন : আমি তর্ক করতে চাই না।... আর কোন বক্তব্য আছে?

ঈশ্বর : না।

মিঃ সেনের বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রইং রুম। দিল্লী যাবার প্রাক্কালে একটা ভোজসভার আয়োজন করেছেন মিঃ সেন। বন্ধু-বান্ধব ও বহু সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে কবি, সাবিত্রী দেবী ও সুচিত্রা দেবী উপস্থিত আছেন। কিন্তু সবার মুখেই কেমন যেন একটা ভশ ভুশ ভাব—অন্তরের উচ্ছাস স্বতঃস্ফুর্ত আবেগে যেন কিছুতেই ফেটে পড়তে পারছে না। সকলকেই চা পানে আপ্যায়িত করা হচ্ছে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সকলেই সংযত ভাবে চুটকি রসিকতা আর টুকিটাকী মন্তব্যের ভেতর দিয়ে আনন্দবাসর উদ্‌যাপন করছেন।

জনৈক সাহেবী পোষাক-পরা বন্ধু : You could have easily postponed the function Mr. Sen. কেউ তাতে কিছু মনে করতো না, বরং gladly accept করতো।

জনৈক স্থূলাঙ্গিনী : সত্যি মনটা এমন খারাপ লাগছে মি. সে

মি. সেন : না মানে postpone অবিশ্যি করা যেত, কিন্তু আমি তো থাকতে পাচ্ছিনা কিনা ! আমাকে যেতেই হচ্ছে।.. আর সময়ই বা পেলাম কোথায়···accident-এর ব্যাপার।

স্থূলাঙ্গিনী ভুরুতুলে ঘাড় নেড়ে স য় দেন।

সরকারের প্রবেশ।

মিঃ সেন : Hullo, so late, তোমার জন্যে সব বসে বসে একেবারে···এস এস। Introduce করে দি তোমাকে সবার সঙ্গে।

মি. সরকার : Wait my dear friend, wait, দাঁড়াও মুখগুলো সব দেখে নিই ভালো করে।···(কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে) I see- মি. শর্মাও দেখি একেবারে শর্মিনীকে নিয়ে সমুপস্থিত। (কাকে যেন প্রত্যাভিবাদন জানাল হাত তুলে) O. K,.... no perhaps I need no introduction here Mr. Sen ; শুধু Barrister Mr. Shome-এর পাশে মোটা মত ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম না।

মি. সেন : কে, Mr. False colour-bulky one !

মি. সরকার : Yes, yes.

মি. সেন : Oh, he is one of the Burra— Sahebs of my firm. A mine expert.

সরকার : I See—mine expert. What a mine !

মি. সেন : He says that he has been much reduced now-a-days because of the rationing.

সরকার : (চোখ বড় বড় করে লম্বা শিস টেনে ওঠে) God bless him.

মি. সেন : বস।

সরকার : হাঁ। বসি, তারপর বাড়ীর সামনে রাস্তার ওপর অত খড় বিছিয়ে রেখেছ কেন হে ! ব্যাপার কি ?

মি. সেন : To be or not to be has been the question with Rai Bahadur since yester night. Running very high pressure.

সরকার : এখন কেমন আছেন ?

মি. সেন : Not good.

সরকার : উঁ...so everything is dull.

মি. সেন : Yes, everybody is putting up a very bad show. You can see even Mr. Tomato putting up a long face and is very much concerned about his old revered friend.

সরকার : Of course.

মি. সেন : মুস্কিল...এদিকে আমায় তো চলে যেতেই হচ্ছে।

সরকার : কোথায় ?

মি. সেন : দিল্লী।

সরকার : ও সেই যে বলেছিলে, right, right-কিন্তু···

করেকজন প্রস্থান করবার উদ্যোগ করে এগিয়ে আসেন।

মি. কাপুর : (হ্যাণ্ডসেক্ করে) Many thanks Mr. Sen. You must be very much disturbed today.

মি. সেন : Oh no. Thank you. Could'nt entertain you properly.

মি. কাপুর : No that's all right. don't, worry.

মিসেস কাপুর : Hullo, (সেনের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক্ করল···)

মি. কাপুর : (সরকারকে) Hullo.

সরকার : Hullo, (হ্যাণ্ডসেক করল)···

মি. কাপুর : (সরকারকে) How do you do ?

সরকার : So, so. (কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে)

মিসেস কাপুর সরকারের সঙ্গেও হাস্যমুখে হ্যাণ্ডসেক করলেন।

মি. কাপুর : Good night Mr. Sircar.

মি. সেন : Good night.

মিসেস কাপুর : Good night everybody.

সরকার : Good night. Good night.

মিঃ ও মিসেস কাপুরের প্রস্থান।

মি. সেন : (সরকারকে) দাঁড়াও পালিও না যেন। কথা আছে।

সরকার : That's all right. You just look to your guests.

সিগারেট ধরিয়ে কবির পাশে গিয়ে বসল।

মিঃ সেন অন্যান্য অভ্যাগতদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সকলে যথাসম্ভব সংযতভাবে নিঃশব্দে হেসে দু-চারটে কথা বলে নৈশ অভিবাদন জানিয়ে কেটে পড়তে লাগলেন। রইলেন সাবিত্রী দেবী, কবি, মি. সরকার ও সুচিত্রা দেবী। সরকার ও কবি বসে বসে খুব মদ খেতে লাগল।

কবি : বাপস্ ! What a rowdyism ! হাঁপিয়ে গেছি একেবারে !

সরকার : Rowdyism, বল কি হে ! দিন দিন তুমি যেন কেমন lifeless হয়ে পড়ছ কবি। কেমন যেন সব সময়েই একটা কোণ মেরে বসতে চেষ্টা করো, আগেকার মতো জোর দিয়ে হাসতে পারো না— these are bad signs undoubtedly. You must not allow yourself to be so very cautious and c a l c u l a t i ve like, whom should I name— যাকগে আর বদনাম কিনতে চাই না বলে— আসল কথা মানায় না যা তা তুমি করবে কেন !···তুমি হাসো, আবৃত্তি করো, গান গাও – যা তোমাকে মানায়। কি একটা···খাও, সিগারেট খাও। জোরে জোরে কটা টান মেরে বেশ খানিকটা ধোঁয়া বার করো দেখি।

কবি : খুব যে মেজাজ দেখছি আজ, ব্যাপার কি ?

সরকার : ব্যাপার নতুন কিছুই নয় ভাই। The world is old and round. and I am ever a square peg trying to fit myself in it.

কবি : আগেকার সুরের সঙ্গে এটা তো ঠিক harmonise করছে না, কি রকম যেন একটু আফশোসের মত শোনালো।

সরকার : ভুল করলে, একটু discordant তো শোনাবেই— square peg যে···বুঝতে পারলে না !

কবি : না, ঠিক ধরতে···

সরকার : All right, European theory of Harmony টা আমি একদিন তোমায় ভালো করে বুঝিয়ে দেবো'খন। Harmony-র মত জিনিস আছে পৃথিবীতে !

কবি : বেশ আছো।

সরকার : Always, always, উপায় কি বল ? কারণ আমি যদি নিজেকে বেশ না থাকাই, তা হলে··· আবে কদর যা দিলে জগৎ তা তো আমি জানি।

কবি : কি রকম, you seem to be very interesting gradually মি. সরকার।

সরকার : কেন, অন্যায় কিছু বলিছি !

কবি : আরে না না, তারপর শুনি দেখি কি রকম কদর দিলে জগৎ…you go on.

সরকার : কি কদর।

কবি : কেন ?

সরকার : যাকগে ছেড়ে দাও ভাই, বলিছিই তো— square peg.

কবি : আবার কি হল !

সরকার : কিছু না !

কবি : সে কি।

সরকার : ছেড়ে দাও না ভাই, ও আমার ব্যাপার আমাতেই থাক।

কবি : তো থাক !

এতক্ষণ ধরে বিদায় সম্বর্ধনা সেরে সুচিত্রা দেবীর সঙ্গে কি যেন কথা বলছিলেন একান্তে মি: সেন, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন।

মি. সেন : থাক্ থাক্ আর থাক্। আরে থাকতে কি আমিই বারণ করিচি। খালি থাক্, দেখ don't get on my nerves সুচিত্রা।

সরকার : (হন্তদন্ত ভাবে) আরে কি হল, কি থাক্, সবাই থাক্ থাক্ করছে (মি. সেনকে) কি হে থাকবেটা কি !

মি. সেন : আশ্চর্য !

কবি : কি হল, সুচিত্রা দেবী ? কোথায় কে থাকবে ?

মি. সেন : থাকবে আমার গুষ্টির পিণ্ডি আর মাথা !

সুচিত্রা হাসি চাপতে চেষ্টা করে।

যাওয়া…আমার যাওয়া, দিল্লী যাওয়া। আমার দিল্লী যাওয়া থাক্। পঞ্চাশবার ধরে কানের কাছে কেবল ঐ এক কথা আওড়াচ্ছে আজ সকালবেলা থেকে। আরে যেতে কি আমারই খুব ভাল লাগছে !

সরকার : তাই বল, আমি ভাবলাম বলি—

সুচিত্রা : কি বলছেন আপনি ? যেতে বলছেন ?

সরকার : কে ?

সুচিত্রা : আপনি ?

সরকার : ক ক নো না। আমি যেতেও বলছি না থাকতেও বলছি না। আরে আমার কি বক্তব্য থাকতে পারে এর মধ্যে। আমি একটা squre peg— কি বল কবি ?

সুচিত্রার প্রস্থান।

কবি : Excuse me please.

মি. সেন : আর খেও না কবি। করছ কি !

কবি : করছ কি ! আরে আমিও তো তাই বলি, করলুম কি। প্রশ্নটা তো আমারই আছে ; এখন উত্তরটি দাও দিকিন্— করলুম কি, বুঝি !

মি. সেন : করলে যা তা ভালই করলে

কবি : হ্যাঁ, তা ঠেকাতে চেষ্টা করিনি, এটা বলা যায়। …কিন্তু তাই বা করবো কেন ! লাভ ! জোর করে, জুলুম করে— I hate the process.

মি. সেন : Stop him Sircer. Don't allow him to take more pegs.

কবি : কেন মি.সেন. wine তো আর wife নয়— one feels better when it gets on one's nerves. দাও আর একটু দাও square peg.

মি. সেন : No, no.

কবি : বেশ দিও না, চাই না। না দিলে চাইব কেন ! অমন লাখ টাকার সম্পত্তিই ছেড়ে দিলাম দিলে না বলে তার…বেশ দিও না, কেড়ে আমি নেবো না…

পাশের একটা সোফায় শুয়ে পড়ে।

সুচিত্রার প্রবেশ।

সুচিত্রা : ঘুমোচ্ছেন।

মি. সেন : ঘুমোচ্ছেন !

সুচিত্রা : (সরকারকে দেখে হেসে) আপনি এসেছেন অনেকক্ষণ তা জানি, কিন্তু দেখুন না, এই সাত-তালে কথা বলবারই ফুরসত পাচ্ছি না।

সরকার : No that's all right, that's all right. এই স্বীকৃতিটাই যথেষ্ট, অনেকে আবার দেখেও দেখে না কি না !

সুচিত্রা : কি জানি…

সরকার : No, how can you know that সুচিত্রা দেবী— you are made of different stuff…

আর না জানলেনই বা, কিছু ক্ষতি হবে না।

সুচিত্রা : না ক্ষতি মানে, জানলে পরে তাল রেখে চলবার একটু সুবিধে হয় আর কি!

সরকার : হ্যাঁ তা হয় বটে, কিন্তু আপনার তাতে প্রয়োজন নেই।··· কিছু লোক এই জানাজানির বাইরে থাকা ভাল— একেবারে তফাৎ— একটু relieving হয়। আমাদের মত লোক অন্তত তাদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে শান্তি পেতে পারে।

সুচিত্রা : খুব সম্মান দিচ্ছেন কিন্তু আমায় মি. সরকার।

সরকার : No, this is due to you— ন্যায়ত ধর্মত প্রাপ্য। আমি বাড়িয়ে অন্তত আপনার নামে বলতে যাবো না।

সুচিত্রা : আপনি কিন্তু অনেক বদলে গেছেন মিঃ সরকার, কথায় বার্তায়···

সরকার : মনে হচ্ছে?

সুচিত্রা : হ্যাঁ, কেন আপনার কি মনে হয় আপনি ঠিক তেমনটিই আছেন?

সরকার : মুস্কিল বলা আমার পক্ষে... এখন দূর থেকে নিজেকে দেখি এক আয়নায়, তাতে করে পরিবর্তন তেমন একটা কিছু ঘটেছে বলে তো মনে করি নি, অবিশ্যি সেটা বাহ্যিক। আর ভেতরের হের-ফের এর কথা যদি বলেন তো তার খবর শুনি দেবাঃ ন জানন্তি, আমি তো... সুতরাং ঠিক বলতে পারলাম না।

সুচিত্রা : বেশ তো কথা বলেন আপনি।

সরকার ও মিঃ সেন একসঙ্গেই যেন কি একটা কথা বলতে চান।

সরকার : হ্যাঁ তা···

মি· সেন : ভেতরে···

সরকার : শুনুন, মি· সেন যেন কি বলতে চাইছেন।

মি. সেন : No no. you finish first.

সরকার : কি বলছিলাম···সুতো ছিঁড়ে গেছে, আর হবে না।

মি. সেন : (হেসে) সুতো ছেঁড়া-ছিঁড়ির আবার কি ঘটল। (সুচিত্রাকে) যা হোক, বলছিলাম তোমাকে কেমন দেখলে?

সুচিত্রা : কাকে! বাবাকে! বললুম না ঘুমুচ্ছেন!

মি. সেন : ও....কিন্তু দেখ আমাকে কিন্তু যেতেই হচ্ছে সুচিত্রা, উপায় নেই।

সুচিত্রা : দেখ।

মি. সেন : Competition-এর বাজার, বোঝ না! War market-তো নয় যে মোটামুটি একটা fair tender পাঠালেই contract পাওয়া যাবে। এখন যেতে হবে, ধরাধরি করতে হবে, বেশ মোটা রকমের ভেট দিতে হবে, বহু ঝামেলা— পরে গেলে আর সে chance-ও থাকবে না।

সুচিত্রা : বোঝ, আমার আপত্তি কি! তুমি ছেলে হয়ে যদি যেতে পার এই সময়ে, আর বউ হয়ে সেটা কি আমি সইতেই পারবো না··· ভাল বোঝ যাও। তবে আমি যাচ্ছি না।

সাবিত্রীর প্রবেশ।

মি. সেন : তোমায় যেতে হবে না, সে আমি ঠিক করে ফেলেছি। বসুন সাবিত্রী দেবী।...আমি সাবিত্রী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

সুচিত্রা : কে?

মি. সেন : সাবিত্রী দেবী।

সুচিত্রা : তাই নাকি! তা বেশ তো।

সরকার : তাই ভাল, একজন থেকে যান।

মি. সেন : হ্যাঁ তো ঐ থাকবে, যেটুকু প্রয়োজন বাবার তা তো ওকে দিয়েই হয়। আমার সঙ্গে এমনিতেই তো দেখা হয় ন-মাস ছ-মাস অন্তর···ঘটনাচক্রে!

সুচিত্রা : চক্রটা ঘোরেও আবার অদ্ভুত ভাবে কি না! ইচ্ছে করলে তুমি কি আর দেখা করতে পারো না। আসলে you don't feel it.

মি. সেন : যাক্‌গে, সে feel করি কি না করি সে আমি বুঝবো, you need not instruct me that.

সুচিত্রা : আমি তো কিছু বলছি না।

মি. সেন : হ্যাঁ।

সরকার : **No it is natural Mr. Sen that she will deviate sentimentally কিন্তু তাই বলে you can't...**

মি. সেন : আহা কি বলিছি কি আমি!

সরকার : No you shouldn't, shouldn't. After all she is a woman.

সাবিত্রী : না ভাবনা সত্যি অমন হয় মি. সেন আপনি বোঝেন না! মেয়েদের মন···

মি. সেন : আহা সেই জন্যেই তো আমি ওকে রেখে যাচ্ছি, নইলে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার তো কথা ছিল, বুঝি না কেমন!

সাবিত্রী : না তাই বলছি।

সরকার : হ্যাঁ তাই যাও, তাই যাও! তুমি নিজেই, না কাকে যেন সঙ্গে নেবে বললে, ব্যস··· নিয়ে কেটে পড়। এ সব business-এর ব্যাপার—কত রকম emergency হয়— সব কথা খুলে বলবারই বা তোমার দ র কা র কি! Rai Bahadur-এর অসুখ, তুমি জান। That he is running high blood pressure,— a fact. এ সব সত্ত্বেও যদি মনে করো যে না তোমার একবার দিল্লী যাওয়া দরকার, তাহলে যাবে— অবশ্যই যাবে। এর ভেতর আর তো কোন কথা ওঠে না।

সাবিত্রী : হ্যাঁ সেই জন্যই তো...

সরকার : আপনাকে না, বলুন মি. সেন ঠিক বলছি কি না!

মি. সেন : No, you are right, আরে সেই কারণেই তো অনেক করে বলে কয়ে সাবিত্রী দেবীকে শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়েছি। এখন···বোঝো তো সবাই সেখানে আসবে...

সরকার : আরে বুঝি বুঝি।...তা বেশ তো, সাবিত্রী দেবী যখন সঙ্গে যাচ্ছেন,...

সাবিত্রী : সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম তা আপনি আর শুনলেন কৈ।

সরকার : কেন, এই তো শুনলাম। যাচ্ছেন, ভাল তো ঘুরে আসুন দিল্লী।... গিয়েছেন এর আগে?

সাবিত্রী : ছোটবেলায় এ ক বা র গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে।

সরকার : ও, তা বেশ তো আবার না হয় একবার ঘুরে আসুন।··· আর সুচিত্রা দেবী সেখানে ঠিক তাল রেখে চলতেও পারবেন না। Society-তে মেলা-মেশা করার তো আর ওঁর তেমন অভ্যাস নেই কোনদিন! গেলে বরং উনি হয়তো বিব্রতই বোধ করবেন।... গোল গোল রাস্তা··· গোল গোল বাড়ী, গোল হয়ে নাচতে হবে... সে এক অদ্ভুত গোলমেলে ব্যাপার। আমার তো মনে হয় সুচিত্রা দেবী সে আবহাওয়া সহ্য করতেই পারবেন না।

মি. সেন : তা যা বলেছ। এমনিতেই সুচিত্রা যা shy আর stiff!

সরকার : না সে তুমি তাই বলে অভিযোগ করতে পারো না মি. সেন সুচিত্রা দেবী shy-ই হোন আর stiff-ই হোন, if she can't help you in securing contract from Delhi— আমি তো কিছু খারাপ দেখিনে। বরং এতে help করতে পারবেন তোমায় সাবিত্রী দেবী, and she will do it very neatly I believe.

সাবিত্রী দেবী : How do you talk Mr. Sircar!

সরকার : কেন অন্যায় কিছু বললাম নাকি! Really I don't think Suchitra can help him in this matter.

অবরোধ সম্পর্কে :

অবরোধ নাটকে শ্রমিক শোষণের ইতিবৃত্ত বিজনবাবু রচনা করলেন, শোষকদেরই কেন্দ্রে রেখে। শোষিত শ্রমিক ও ম্যানেজিং ডিরেক-টারের শোষিতা স্ত্রীর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন মিল আবিষ্কার করে সুচিত্রার আত্মহত্যা ও গজাননের মৃত্যুবরণ··· এই দুই ঘটনাকে যুক্ত করে বিজনবাবু যে যান্ত্রিক প রণতি রচনা করেন, তার মধ্যে আগের নাটকের অনিবার্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না।...

—শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাবিত্রী দেবী : **May be, doesn't matter— কিন্তু আমার নামে যে আপনি বলছেন, সাবিত্রী দেবী will help you and that she will do it very neatly— explain? What's your idea?**

সরকার : Oh that's not my concern— Mr. Sen will explain that to you,

সাবিত্রী : Explain that to you— don't be silly Mr. Sircar.

সরকার : (কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে) Well....

সাবিত্রী : I know, I know. Stop it now...Mr. Sen...

মি. সেন : Oh don't be shouting madam, you know Rai Bahadur is seriously ill.

সাবিত্রী : I will leave this house at once.

ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়।

মি. সেন : (বাধা দেয়) No no, I can't let you go now. Already আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন madam, and I have arranged it according-ly,... (নরম গলায়) You can't lay me down.

দাঁত চেপে ভুরু তুলে নিঃশব্দে হাসল সরকার শেষটায়।

সাবিত্রী : No enough, enough of it, চলে আমাকে যেতেই হবে— এক্ষুনি— এই মুহূর্তে!

মিঃ সেন : আমি— আপনাকে— যেতে—দিতে—পারি না। I won't.

সাবিত্রী : You won't!

মি. সেন : No.

অবরোধ সম্পর্কে।

'অবরোধ' নাটক শ্রমিকদের জীবন এবং কারখানার মালিকদের নিয়ে লেখা। অথচ এই নাটক গণনাট্য সংঘ কেন করতে পারলো না? কারণ দুটি। একটি বিজনের কারখানা ও পুঁজিবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব এবং দ্বিতীয় জনযুদ্ধের রাজনীতিতে শ্রমিক আন্দোলন তখন যে ভাবে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার সর্বাপেক্ষা ন্যূনতম স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল তার মধ্যে কার কৌশলগত রূপকে বুঝতে না পারা। ...বিজন গ্রামের কৃষকদের যত চেনেন, কারখানা পুঁজিবাদ ও শ্রমিককে তত চেনেন না।

—সুধীপ্রধান

সাবিত্রী : দেবেন না আপনি আমাকে যেতে?

মি. সেন : না।

সাবিত্রী : (ছুটে গিয়ে আবার সোফায় বসল) **Well then get into a contract for contract's sake. Come write and sign. You can't** cheat me both ways. Come, write and sign, you coward,

মি. সেন : (ছুটে আসে) Yes, for how much, how much money you want, how much ...come out you dirty witch.

সাবিত্রী : Fifty thousand.

মি. সেন : How much?

সাবিত্রী : Fifty thousand.

মি. সেন : O. K, F i f t y thousand. (লিখে) Fifty thousand,

কবি : Fifty thousand! Fifty thousand does not fetch you even fifteen gallons of wine, pooh.... চাইলেই তো অত কম করে চাইলে কেন সাবিত্রী।

সাবিত্রী : You shut up blinking idiot (সেনকে) Now you sign that.

মি. সেন : Yes I will sign.

কবি : বললুম, কথাটা শুনলে না, বেশ শুনো না। শুনতে ইচ্ছা না হয়, শুনো না! জোর করে আমি তোমায় শোনাতে যাব না। কক্ষনো না। **I hate** the process, জোর করে আমি তোমায়...

প্রস্থান।

সাবিত্রী : Sign that Mr. Sen.

হঠাৎ সুচিত্রা ছুটে গিয়ে সেন সাহেবের হাত থেকে কাগজ খানা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।

সুচিত্রা : সব কিছুরই একটা সীমা আছে!

মি. সেন : সুচিত্রা! তুমি এখান থেকে...

সুচিত্রা : চুপ করো তুমি। কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না!

সাবিত্রী : মি. সেন, আমি আশা করি আপনি contract sign করবেন।

সুচিত্রা : না.— যেতে হয় আমি যাবো দিল্লী, I will travel even to hell with my husband; but with this vile crooked wretch of a woman …ওঃ, চলে এসো তুমি।

সুচিত্রা স্বামীর হাত ধরে টেনে নিয়ে প্রস্থান করে।

সাবিত্রী : মি. সেন!… Coward… coward (থুথু ছিটোয়) coward.

মি. সরকার : (হঠাৎ সাবিত্রীর পক্ষ নিয়ে) Coword, away with the contract. Coward…away with the contract, coward.

সাবিত্রী : (কেঁদে ফেলে) Cheat কোথাকার!… আমার একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়লে।

মি. সরকার : (পেছন থেকে পিঠে হাত বুলিয়ে) চুপ করুন, চুপ করুন সাবিত্রী দেবী। জগৎটাই এই রকম ungrateful, ছি, চুপ করুন।

সাবিত্রী : কে!

মি. সরকার : আমি…son of a man— if your sweet rememberance does not fail. I will help you সাবিত্রী দেবী I will help you.

সাবিত্রী : (আর্তস্বরে) মি. সরকার… ও হো মি. সরকার, do please help me if you be so kind, help me.

মি. সরকার : কিচ্ছু ভাববেন না সাবিত্রী দেবী শান্ত হোন।

সাবিত্রী : এতটুকু শান্তি নেই, আর আমি শান্ত হবো …আমার মনে যে কী জ্বালা মি. সরকার!

মি. সরকার : চুপ করুন। চলুন আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সাবিত্রী : তাই চলুন মি. সরকার। মানুষের সমাজ, মানুষের সংসার থেকে আমাকে দূরে, অনেক দূরে নিয়ে চলুন। অনেক দূরে নিয়ে চলুন।

দূরত্বটা বোঝাবার জন্য কয়েকটা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে স্টেজের সমস্ত আলোটা একটা ফোকাসে গুটিয়ে নিয়ে মিঃ সরকার ও সাবিত্রীর যাবার পথে অফ করলে কেমন হয়!

▭ ▭ **অন্ধকারে পটক্ষেপ** ▭ ▭

।।।।।।।।।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।।।।।।।।।

মি. সেনের ভেতর-বাড়ীর ড্রয়িং-রুম। হাল-ফ্যাশানের আসবাবপত্রগুলো সুশৃঙ্খল ভাবে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে সারা ঘর খানার মধ্যে। সুচিত্রা যে একজন আর্টিস্ট, এই ঘরখানার ভেতর ঢুকলে টের পাওয়া যায়। সত্যি সত্যিই সুচিত্রা ছবি আঁকে। ড্রয়িং-রুমের এক কোণে রং তুলি ফ্রেম ছবি ইত্যাদি নিয়ে সুচিত্রা বেশ একটা ছোটোখাটো ছিমছাম স্টুডিও তৈরী করে নিয়েছে। সুচিত্রার হাতে আঁকা ছবির নমুনাগুলো দৃষ্টিটাকে যেন অনিবার্যভাবে সশ্রদ্ধ করে তোলে। সম্প্রতি একখানা পোর্ট্রেটে হাত দিয়েছে সুচিত্রা— ছবিখানা স্বয়ং মিঃ সেনের। পর্দা সরে যেতেই দেখা যায় সুচিত্রা নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছে। আর মিঃ সেন ড্রয়িং রুমের অন্য কোণে একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসে কি একখানা বই পড়ছে। সন্ধ্যেটা বোধহয় সবে মাত্র পার হয়ে গিয়েছে। মিঃ সেনের পরনে দামী একটা সাদা সিল্কের পায়জামা আর পাতলা একটা গাউন। সুচিত্রা খুব সতর্কভাবে তুলি চালাচ্ছে। ছবিটার মাথার দিকটা যদিও বা একটু বোঝা যাচ্ছে, তবু মুখটুখগুলো একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। সুচিত্রার কিন্তু ক্লান্তি নেই। সতর্কভাবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে শুধু তুলি বুলিয়ে যাচ্ছে, আর মিঃ সেন তন্ময় হয়ে একখানা বই পড়ছেন। দুজনেই আপন কাজে এত অদ্ভুতভাবে ব্যস্ত যে দেখলে মনে হয় ওদের দুজনের মধ্যে এতটুকু আলাপ-পরিচয় নেই।

মি. সেন : (হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে) সব কিছুরই একটা limit আছে।…মেয়েদের অভিমানটুকু ভাল লাগে ঠিক ততক্ষণই, যতক্ষণ সেটা অভিমানের মাত্রা পেরিয়ে ঔদ্ধত্যে গিয়ে না পৌঁছয়।

সুচিত্রার তুলি মন্থর হয়ে আসে।

সুচিত্রা : পুরুষের লাম্পট্যকে পৌরুষ বলে স্বীকার করে না নিলেই মেয়েরা হয় উদ্ধত। এ যুক্তি তোমার নতুন নয়। অভিমানটুকু ভাল লাগে, আশ্চর্য।

জোর জোর আঁচড় টানে তুলি দিয়ে সুচিত্রা।

মি. সেন : ওঃ, তুমি আশ্চর্য হলে কি আর অমনি পুরুষের সমস্ত পৌরুষ লাম্পট্য হয়ে গেল।

সুচিত্রা : আমি জানি, কথা তবু তুমি বলবেই।

মি. সেন : হ্যাঁ, এইবার কাঁদো। ঐ একটি অস্ত্রই তো আছে।...

সুচিত্রা। চুপ কর তুমি।...আমি আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

খস খস করে কয়েকটা আঁচড়ে অদ্ভুত চরিত্র ফুটে ওঠে ক্যানভাসের ওপর— মিঃ সেনের চরিত্রের একটা কার্টুন।

মি. সেন : তোমার মর্যাদা কেউ দিতে পারবে না। কেউ না। মনের মধ্যে পুষে রেখেছো একটা দুঃখবাদের পাহাড়...

সুচিত্রা : তুমি আবার এ-হেন দানব যে সেই পাহাড়ও আজ তোমাকে আর মানুষের চোখের আড়ালে রাখতে পারছে না। সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে আজ তুমি তাকে ছাপিয়ে উঠে গেছ।...মর্যাদা দেবে তুমি! সে আশা আমার বহুদিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

ক্যানভাসের ওপর মিঃ সেন যেন সত্যিই দৈত্যাকারে ফুটে ওঠে কালো রেখায়।

মি. সেন : চুরমার হয়েছে একটা স্ত্রীলোকের কামনা-বাসনার স্বার্থের ঢিবি।— স্বর্ণ-সৌধও না বা কোন একটা মহৎ গৌরবেরও কিছু না। সুতরাং অনুশোচনা করবার মত এমন কিছুই ঘটেনি।

সুচিত্রা : (তুলির যথেষ্ট আঁচড়ে ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়) অনুশোচনা আসবে তোমার! আমি কি পাগল হয়ে গেছি যে সেই আশা করবো।

মি. সেন : সেই তো তোমার জ্বালা। সেই জ্বালাতেই তো তুমি জিভ দিয়ে বিষ ছিটোচ্ছো। আবার বড় বড় কথা বলছো কি!

সুচিত্রা : আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

মি. সেন : কথা বলতে চাই না। সামান্য স্বার্থের মহত্তর ব্যাখ্যা অমন সকলেই দেয়। আমার কারখানার প্রত্যেকটা মজুর পর্যন্ত আজ ঐ এক কথাই বলে।

সুচিত্রা : তাদের প্রত্যেকে আজ তোমার চাইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ধারণা কি তোমার তাদের সম্বন্ধে!

মি. সেন : বাঃ চমৎকার! আর কি চাই। তো যাও এবার হাত মেলাও গে।

সুচিত্রা : মেলাবই তো।

মি. সেন : Shut up! Shut up!

সুচিত্রা : চেঁচিয়ে তুমি আর আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে না (ছবিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়) you can't terrorise me that way. তুমি জানবে আমি সাবিত্রী নই।

মি. সেন : তুমি কি করতে চাও?

সুচিত্রা : সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই।

মি. সেন : সুচিত্রা!

সুচিত্রা : সরে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। ভীরু কাপুরুষ কোথাকার! সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না!

মি. সেন : সহ্যের সীমা আছে সুচিত্রা!

সুচিত্রা : আমারও।... তোমার এক পা তুমি তুলে দিয়েছে কারখানায় মজুরদের বুকের ওপর— সেটা বাইরে, আর এক পা তুমি তুলে দিয়েছ আমার বুকে— সহ্যের সীমা তুমি বহু আগেই অতিক্রম করে গেছ। মানুষের ক্ষমা অনেক, তাই আজও তারা তোমায় নির্বিবাদে সহ্য করে যাচ্ছে।

মি. সেন : তুমি চুপ করবে কিনা আমি জানতে চাই।

সুচিত্রা : (কেঁদে ফেলে) চুপ করবে! আগুন জালিয়েছে কে? কে আজ তছ্‌নছ্‌ করে দিয়েছে আমার সমস্ত জীবন?

মি. সেন : রাত হয়েছে। মিথ্যে চেঁচিয়ে সতীপনার জাঁক দেখিও না। কলঙ্ক বই গৌরব কিছু বাড়বে না তোমার তাতে করে।

সুচিত্রা : রাজ্যের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে অগৌরবের ভয় তুমি আমাকে কি দেখাচ্ছো? জানুক না লোকে। এসে দেখুক। আমি প্রমাণ করে দেবো তুমি কত ছোট, কত হীন; সামান্য স্বার্থের খাতিরে তুমি কত খানি নীচে নেমে যেতে পারো।... কলঙ্কের ভয় তুমি আমাকে কি দেখাচ্ছো?

মি. সেন : চুপ করিয়ে দিতে আমি তবে বাধ্য হলুম।

লাফিয়ে উঠে দেওয়ালে ঝুলন্ত চাবুকটা পেড়ে আনে।

সুচিত্রা : কলঙ্ক! তোমার চরিত্র গড়তে গিয়ে আজ পৃথিবীর সবটুকু কলঙ্ক ফুরিয়ে গেছে। সামান্য একটা কীটপতঙ্গও আজ তোমার চাইতে বেশী সুস্থ।

কবির প্রবেশ।

উদ্যত চাবুক খানা কবি ত্রস্তে ধরে ফেলে।

কবি : কি হচ্ছে কি মি. সেন!

মি. সেন : কে, তুমি কেন!

কবি : হ্যাঁ আমি, চাবুক ছেড়ে দাও।

মি. সেন : কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছেন?

কবি : কেউ বলেনি আমি নিজেই এসেছি।

মি. সেন : Leave the room at once, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।

কবি : No no. You know I hate the process. কেন খামকা চলে যেতে বলছো।

মি. সেন : চাবুক ছেড়ে দাও কবি। (ধ্বস্তাধ্বস্তি)

কবি : না, চাবুক ছেড়ে দিলে তুমি মারবে সুচিত্রাকে!

মি. সেন : কবি, I warn you for the last time.

কবি : চাবুক আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না মি. সেন।··· তুমি আমার হাত থেকে সাবিত্রীকে ছিনিয়ে নিয়েছ— আমি প্রতিবাদ করিনি। প্রতিবাদ করিনি —ভেবেছি, সাবিত্রীই যদি— যাক সে কথা। আর আমাকে— আমাকে তুমি প্রলুব্ধ করেছ। বহুভাবে প্রলুব্ধ করেছ— টাকা দিয়ে, মদ দিয়ে...। বক্তব্য আমার ছিল কিন্তু বলতে পারিনি। সে আমার দুর্ভাগ্য।

মি. সেন : তুমি চাবুক ছেড়ে দাও কবি।

কবি : না, তারপর তুমি জান আমি কবিতা লিখি। জনসাধারণ আমাকে কবি বলে জানে। তুমি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বিভ্রান্ত করেছো তোমার কারখানার মজুরদের। সত্যি কি করেছি আর না করেছি আমি ভাবতে পারি না। I have done things which I can't think to-day and so I brood and bleed. Now a wretch, I have nothing left to exchange but the soul.

অবস্থা বুঝে সুচিত্রা আগে থেকেই ড্রয়ারটা খুলে রিভলবারটা বার করে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে।

মি. সেন : (হঠাৎ চাবুক ছেড়ে দিয়ে) Well then save your soul. (ছুটে গিয়ে ড্রয়ার হাতড়ায়) আমার রিভলবার কই?

কবি : That can't even pierce the soul Mr. Sen, calm down, please calm down.

মি. সেন : (কবিকে) Shut up you scoundrel! (সুচিত্রাকে) আমার রিভলবারটা কোথায় রেখেছো?

সুচিত্রা : জানি না।

মি. সেন : কোথায় আমার রিভলবার?

সুচিত্রা : আমার কাছে আছে। (টিপয়ের উপর রেখে দিল) নিতে পারো।

মি. সেন : নিতে পারো! মহত্ত্বের curbuncle সব। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। (কবিকে) You leave my house at once.

সুচিত্রা গুমরে গুমরে কাঁদছে।

কবি : চলে যেতে বলছ?

মি. সেন : Yes, at once. Renegade কোথাকার! (রিভলবারটা হাতে নিল) Get out.

কবি : (দূর থেকে হাঁটু গেড়ে বসে কুর্নিশ করার ভঙ্গীতে সুচিত্রাকে অভিবাদন জানালো) "I bow down, not to you but to the suffering humanity in your person."

মি. সেন : (কবিকে) Get out I say.

মিঃ সেন উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। মানুষের আস্ফালন দানবীয় ঔদ্ধত্যে হিংস্র হয়ে উঠল।... সশ্রদ্ধ মনে সুচিত্রার প্রতি বন্ধুর মনোষ্কামনা জানিয়ে কবি এবার চকিতে ঘুরে দাঁড়াল মিঃ সেনের দিকে। মিঃ সেন-এর প্রতি কবির এখন করুণা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। প্রশান্ত মুখে কবি মিঃ সেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখটা কঠিন হয়ে জমে গেল।

মি. সেন : I say get out... করুণা, করুণা করছো কবি !!!

রিভলবারটা তুলে ঘোড়া টিপলো বারবার। গুলি না থাকায় ব্যর্থ হল প্রচেষ্টা।... কবি হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়। মি. সেন উন্মত্তের মত রিভলবারটা খুলে কবিকে লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপতে লাগল।

কবির প্রস্থান।

মি. সেন : This is betrayal.... (সুচিত্রাকে) তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সুচিত্রা শুনলো কি শুনলো না ঠিক বোঝা গেল না। চূড়ান্ত কোন একটা কিছু করবার পূর্ব মুহূর্তে সে যেন ডুবে যাচ্ছে নিজের চিন্তার মধ্যে। হঠাৎ স্নায়ুতে লাগলো টংকার। সুচিত্রা নিজের রিভলবারটা মি. সেনের দিকে তুলে ধরলো। ক্ষীণ একটু হাসি অন্ধকারাচ্ছন্ন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ফসফরাসের মত জ্বলে উঠে যেন মিলিয়ে গেল চকিতে। তারপর রিভলবারের নলটা নিজের কপালে চেপে ধরে ঘোড়া টিপে দিল অবিচলিত-ভাবে সুচিত্রা।...লুটিয়ে পড়ল বরদেহ ধুলোয়।

মরো।

মি. সেন হাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে গেল।

□ □ □ □ □ □ □ □ **পটক্ষেপ** □ □ □ □ □ □ □ □

ষষ্ঠ অঙ্ক / শেষ দৃশ্য

কারখানা। ওপরে নীচে কাটা টিনের পাল্লার নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফুলকি উড়ছে আগুনের, আর সশব্দে বেজে চলেছে যান্ত্রিক অর্কেস্ট্রা— ঘট ঘট্টাং ঘট্টাং ঘট্— ঘট্ ঘট্টাং ঘট্টাং ঘট্, ঘট্ ঘট্টাং ঘট্টাং ঘট্। একটা শিফ্‌টেই কারখানার কাজ চালু রাখা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে মজুর ও মেকানিক যোগান দিয়েছে ঠিকাদার।

মঞ্চের ডান দিকে লোহার গেটের সামনে জনা-চারেক সশস্ত্র শাস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। লিফ্‌টের ধার ঘেঁষে পাক দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির রেলিং-এর গায়ে একটা লাউড-স্পীকারের চোঙ্গা লাগানো রয়েছে। মালিক মি. সেনের গলা মাঝে মাঝে ফেটে পড়ছে স্পীকারের মারফৎ। বাঁ দিকে দুটো বিরাট লোহার গরাদওলা গেটের পাল্লার কাছে শত শত মজুর জমায়েৎ হয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। করিডরের সামনে গজানন অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। সিঁড়ির ওপরেও কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীকে দেখা যাচ্ছে। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ডান দিকের লোহার গেটটা সামনে পেছনে দুলে-দুলে উঠছে কড়া-পড়া পাঞ্জার চাপ খেয়ে।

গজানন : খোল দু গেট। লেকিন ইয়ে ক্যায়সে করুঁ! নেমকহারামীকা কাম তো নেহি হোগা। লেকিন যো দেখতা হুঁ ওভি তো ঠিক নেহি হ্যায়। উচিত মাঙ্গোকে লিয়ে হামারেহি জাতভাই লড়রহে হৈঁ। উনকা ইসমে অন্যায় হি কেয়া হ্যায়।··· ইনকো তো কুছ কমি নেহি, দেঙ্গে কেঁও নেহি! যিন্ লোগোনে ইস্ বড়ে কারখানেকো চালু কিয়া হ্যায়, উনকো কেয়া ইস্ মুনাফেমে কোই অধিকার নেহি হ্যায়! ইত্নে আদমিয়োঁকি মাঙ্ কেয়া ঝুট্ হ্যায়! ইনকো জিনেকা কেয়া অধিকার নেহি হ্যায়! কিন্তু...কিন্তু, মঁায় কেয়া করুঁ···কেয়া করুঁ তব মঁায়···

সমস্বরে ধ্বনি ওঠে—মিল গেট খোল দো। মজদুরোঁকি দাবী কায়েম কর। সরমায়াদারকো জুলুম বন্ধ করো ইত্যাদি।

মি. সেন : (লাউড স্পীকার মারফৎ) আপনারা সব

চলে যান। অনর্থক মিল গেটের কাছে ভীড় করবেন না। চলে যান আপনারা সব। অনর্থক গোলমাল করবেন না।

জুতো আর ঢিলের বাড়ি লেগে সশব্দে নড়ে উঠলো স্পীকারের চোঙাটা।

আপনারা ফিরে যান। কারখানায় হামলা করলে কোনই লাভ হবে না। ফিরে যান আপনারা। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই রকম গোলমাল চলতে থাকলে অবস্থা একদম আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। তখন অনর্থক কতকগুলো প্রাণ বিপন্ন হবে। এখনও ফিরে যান। মিল গেটের কাছে হামলা করবেন না।

ভীষণ গণ্ডগোলের মাঝখানে আরও কিছু ইঁট পাটকেল চোঙার ওপর পড়তে থাকে। আক্রোশে কে যেন থুথু ছিটোতে থাকে চোঙাটাকে লক্ষ্য করে।

মিল গেটের দরজার কাছে ভীড় করবেন না। আপনারা মিল এলাকার বাইরে চলে যান ; নইলে অবস্থা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।
ভাইয়ো, আপ লোগ সব লৌট যাইয়ে। কারখানে পর হামলা মত কিজিয়ে। লৌট যাইয়ে আপ লোগ। এইসা গোলমাল হোনেসে সামহালনা মুস্কিল হো জায়েগা। তব খামখা কৈ জানোকা নোকসান হোগা। আব ভি লৌট যাইয়ে। মিল গেট পর হামলা মত করিয়ে। লৌট যাইয়ে...

গজানন : কেয়া খোল দুঁ !! খোল দুঁ ফাটক !!!

সমস্বরে ধ্বনি ওঠে—মিল গেট খোল দো। মজদুরোঁকি দাবী কায়েম কর। বুড়ো গজানন হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি থেকে সান্ত্রীগুলো ছুটে বেরিয়ে যায় বাঁ দিকের উইংস দিয়ে। নীচের কারখানা থেকে কয়েকজন স্যুটপরা কর্মচারী দৌড়ে উঠে যায় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে।

জনৈক কর্মচারী : (হন্তদন্তভাবে) চলে আসুন আপনারা, ওখানে দাঁড়াবেন না। চলে আসুন।

সিঁড়ি-পথে প্রস্থান।

স্পীকার : মিল গেট ছেড়ে দিন। আপনারা সব সরে যান। অবস্থা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে অনর্থক কতকগুলো লোকের প্রাণ যাবে, আপনারা সরে যান মিল গেট থেকে।

নেপথ্যে ভীষণ হট্টগোল শোনা যায়। সেন সাহেবকে চকিতে এক-নজর দোতলার সিঁড়ির মুখে দেখা যায়। কয়েকজন দারোয়ান দোতলা থেকে ছুটে নেমে যায় কারখানার ভেতরে। হট্টগোল চরমে ওঠে। একটু পরেই আহত গজাননকে ধরাধরি করে পণ্ডিত ও জনকয়েক শ্রমিক বাঁ দিকের উইংস দিয়ে বেগে এসে ঢুকলো। পেছনে পেছনে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে বহু মজুর স্টেজের ওপর দিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগল। হাতে তাদের আজ কঠিন আবেদনের পরোয়ানা।

গজাননকে কেন্দ্র করে ঘিরে বসল পণ্ডিত ও আর জনকয়েক মজুর।

গজানন : (চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে) পচ্চিশ বরষ —পচ্চিশ বরষ ম্যয়নে ইস্ কারখানেকি সেওয়া কি হ্যায়।... আয়াথা এক কিশোর হো কর...বচপন গয়া ...জওয়ানী বিতি...ঔর আজ যা রাহাহুঁ বহুৎ বুঢ্ঢা হোকর। হিসাব করনে পর দিয়া হ্যায় তো বহুৎ ; লেকিন মিলা কেয়া ! কেয়া মিলা !... পণ্ডিতজী তুম তো বহুৎ ভালে আদমী হো ; দুখিওঁকে লিয়ে তুম লড়াই করতে হো, তুম ইসকা বদলা লেনা— তুম ইসকা বদলা লেনা।

জবানবন্দী শেষ করে গজানন এলিয়ে পড়ে। চাদর ঢাকা মৃতদেহটা তখন তুলে ধরে পণ্ডিত ও আর কয়েকজন মজুর হাতে হাতে। অনেক মজুর ইতিমধ্যেই শববাহকের পেছনে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে।...শবযাত্রা এগিয়ে চলে।
কষ্ণুরেখাযিত সিঁড়ি পথ বেয়ে শ্রমিকদের আরোহণ-পর্ব কিন্তু তখনও থেমে যায়নি।

—পৌষ ১৩৫৪

▭ ▭ ▭ যবনিকা ▭ ▭ ▭

জননেতা । বিজন ভট্টাচার্য

জননেতা নরেন্দ্রনাথের দপ্তরখানা। ১৯০৫ থেকে ৫০ সাল— বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ পর্বের উদ্ভবকাণ্ড পর্যন্ত— দেশের রাজনৈতিক জীবনে নরেন্দ্রনাথ নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করেও জননেতা তেমন অক্লান্ত। দায়িত্বভার বেড়েছে বই কমেনি। বহু ভাবনায় মুখখানা ক্লিষ্ট— দৃষ্টি সন্ধানী। চোখে চশমা। ইজিচেয়ারে শুয়ে আপাতত কাগজ পত্তর পড়ছেন।

নরেন্দ্রনাথের বাঁ পাশে ছোট্ট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল— খাতাপত্তর কলমদানে সাজানো গুছোনো। দেওয়ালের হুকে চারপাঁচটা বড় বড় ভারী চিঠিপত্রের ফাইল লটকান। আর একটা মাঝারি সাইজের দেয়াল আলনা— চাদরটা তোয়ালেটা রাখার মত।

ইজিচেয়ারের ডান দিকে লম্বা লম্বি খানকয়েক বেঞ্চি পাতা। লোকজন এসে বসে দরকারে। দেয়ালে ভারতবর্ষের মানচিত্র।

পিছনের দেয়াল ঘেঁসে র‍্যাক—সংবাদপত্রের ফাইল; খাতাপত্তর দলিল দস্তাবেজ, বই ইত্যাদি ঠাসা। অফিস দপ্তরে কর্মীরা সব কাজে ব্যস্ত; টাইপরাইটারটি অনর্গল টাইপ করে চলেছে— ঝড়ের বেগে। লোকজন ঘুরঘুর করছে পিছনের দিকটায়—কাজেকর্মে সবাই ব্যস্ত। একটু হালকা আর নিস্তরঙ্গ কেবল সামনের দিকটা। কিন্তু তবু ইজিচেয়ারে চুপ করে কাগজ নিয়ে আধশোয়া অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ একাই গোটা দৃশ্যটার ভারসাম্য রক্ষা করেছেন অদ্ভুতভাবে। কারণটা হয়তো ব্যক্তিত্বই। কাগজপত্তর দেখছেন আর মাদ্রাজী স্যাণ্ডেল পরা ডান পাটা নাচাচ্ছেন। মাঝে মাঝে মুখ থেকে কাগজখানা সরিয়ে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটা যখন চশমার কাঁচের ওপর নিচ দিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করছেন, তখনই কেবল আঁচ পাওয়া যাচ্ছে নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের। কাজকর্মের ব্যস্ততা ছাড়া বাহুল্য কোন গোলমাল নেই। শুধু "বন্দে মাতরম" সংগীতের আবহ শোনা যাচ্ছে। টাইপিস্ট ভবানী টাইপ করা শেষ পাতাটি খুলে দশ পনেরো পাতার একটা টাইপ করা কপি জননেতা নরেন্দ্রনাথের কাছে আনে। নরেন্দ্রনাথ চশমা বদলে আস্তে দেখতে যাবেন টাইপ করা কাগজগুলো।

নরেন্দ্রনাথ। ইলেকশন ম্যানিফেস্টোটি কোথায়!...... দেখি।...(উঠে পড়েন) তুমি বাকিটা শেষ করে ফেলগে।...বাংলা তর্জমাটা হয়েছে সুরেশবাবু... (উত্তর না পেয়ে পিছনে তাকান) সুরেশবাবু কি বেরিয়ে গেলেন নাকি!

ভবানী। (টাইপ করা থামিয়ে) না এই তো ছিলেন।... আসবেন এক্ষুণি।

নরেন্দ্রনাথ। এলে একটু ভেতরে পাঠিয়ে দিও তো ভবানী।.. আর বল বাংলা কপিটা আজই প্রেসে দিতে হবে। তুমি ওটা শেষ করে ফেল।

প্রস্থান।

ঝড়ের বেগে টাইপ করে চলে ভবানী। খাকি হাফ-প্যান্ট, হাফ-সার্ট, মাথায় সোলার হ্যাট, পায়ে কাদামাখা গামবুট পরা জনৈক সুদর্শন কর্মচারী মিঃ দত্ত ফাইলপত্তরগুলি বগলে নিয়ে প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর প্রবেশ।

মিঃ দত্ত। রায়বাহাদুর আছেন?

সুরেশবাবু। আপনি·

মিঃ দত্ত। দেখুন আমি একটু প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বলবেন মিঃ মুখার্জী পাঠিয়েছেন, ডাকবাংলো থেকে আসছেন।

সুরেশবাবু। বসুন।

মিঃ দত্ত। ধন্যবাদ।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ফাইল রেখে বসে সিগারেট ধরান। দু-চারটে টান মারার পরই নরেন্দ্রনাথ আসছেন বুঝতে পেরে জুতোর তলায় সিগারেটটি ঠুকে নিভিয়ে ছাইদানিতে ডুবিয়ে দেন আস্তে। উঠে দাঁড়ান সসম্ভ্রমে। হাত তুলে নমস্কার করেন।

নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ।

মিঃ দত্ত। নমস্কার।

নরেন্দ্রনাথ। (ঘাড় নেড়ে উত্তরে) বসুন। (সুরেশবাবুকে) বাংলা তর্জমাটা তাহলে আজই প্রেসে পাঠিয়ে দেবেন! হুঁ (মিঃ দত্তকে) মুখুজ্জে সাহেব আপনাকে পাঠিয়েছেন! বসুন।

মিঃ দত্ত। আজ্ঞে, হ্যাঁ (ফাইল খোলেন) মানে, এই লিস্টটা আপনাকে একবার ফাইনালি দেখিয়ে নিতে বল্লেন।

নরেন্দ্রনাথ। ও (দেখেন)···তা এ লিস্ট করেছে কে? আপনি!

মিঃ দত্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নরেন্দ্রনাথ। আপনিই করেছেন? গতবারের লিস্টটা দেখেছিলেন নতুন লিস্ট করার সময়?

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ, মানে কতকগুলো নতুন নাম এবারে এনলিস্ট করা হয়েছে— এই হচ্ছে আপনার গতবারের লিস্ট, এবারের লিস্টে কতকগুলো নতুন নাম আর স্টকের উল্লেখ আছে।

নরেন্দ্রনাথ। হুঁ, মিঃ মুখার্জী এ লিস্ট অনুমোদন করেছেন?

মিঃ দত্ত। উনি দেখলেন, দেখে আপনার কাছে আমায় পাঠালেন।

নরেন্দ্রনাথ। মতামত কিছুই জানান নি।

মিঃ দত্ত। আজ্ঞে না।

নরেন্দ্রনাথ। তা এই যে সব নতুন নাম আপনি ঢুকিয়েছেন এগুলো কার পরামর্শ মত আপনি করেছেন?

মিঃ দত্ত। পরামর্শমত মানে আমি নিজেই স্থানীয় লোকের কাছে খোঁজপত্তর করে এবং কতগুলো জায়গায় নিজে গিয়ে অনুসন্ধান করে জোগাড় করেছি।

নরেন্দ্রনাথ। অর্থাৎ আপনি নতুন কিছু করতে চান। কেমন!

মিঃ দত্ত। না মানে···

নরেন্দ্রনাথ। বলুন, বলুন···

মিঃ দত্ত। এখানে যে কোটাটা ধরা হয়েছে তাতে করে আগেকার লিস্ট অনুযায়ী ধান সীজ করলে আমি দেখলুম কোন মতেই কোটা পূরণ করতে পারি না। আর এবার ওপর থেকে এই কোটা "ফুলফিলের" ব্যাপারে বেশ কিছুটা কড়াকড়ি করা হচ্ছে তাই···

নরেন্দ্রনাথ। বেশ করুন গিয়ে সীজ। লিস্ট যখন করে ফেলেছেন আপনি—

মিঃ দত্ত। তবু আপনার মতামতটা···

নরেন্দ্রনাথ। আমার মতামত— কেন জানতে চাইছেন আমার মতামত? ওপর থেকে কড়াকড়ি হচ্ছে এবং তদনুযায়ী আপনি ধান সীজ করবেন বলে লিস্টও তৈরী করে ফেলেছেন, এর মধ্যে···এই নিন আপনার লিস্ট।

ছুঁড়ে দেন

মিঃ দত্ত। আপনি স্যার অসন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হচ্ছে।

নরেন্দ্রনাথ। বোকার মত কথা বলবেন না। কদ্দিন কাজ করছেন আপনি এই বিভাগে?···আপনি কেন আগে আমার কাছে না এসে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে নিজে গিয়ে লিস্ট তৈরী করেছেন! আপনি বাইরের লোক, এখানে কার ঘরে কি আছে কি নেই, আমার চাইতে সে বিষয়ে আপনি বেশী খবর রাখেন, না!

মিঃ দত্ত। না সে তো সত্যিই।

নরেন্দ্রনাথ। তবে! নতুন কানুন তৈরি করছেন, না! নিয়ে যান আপনি আপনার লিস্ট।···ভবানী ওটা হয়েছে টাইপ করা?

ভবানী। আর সামান্য একটু বাকি আছে। এক্ষুণি হয়ে যাবে।

নরেন্দ্রনাথ। হলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

প্রস্থানোদ্যত।

মিঃ দত্ত। স্যার...আপনি অনর্থক ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন আমার ওপর। What I wanted was just to be sincere and honest...

নরেন্দ্রনাথ। And that in your own way...

মিঃ দত্ত। সে তো আমি স্বীকারই করছি স্যার। নিশ্চয়ই আমার ভুলচুক হতে পারে। আর আপনার কাছে আমার আসার কারণও তো তাই। এই লিস্টই যে ফাইনাল লিস্ট— এ কথা তো আমি বলছি না। আপনার অনুমোদনের পরই সেই লিস্ট আমি করব। Otherwise why I am here at all! আমায় mis-understand করবেন না, ভুল বুঝবেন না স্যার।

নরেন্দ্রনাথ। বসুন।...আপনারা ইয়ংম্যান, নতুন চাকরিতে ঢুকেছেন, energy আছে, zeal আছে সবটাই প্রশংসা করার মত but স্যার একটা কথা আপনারা ভুলে যান যে সব জায়গাতেই আজ একটা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আপনার প্রত্যেকটা শুভ প্রচেষ্টার ভেতর বাধা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। এখন এটা phenomenal হতে পারে manmade হতে পারে resistance একটা আছেই এই evilforce এর। বিশেষ করে মফঃস্বলে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও আরও পাঁচটা কারণে এটা বেশই আছে। এই এইসব জায়গা, যেখানকার স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের কোনই অভিজ্ঞতা নেই, সেখানে প্রথমেই আপনাদের আমাদের কাছে আসা উচিত আমরাই আপনাদেরকে সব চাইতে ভালভাবে সাহায্য করতে পারব। এ রকমটা আর কেউ পারবে না। সাহায্য করার নাম করে যারা দেখবেন এগিয়ে আসছে তারা হয় ভুল খবর দিয়ে আপনাদের হয়রানি করবে, নয় বিভ্রান্ত করবে, নয় বানচাল করে দেবে আপনার সৎ প্রচেষ্টা। আর আমরা করব আপনাদের সহযোগিতা।...আপনি মতামতের কথা বলছিলেন This is not a question of sanction but of co-operation। মতামতের প্রশ্ন নয়—সহযোগিতার প্রশ্ন। বুঝতে পারলেন!

মিঃ দত্ত। আজ্ঞে—

নরেন্দ্রনাথ। না কি...Come out young man!

লিস্ট দেখেন।

মিঃ দত্ত। না স্যার কোন সংশয় নেই। আপনার কথা সত্যিই...

নরেন্দ্রনাথ। (খুশি হয়ে) হ্যাঁ-া-া...তা এর আর দেখব কি নতুন নামগুলো তো বাদই দেবেন, এ একেবারেই ভুল, বিদ্বেষবশত কেউ হয়তো আপনাকে বলেছে যে এদের সব বড বড় স্টক আছে। খবরটা একেবারেই ভুল। আর এই লক্ষ্মীকান্ত, ত্রিলোচন আর সহায়রামের নামে যে স্টকের কথা আছে, এটা খানিকটা চাষীদেরই কোঅপারেটিভ স্টোর হিসাবে function করে এখানে ধর্মগোলার মত। আর এই দাগ দিয়ে দিলাম এই ক'জনের নামের পাশে, আপনি দিন পনেরো পরে একবার আসবেন, ইতিমধ্যে আমি অনুসন্ধান করে সঠিক খবর আপনাকে জানাব—এই নিন।

মিঃ দত্ত। ধন্যবাদ। আচ্ছা নমস্কার—

নরেন্দ্রনাথ। (উঠে পড়েন আগে) হ্যাঁ নমস্কার—ভবানী ওটা আমায় চটপট পাঠিয়ে দিও।...সুরেশবাবু আজকের কাগজের কাটিংগুলো রাখবেন। আমি মোটামুটি দাগ দিয়ে দিয়েছি। আপনিও পড়বেন—বিতর্কের সূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা আছে।

চরিত্রলিপি :

নরেন্দ্রনাথ। ভবানী। মি. দত্ত। সুরেশবাবু। লক্ষ্মীকান্ত। সহায়রাম। ত্রিলোচন। ভগবতীচরণ। জব্বর মিঞা। ১ নং। ২ নং। ৩ নং। ৪ নং। ৫ নং। সনাতন। পতিতপাবন। নরোত্তম। কৃপানাথ। ওকিলদ্দি পুঁটিরাম। সৃষ্টিধর। সখিচরণ। প্রাণকেষ্ট। রামনাথ। সাধু খাঁ।

সুরেশবাবু। মোটামুটি হেডলাইনগুলো দেখেছি, পড়বো-খন্।

নরেন্দ্রনাথ। হ্যাঁ পড়ে রাখবেন।

প্রস্থান।

মিঃ দত্ত উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ভয়ে ভক্তিতে এতক্ষণে ফাইলগুলি তুলে নেন বগলে।

সুরেশবাবু। (গামবুটের দিকে তাকিয়ে) ওঃ জুতোর কি অবস্থা হয়েছে মশাই আপনার য়্যাঁ! একেবারে রাজ্যের কাদা লেপটে ধরেছে দেখছি।

মিঃ দত্ত। আর বলেন কেন? শুধু জুতোর দেখলেন। এই কাদা আবার মুখেও ছটকে ওঠে। আচ্ছা নমস্কার।

সুরেশবাবু। নমস্কার।

প্রস্থান।

ভবানী। (টাইপরাইটারে লিখে) জয় হিন্দ!

প্রযোজনা সম্পর্কে দু চারটে কথা

মাইক্রোফোনের অসুবিধা থাকলে effect music বাধ্য হয়েই পরিহার করতে হবে, তবে তা বর্জন করবার জন্য যদি ঘটনার গতি ও বিষয়বস্তু ভালো করে বোঝা না যায়, সে ক্ষেত্রে কোন সবাক চরিত্রের মুখ দিয়ে সেটি স্বল্প কথায় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে হবে। যেমন লরীটার পালানোর ব্যাপারটায় ধাবমান লরীর শব্দ effect music হিসেবে ব্যবহার করতে হবে মাইক থাকলে। অন্যথায় লরীটা যে বামাল উধাও হয়ে যাচ্ছে সেটা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে হবে, জননেতার বক্তৃতার মাঝখানেই। নরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার উপর কথাটা একটু ছেদ দিয়ে দিয়ে যেন অন্ততঃ তিনবার বলা হয়। এখানে এতে করে নরেন্দ্রনাথের বক্তব্য যদি অস্পষ্টও হয় তো তাতেও কোন ক্ষতি হবে না— লেখক।

সুরেশবাবু। সেটা আবার কি!

ভবানী। ব্যস কপি ফিনিশ।

সুরেশবাবু। আ, শেষটায়—

সুরেশবাবুর প্রস্থান।

নেপথ্যে "বন্দেমাতরম"—আবছ শোনা যায়। ভবানী টাইপ করা কপিগুলো ঠিক করতে যাবে পিন দিয়ে।

ভবানী। (আবৃত্তির ঢং-এ) "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো"—তাদের সম্পর্কে হে ভগবান তুমি কি…

লক্ষ্মীকান্ত, সহায়রাম ও ত্রিলোচনের প্রবেশ।

লক্ষ্মীকান্ত। রাধামাধব, রাধামাধব, প্রেসিডেন্টবাবু আছেন?

ভবানী। আমি এখন আছি—কি বললেন, প্রেসিডেন্ট-বাবু?

লক্ষ্মীকান্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভবানী। আছেন। বসুন ডেকে দিচ্ছি।

টাইপ কপি সহ ভবানীর প্রস্থান।

লক্ষ্মীকান্ত। আবার বেরিয়ে না যান এর মধ্যে।

সহায়রাম। গেলেও কোথায় আর যাবেন ধরা যাবেই।

ত্রিলোচন। না বলা যায় না; জীপগাড়ি নিয়ে একবার বেরিয়ে পড়লে…!

লক্ষ্মীকান্ত। না ঐ তো রয়েছে জীপগাড়ি।

নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ।

নরেন্দ্রনাথ। এই যে তারপর? বসো…বসো…কি ব্যাপার তিনজন একে বারে এক সঙ্গে মিলে—

লক্ষ্মীকান্ত। আপনার ঠেঙেই এলাম।

নরেন্দ্রনাথ। হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি, এখন (রমেনকে) ও চিঠিটা শেষ হয়েছে!

সহায়রাম। বেরুচ্ছিলেন নাকি প্রেসিডেন্টবাবু!

নরেন্দ্রনাথ। না, হ্যাঁ মানে বেরুতে একবার হবেই। তা এই একজনের পর একজন আসছে যাচ্ছে। একে-বারে ফুরসুৎ করতে পারছি না। তা সে যাই হোক এখন বল দেখি কি ব্যাপার তোমাদের।

লক্ষ্মীকান্ত। ব্যাপারডা তাহলে খুলেই বলি ভনিতে না করে।

সহায়রাম। না ভনিতের কি আছে। সবকথা যখন খুলেই বলি ওনার কাছে, তখন…

ত্রিলোচন। হুঁ, তার আর কথা কি এটা।

লক্ষ্মীকান্ত। শুনেছেন তো কর্মকর্তারা সব এসে গেছেন ধান ধরতি। আমাদের মহেশপুর, বাখনখ, রূপকাঠি—সব তো কর্ডন এলাকা হয়েছে। এখন কাল থেকেই তো ধান সীজ হবে।

নরেন্দ্রনাথ। হ্যাঁ সে আর পাঁচ জায়গায় মত এখানেও তো হবে; আশ্চর্য হবার কি আছে!

সহায়রাম। না সে তো হবেই, এখন...

লক্ষ্মীকান্ত। আচ্ছা প্রেসিডেন্টবাবু আমাদের তো ঘাটতি অঞ্চল; কর্ডন এলাকার ভিতরে পড়ে কেমন করে!

নরেন্দ্রনাথ। ঘাটতি ঠিক বলতে পার না। পার কি?

ত্রিলোচন। কেন না?

নরেন্দ্রনাথ। দেখো, ভাবো। খবর তো অন্যরকম।

লক্ষ্মীকান্ত। কি রকম?

নরেন্দ্রনাথ। খবর হচ্ছে যে তোমাদের গুদামে যে ধান আছে তাই তো মোট কোটার প্রায় অর্ধেক ভাগ। আর বাদবাকি সারা তল্লাট কুড়িয়ে কি আর অর্ধেক হবে না। সুতরাং ঘাটতি ঠিক বলতে পার না।

লক্ষ্মীকান্ত। গুদোমের ধান মোট কোটার অর্ধেক তো হবে না। এ রকম ধারা আজগুবী হিসেব কেডা করল।

নরেন্দ্রনাথ। আচ্ছা বেশ তো অর্ধেক না হয়ে ধর সিকি ভাগই হল; তাই বা কি!

ত্রিলোচন। যাই বলুন, এখন এই গুদোমের ধান চালই কিন্তু তামাম এলাকার গেরস্তর সম্বল। গতবারের কথা ভেবে দেখবেন, সারা মুল্লুকে যখন এক দানা চাল নেই, সরকারী রেশনিং বরাদ্দ তাও যখন ঠিকঠিক পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন বলতে গেলে আমাদের গুদোম থেকেই খোরাকি চলেছে মানুষের। আপনিও জানেন সে কথা। এখন এবার ফলনের যা শোচনীয় অবস্থা, তাতে গুদোমের ধান যদি সীজ হয়ে যায় তা হলে এ তল্লাটে মানুষ সব না খেতে পেয়ে মরবে বল্লাম। দেশের মানুষরে বাঁচানো যাবে না কিন্তু এমন তেমন হলে।

নরেন্দ্রনাথ। তা আমি কি আর সে কথা বুঝছি না। আমি তো জানি! আর কেবল কি আর সে কথা বুঝবে?

লক্ষ্মীকান্ত। সকলে না বুঝল, আপনি বুঝলি আবার আর কার বোঝার অপেক্ষা করব। পেটে টান পড়লে সকলে তো আপনার কাছেই ছুটে আসবে। তখন তো আপনিই বলবেন লক্ষ্মীকান্ত যেমন করে পার ব্যবস্থা করে দাও।

নরেন্দ্রনাথ। বুঝতে পারছি সব কথা। আচ্ছা দেখি কি ভাবে কি করি। সম্বল একটানা রাখলে চলবে কেন? এখনই তো রাজ্যি জুড়ে খাই খাই পড়ে গেছে।

লক্ষ্মীকান্ত। তো তবে; আপনি তো সবই বুঝছেন বেশী কি বলব।

নরেন্দ্রনাথ। দেখি, তবে ইলেকশনের আগটা পর্যন্ত আমার কথামত কিন্তু কিছু কিছু ধান ছাড়তে হবে। বুঝতে তো পারছ অবস্থা। কিছু কিছু ছাড়ো।

লক্ষ্মীকান্ত। আপনি বল্লে ছাড়িনি; এমন কখনও হয়েছে আগে! বিশেষ এবার তো আমরা ঠিক করেই রেখেছি যে আপনার খাতিরেও ধান আমরা...

নরেন্দ্রনাথ। মনে কর না আমার স্বার্থটাই সব। এটা জেনো যে এবার যদি না দাঁড়াতে পারি ভালভাবে, তাহলে নতুন সব লোকের হাতে পড়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও তোমাদের লাটে উঠে যাবে।

লক্ষ্মীকান্ত। তা আর বলে বোঝাতে হবে না। আমরা বেশ বুঝতে পারছি।

ত্রিলোচন। বাপুরে সে এর মধ্যেই যা সব ধ্বনি দিচ্ছে সব—কেউ বলছে তুলে দেবো জমিদারি ব্যবস্থা, কেউ বলছে জমির প্রকৃত মালিক হবে চাষা, কেউ বলছে পাইকারদের ধরে ধরে মাথায় ঘোল ঢালবে। এই সব কথাবার্তা।

নরেন্দ্রনাথ। আরে রাখো, যত গর্জায় তত বর্ষে না। ও মেঘে বৃষ্টি আর হতে হচ্ছে না।

লক্ষ্মীকান্ত। এও ঠিক, তবে আবার হেলাফেলা করাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এবারের অবস্থা খুব টালমাটাল।

সহায়রাম। তা সে কথা যথার্থ। এমনি বলে শুনতে পাই যে এবার যদি আকাল হয় তো মানুষ নাকি সেই পঞ্চাশ সালের মত চুপ করে মরবে না। পথে ঘাটে, খুব হৈ চৈ করবে।

নরেন্দ্রনাথ। তা না খেতে পেয়ে মরতে হলে হৈ চৈ তো একটু করবেই।

সহায়রাম। না সেই কথাই বলছি। বলি খুবই নাকি গণ্ডগোল করবে মরার আগে?

নরেন্দ্রনাথ। তা করবে। দিন ক্রমেই জটিল ক্রমেই ঘোরাল—কিন্তু হাল ছোড়ে দিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

ত্রিলোচন। না কষে ধরতে হবে হাল। ঘাবড়ালে চলবে কেন?···তেজী মন্দা— সংসারে এ আছেই।

লক্ষ্মীকান্ত। এমনিতে যে রকম কথা বার্তা সব শুনি হাটে বাজারে, তাতে করে আপনার বিপক্ষে যে কেউ ভোট দেবে না, এটা বুঝতে পারি।

নরেন্দ্রনাথ। হাটে বাজারের বাইরেও বড় জায়গা আছে— সেখানকার মানুষের মন তুমি জান না। কাজেই কারকিতি বিস্তর করতে হবে। এখন এর জন্য চাই অর্থবল লোকবল; একটা নির্বাচন জয় করা মানে তোমার যাকে বলে গিয়ে একটা রাজ্যি জয় করা সুতরাং···

ত্রিলোচন। আপনি দাঁড়ান, ও কিছু ভাববেন না। ঝুঁকি যেমন আপনার তেমনি আমাদের।···অর্থবল লোকবল···সে অভাব হবে না।

নরেন্দ্রনাথ। সেই ভরসাতেই তো দাঁড়ান; দেখি এখন···আর আমি দেখবখন ঐ ব্যাপারটা। যা দিয়ে যা হয়···

ভগবতী চরণের প্রবেশ।

আরে কি কাণ্ড। এসো এসো; আমি ভাবলাম বলি সেই যে গেল ভগবতীচরণ কলকাতায়, ফিরে এসে একবার দেখাটি পর্যন্ত করলে না। কেমন তরো কথা হল। বসো লক্ষ্মীকান্ত।

ভগবতীচরণ। আর বলবেন না সে ঝামেলার কথা। ঐ যে কথায় বলে না বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, তা আমারও সেই দশা করলো। হয়রানির একশেষ। ইয়ার মধ্যে দুই দুই বার কলকাতা যাইতে হইল, খালি দৌড়ঝাঁপের পরই আছি। আজ ফিরছি তিনটার গাড়িতে! গদির থিকাই আপনার এখানে আসলাম বাসায় পর্যন্ত যাই নাই।

নরেন্দ্রনাথ। ও তারপর খবর কি বলো!

ভগবতীচরণ। খবর মানে স্যাংশন হইয়ে যাবে, তবে সই-টই হয়ে কাগজপত্তর বার হতেই যা একটু সময় নেবে। তা গদিতে এসে শুনলাম আপনি আজ কালের মধ্যে কলকাতায় যেতে পারেন তাই ভাবলাম বলি···

নরেন্দ্রনাথ। ঐ কাগজপত্তরগুলো এটু তাড়াতাড়ি বার করার ব্যাপারে বলছো তো! তা সে আমি গেলেও তোমাকে তো আমার সঙ্গে যেতে হবে।

ভগবতীচরণ। না সে আমি তো যাবেই, বাঃ গরজ আমার...তাহলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।

নরেন্দ্রনাথ। বেশ কথা। এদিকে বুঝছো তো সময় হাতে খুব বেশী নেই। নড়াচড়া শুরু করতে হয়। টাকাকড়ির সমস্যা বাদেও হাতে তোমার বিস্তর কাজ। ইলেকশন কমিটির লোক হয়ে বসে আছ।

ভগবতীচরণ। আচ্ছা আচ্ছা, সে অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা একটা করা যাবে; তার জন্যে আর চিন্তা কি আছে!

নরেন্দ্রনাথ। না মানে কথা হচ্ছে···আরে কি খবর জব্বর মিঞা সাহেব,—আসুন আসুন।

জব্বর মিঞার প্রবেশ।

বসুন—তারপর। কি মনে করে।

জব্বর মিঞা। মনে করে মানে ধান তো সব সীজ করতে লেগেছে। তা ধনেখালিতে গোলা বলতে এক আমারই আছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে ক'ঘর মুসলমান আছে তারা প্রধানত আমার ঠেঙেই ধারকর্জা নেয় দুর্দিনের বাজারে। কারণ এমনিতে বেশ সদ্ভাব থাকা সত্ত্বেও বর্ধিষ্ণু হিন্দু জোদ্দার গেরস্থর কাছে মুসলমানরা সচরাচর এই আপনার গিয়ে ধান কর্জ বা পয়সা কড়ির ব্যাপারে লেনদেনের ব্যাপারে যেতে চায় না। ফলে আমারই হয় মুশকিল। দায়ে বেদায়ে

আমার কাছেই আসে, এমতাবস্থায় আমার ঐ গোলার ধান যদি সীজ হয়ে যায় তাহলে সাধারণ মুসলমান প্রজার খুবই মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়। এখন আপনার কাছে আমার এই আর্জি হয় যে মাইনরিটির স্বার্থের দিকে চেয়ে আপনি যদি…

নরেন্দ্রনাথ। এখানে একটা কথা বলি প্রসঙ্গত, কিছু মনে করবেন না কিন্তু কেন না খোলামেলা আলোচনা হওয়া ভাল। বিষয় এই যে "মহেশদর্পণে"র গত সপ্তাহের সংখ্যায় এই মর্মে এক সংবাদ বেরিয়েছে যে মাইনরিটির স্বার্থের নাম করে আপনি না কি এই ধানচাল ব্লাক মার্কেট করেন ; শুনুন…

জব্বর মিঞা। কি সর্বনেশে কথা ; দোহাই ধর্ম আপনি বিশ্বাস করুন…

নরেন্দ্রনাথ। আহা-হা-হা আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুলছেন কেন ? ব্যক্তিগতভাবে আমি এই চিঠির কোন মূল্যই দি না— মিথ্যে কথা। সে কথা না। কিন্তু তবু পাঁচ কানে উঠলে কথাটা অন্যরকম দাঁড়ায় কিনা। ব্লাক মার্কেট করেছে, হ্যাঁ, মাত্তর তিরিশটা দাদন দিয়ে গরীব মুসলমান চাষীর সব পাটখেতগুলো কিনে রেখেছে হ্যানা ত্যানা— নিচে স্বাক্ষর আছে আবার আপনারই স্ব-শ্রেণীর একজন লোকের— জনৈক মুসলমান।

জব্বর মিঞা। হাই হাই রে, এই জন্যেই নিজ জাতের মঙ্গল করতে নেই। এই রকম এট্যা সর্বনেশে কথা— হাই হাইরে…

নরেন্দ্রনাথ। যাগগে আপনি অনুতপ্ত হবেন না তার জন্য। কারণ জানবেন সংসারে ভাল লোকের কখনও শত্রুর অভাব হয় না ; আর যে যত ভাল তার তত শত্রু। আমি আজ এই কথাটা মর্মে মর্মে জানতে পারছি। পঞ্চাশ বছর দেশের সেবা করে…যাগগে ! তা আমার কথা হচ্ছে আপনার স্ব-শ্রেণীর মধ্যেই এই রকম সব লোক আছে। এ বিষয়ে আপনি একটু খোঁজ খবর নেবেন তো !

জব্বর মিঞা। "জনৈক মুসলমান"— এই কথা লিখল !

নরেন্দ্রনাথ। হ্যাঁ সে ব্যক্তি যে মুসলমান সে বিষয়ে আমার বিন্দু মাত্র সংশয় নেই। কারণ তার লেখার ঢং, জবান, বিশেষ করে আপনার জীবনের ব্যক্তিগত যে সব বিষয়ের অবতারণা করেছে চিঠিতে তাতে করে মনে হয় যে আপনার স্ব-শ্রেণীর কোন ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া এ সব তথ্য সংগ্রহ করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

জব্বর মিঞা। আমি আজই খবর করব তো, হাই হাইরে নাঃ ! এ কালে মান্‌ষির ভাল করতে নাই। হাই, হাই, হাই হাই।

নরেন্দ্রনাথ। আর আপনি যে কথা বললেন দেখি সে বিষয়ে আমি কতটা কি করতে পারি। কারণ আপনি জানবেন জব্বর মিঞা যে মাইনরিটির কোন দিক থেকে কোন অসুবিধা হয় এ আমি কোন দিক থেকেই বরদাস্ত করব না। তার জন্য ইলেকশন থেকে যদি আমারে সরে আসতে হয় তো সেও আমি স্বীকার আছি।

জব্বর মিঞা। না সে আপনি একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।

নরেন্দ্রনাথ। আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না মিঞা সাহেব— একথা জানবেন।

জব্বর মিঞা। না সে কথা তো আমি জানিই। আমাদের জন্য আপনি যা করেছেন সে কথা তো মুখে বল্লে ফুরোবে ! সেই বিশ্বাসেই তো ছুটে ছুটে আসি।

নরেন্দ্রনাথ।…তা হলে ঐ কথাই থাকল ভগবতীচরণ, আজ হোলো গিয়ে তোমার বুধবার, বৃহস্পতিবার গুরুবার, কালকের দিনটা বাদ দাও, পরের দিন শুক্রবার, দুপুরের গাড়িতে চল।

ভগবতীচরণ। বেশ তাই চলেন !

নরেন্দ্রনাথ। রবিবার ছুটির দিন ; দেখা সাক্ষাৎ যা করার ঐ দিনই সব সারা যাবে…কি একটা গণ্ডগোল হচ্ছে না !

নেপথ্যে হট্টগোল—জন নেতার কাছে গ্রামবাসীর আর্জি নিয়ে এসেছে তাদের দুঃখ লাঘবের।

খুবই হৈ চৈ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

জব্বর মিঞা। হুঁ এট্যা হট্টগোল হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

নরেন্দ্রনাথ। আ সুরেশবাবু! কি ব্যাপার কি সুরেশ বাবু? ভবানী এট্টু দেখ তো।...সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষগুলোও হয়ে উঠেছে তেমনি বেয়াড়া; দিনরাত খালি এ চাই, তা চাই, চাল চাই, বস্তর চাই; যেন হাতে করে সব নিয় বসে আছি আমি সব সময়। অথচ সুবুদ্ধি দাও, দেখবে তখনই গালমন্দ পারবে।

জব্বর মিঞা। একেবারে কচি বাচ্চার পানা— সমস্যা বোঝবে না কিচ্ছু সমঝাবে না...

ভগবতীচরণ। যা বলিয়েছেন—

লক্ষ্মীকান্ত। খাঁটি কথা ধরেছেন।

নরেন্দ্রনাথ। আর ধানচালের সমস্যা কি সোজা সমস্যা। অত সহজে কি সমাধান হয়। বড় বড স্বাধীন দেশ গুলোই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর তারপর এখানে এট্টার পর এট্টা লেগেই আছে। অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল হল না, তোমার দোষ, রোদ্দুরে জলে গেল খেত, তোমার দোষ, পঙ্গপালে উজাড় করে গেল খেত-খামার, তোমার দোষ, হিন্দুস্থান পাকিস্থান হবার পর মুসলমান চাষীরা দেশান্তরী হয়ে হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ বিঘে আবাদী জমি পতিত রেখে গেল ফলন হল না, তোমার দোষ, লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা সমস্যা সেও তোমার দোষ, দিনরাত শোন এই অসন্তোষের কথা। আরে দুঃখকষ্ট তো আছেই। সে আর কার নেই; আমার নেই, আপনার নেই, ধনীর নেই, কি হয়েছে কি, এত গণ্ডগোল?

ভবানী। কি সব বলছে—গণ্ডগোলে বোঝা যাচ্ছে না। ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গিছল নাকি সব আর্জি নিয়ে তা তাঁকে সেখানে না পেয়ে আপনার কাছে এসেছে।

নরেন্দ্রনাথ। আবার আমার কাছে কেন! তুমি দেখ আবার ভেতরে ঢুকে না পড়ে সব হৈ চৈ করে।

নেপথ্যে হট্টগোল।

ভবানী। আপনি যান; ওরা ভীষণ গণ্ডগোল করছে। বলছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

নরেন্দ্রনাথ। আচ্ছা তুমি বল গিয়ে আমি যাচ্ছি, আচ্ছা ফ্যাসাদের কথা দেখি, চলুন যাই দেখি...আপনারা এগোন... সুরেশবাবু...

ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

। । । । । । । **অন্ধকার** । । । । । । ।

সূচনায় নরেন্দ্রনাথের অফিসে যে সব সরঞ্জাম ও আসবাব পত্র আছে এখানে অন্ধকারের ভিতর সেগুলো সব বাদ করে দিতে হবে। পিছনে থাকবে শুধু একটা উঁচু জায়গা—খানিকটা প্লাটফর্মের মত—সেখানে নরেন্দ্রনাথ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এসে দাঁড়াবেন। আর জনতার ভিতরে সবাক চরিত্রগুলো দাঁড়াবেন মঞ্চের ডানে বামে, নির্ব্বাক ভিড়ের লোক থাকবেন মাঝখানে।

দু তিন খানা গ্রামের লোক ভুখা মিছিল করে নরেন্দ্রনাথের দরবারে এসেছে আবেদন নিবেদন নিয়ে। অন্ধকারের ভেতর তারা সমস্বরে আবেদন জানাচ্ছে কর্ডন রহিত কর; ধান নিওনা, কন্ট্রোল প্রথায় রেশন বরাদ্দ কর। আহার দাও, পরনে কাপড় বরাদ্দ কর।

মঞ্চ অন্ধকার ছিল, হঠাৎ হট্টগোলের ভিতর আলোক সম্পাত হয়। ত্বরিৎ পায়ে গোলমালের মাঝখানে প্রবেশ করেন নরেন্দ্রনাথ, ভগবতীচরণ, লক্ষ্মীকান্ত, জব্বর মিঞা প্রভৃতি।

নরেন্দ্রনাথের দ্রুত প্রবেশ।

১ নং। সনাতনদা শক্ত থেকে। বেশ ভাল করে গুছিয়ে বলা চাই হ্যাঁ। বেশ ..

২ নং। হ্যাঁ কথার মারপ্যাঁচের ভিতরি পড়ে গেই হারিয়ে ফেলো না যেন। যা বলবা "পষ্ট" করে।

৩ নং। না দফাওয়ারী ভাবে এক এক করে বলে যাবা, বেতালা হয়ো না।

৪র্থ। পতিতপাবন সামলে রেখো সনাতনদারে।

হট্টগোলের মাঝে নরেন্দ্রনাথ ওঠেন।

নরেন্দ্রনাথ। চুপ করো চুপ করো। কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

শান্ত হয়ে যাবে জনতা।

...বলি গোলমাল করাটা যখন উদ্দেশ্য না, তখন খামখা এটা চাই সেটা চাই করে চেঁচালেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।...তাই বলি আস্তে আস্তে বল। আস্তে!...আমি তোমাদের কথা শুনতে চাইনে, এই সন্দেহ নিয়ে তো আসনি তোমরা আমার কাছে! সুতরাং হৈ চৈ করো না। সনাতন!

৫ নং। সনাতন দা। হেই সনাতন দা!

নরেন্দ্রনাথ। থাক, তোমারে উকিল ঠাওরায় নি সনাতন। ও নিজেই বলতে পারবে। উস্কোচ্ছে !...বল সনাতন তুমি কি বলবে। তুমি, পতিতপাবন, নরোত্তম, আর যারা তোমাদের তরফের কথা বলতে পারবে গুছিয়ে, আমি বলি, তারা এগিয়ে এসো চার পাঁচ জনা, আমরা একটু শান্তিতে বসে বিষয়গুলো আলোচনা করি।

হট্টগোল—আপত্তি ওঠে।

পতিতপাবন। না প্রেসিডেন্টবাবু, ও স্বতন্ত্রভাবে চার পাঁচ জনার সঙ্গে আলাপ আলোচনার দরকার নাই। কথা আমরা প্রকাশ্যেই বলব। ঢাকা চাপা যখন কিছুই নাই তখন...

সনাতন। হ্যাঁ মানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করে বুঝলেন কোন লাভ নেই। এখন আমাদের মুস্কিল যেটা, সেটা আশাকরি প্রেসিডেন্টবাবু বুঝবেন। মুস্কিল এই যে স্বতন্ত্রভাবে দুচার জনের সাথে আলোচনা করলে আপনারা বলবেন যে, এটা হচ্ছে তোমাদের ব্যক্তিগত কথা; সকলের কথা এই রকম না। আবার প্রকাশ্যে যখন সকলের সামনে কথা বলা হয়, তখন আপনারা বলবেন— অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—এভাবে কোন রকমই আলাপ আলোচনা করা যায় না।... দুরকমের যে কোন ভাবেই কথা বলতে যাই না কেন; এই যে আমাদের বক্তব্য বিষয় আপনারা বরবাদ করে দিতে চান টালবাহানা করে— এটা খুবই দুঃখের বিষয়। সুতরাং আমরা যা বলবার তা সকলের সামনেই বলব এবং শান্ত ভাবেই বলব। তবু আশা করব যে আপনি আমাদের সমস্যাগুলি বোঝবেন এবং সেই মত ব্যবস্থা করবেন এই কথা।

নরেন্দ্রনাথ। (হাসি) একবার না, দু'বার না আমি বলব, একশ বার! দরকার হলে একশ বার শুনব, একশবার বুঝব।...কে বল্লে তোমারে আমি তোমাদের কথা বরবাদ করে দিতে চেয়েছি। কেউ বলতে পারে !! কেউ পারে না।...তবে হ্যাঁ, বক্তব্য শুনেও অভাব অভিযোগ জেনেও; সমাধান সেরকম একটা করতে পারি নি। তা সে কথা স্বীকার করতে আমার কিছু মাত্র লজ্জা নেই। পারি নি কারণ... অক্ষমতা। অবশ্য সে অক্ষমতারও কারণ আছে। আমি পরে বলছি সে কথা। এখন আগে তোমাদের কথা শুনি। হঁ বলো !!

সনাতন। কথা এই যে কর্ডন করে যে ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে, এটা কি বলব একেবারে যাচ্ছে-তাই। সরকার কি বলছে যে খোরাকির ধান সীজ করবা! অথচ আমার গেরামে একধারসে সামান্য এই খোরাকির ধান সীজ করা হচ্ছে! অথচ জোদ্দার মহাজনের গোলায় হাত দেওয়া হচ্ছে না। তামাম গেরামে অভাবী চাষীর ঘরে আজ একদানা চাল নাই। তারা আজ না খেতে পেয়ে মরবার মুখে। বিষয়টা কি! জোদ্দার মহাজনের গুদামে যে হাজার হাজার মণ চাল। লক্ষ লক্ষ মন ধান রয়েছে এবং যে ধান-চাল যথেষ্ট চোরা-বাজারে চালান হচ্ছে, সেই ধান-চাল সীজ করা হচ্ছে না কেন!

নরেন্দ্রনাথ। সীজ করা হচ্ছে না।...এটা ভুল কথা। সব ক্ষেত্রেই সীজ করা হচ্ছে, তবে যাদের একমাত্র লাইসেন্স আছে....

পতিতপাবন। আমাদের এতগুলো "জান" এর লাইসেন্স নেই সামান্য খোরাকির ধান ধরে রেখে, আর হাজার হাজার মণ ধান চাল ব্ল্যাক মার্কেট করার সুবিধা করে করে দিয়ে শ' শ' "জান" পয়মাল করার লাইসেন্স প্রেসিডেন্টবাবু কোন্ সুবাদে দেওয়া হবে আমাদের বলবেন!

নরোত্তম। সরকারী কোন কানুনে একথা লেখা আছে আমরা জানতে চাই।

ভগবতীচরণ। আহা আইস্তা আইস্তা বাত কর ভাই।

নরোত্তম। আইস্তা আইস্তা. কি গালগল্প করতে এসেছি নাকি এখানে...আইস্তা, আইস্তা। কায়দা শোন কথার!

নরেন্দ্রনাথ। আ হা খামোখা গলাবাজি করে কোন লাভ হবে! ব্ল্যাক মারকেট সরকার তো করতে বলছে না! এ সব হল নিজেদের ভেতরকার কেলেঙ্কারীর কথা। এখন নিজের ঘরের ভেতর যদি কোন কল-

ক্ষের বিষয় ঘটে, তো ঢাক ঢোল পিটিয়ে সেই লজ্জার কথা জোর গলায় জাহির করায় ইজ্জৎ বাড়ে না কমে— সেই কথাটা আমায় তোমরা বল! জানি পাপী আছে পাপাচারও ঘটে সংসারে— কিন্তু তার নিরসনের উপায় কি এই রকম করে!

কৃপানাথ। এখন পাপ আপনার সেই কবে কায়দার উপায়ে নিরসন হবে তার জন্যে বসে থাকলে তো মানষির ঘর সংসার সব উজোড় হয়ে যাবে। পাপ নিরসন করবেন আপনি কার জন্যে?

নরেন্দ্রনাথ। এটাও একটা তুমি কায়দার কথা বল্লে। এভাবে কথা বল্লে তো কোন উপায়ই নেই।

কৃপানাথ। কেন উপায় থাকবে না! উপায় আছে। উপায় এই যে এখুনি কর্ডন রহিত করে দেন। মানুষ-জন সব না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। তাদের বাঁচাবার জন্যি ঐ সব বদমাইস চোরাকারবারীগুলোর লাইসেন্স ফাইসেন্স সব বাতিল করে দিয়ে অভাবী মানুষের সামনে চোরের গুদোম খুলে খুলে দেন। যে সব অনাবাদী জমি পড়ে আছে সেগুলোর আবাদের জন্যে দরকার মত কৃষিঋণ দেন, হাতে হাতে আবাদ হয়ে যাক সব জমি। কত কি উপায় আছে। আর আপনি উপায় দেখছেন না? পেটে ভাত নেই, পরণে বস্তর নেই অথচ লক্ষ্মীকান্ত আর সাধুখাঁর গুদোমের হাজার হাজার মণ চাল পাচার হয়ে যাচ্ছে চোরা বাজারে, ঐ ভগবতীচরণ আর কুণ্ডুদের গদির গাঁট গাঁট কাপড় নৌক করে লোপাট হয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে আপনি দেখতি পারেন না!

নরেন্দ্রনাথ। দেখতে আমি সবই পাই কৃপানাথ। কিন্তু এই রকম করে কথা বল্লিই তো সমাধান করা যায় না সমস্যার। তোমরা চাও রাতারাতি সত্যিকার রাজত্বি কায়েম হোক, বলি তা কখনও হয়? ও রকম আলটপকা যদি কথা বলো তো আমিও বলতে পারি যে কৃপানাথ তুমি তোমার দু'খানা হাতে ধরা-ধামে ঐ স্বর্গটা টেনে নামাও, কেমন— বলতে পারিনে? তা এ হল এট্টা আজগুবি কথা। আজগুবি কথা সত্যি হয়ে ওঠে না। আসল কথা কি জানো কৃপানাথ, পাপ মহাপাপ। নয় তো কি আর সুজলা সুফলা আমার এই জেলার আজ এই হাল হয়। সব জায়গায় সে একেবারে খাই খাই নেই নেই সে একে-বারে হা-ভাতের সংসার। এ কেন হয়?

নরোত্তম। সেই কথাই তো বলছি।

নরেন্দ্রনাথ। হ্যাঁ তোমরা আর বলবে কি, আমিই তো বলে দিচ্ছি তোমরা যা বলতে চাও।

ওফিলদ্দি। হায়রে নসীব রে···

নরেন্দ্রনাথ। আঃ কে রে!

নরেন্দ্রনাথ। তা মানব সব হয়ে উঠেছে দানব···ঐ যে সেই ছোট বেলাকার রাক্ষসের গল্প আছে না— হাইলো মাইলো মানষির গন্ধ পাইলো, ধরে ধরে খাইলো।—তা অনেকটা সেই রকম। কেন! এই জেলারই দয়ারাম ঠাকুর দরগার পীর সাহেব, টুকরো টুকরো ফলমূল, কোনদিন যদি হয় তো বড় জোর ছটাক খানেক দুধ— এই খেয়েই তো আশি-নব্বই বছর বেঁচে গেছেন? আর মানুষের যা দিয়ে গেলেন সোনা রুপোয় তার ওজন হয় না। তা এও তো আছে আমাদের দেশে।

নরোত্তম। হুঁ কোথায় রাম-রামের ধ্বনি আর কোথায় ব্যাঙের কোঁকানি। তেনারা তো দেবতা!

নরেন্দ্রনাথ। ঠিক কথা, দেবতা, দেহধারী নরদেবতা। কিন্তু তাই বলে আমরাও তো মানুষ! তাঁদের তুলনায় এত খেয়ে পরে আমাদের অপদেবতা হবার কোন যুক্তি আছে? অন্তত মানুষ তো আমরা হতে পারি।

কৃপানাথ। কেন দয়ারাম ঠাকুর আর পীর সাহেবের কমি কি আমরা? তেনাদের চাইতে বেশীও খাইনে, ভালো বই কারো মন্দ 'চিন্তে করিনে। তবু সেই ফলটা-আশটা আর ছটাক খানেক দুধই তো আমাদের কপালে জুটছে না।

নরেন্দ্রনাথ। সে কথাও আমি জানি।

কৃপানাথ। তবু জেনে শুনেও শাস্তর শোনাচ্ছেন!

নরেন্দ্রনাথ। অপব্যাখ্যা করো না। অপব্যাখ্যা করো না, তিলতিল করে নিজেদের আর এই রকম ভাবে মেরে ফেলো না কৃপানাথ, আমি বলছি। আমি

বলছি নে যে তোমরা না খেয়ে না পরে তুষ্ট থাক, সাধারণ মানুষ আমরা, আমরা তা পারবই বা কেন? কিন্তু আদর্শের বিষয়ে, বড় বড় মহাপুরুষদের জড়িয়ে এই সব ভাল ভাল কথা, যে সব কথা উচ্চারণ করলে নাকি তিনকালের কাজ হয়, সে সম্পর্কে আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা থাকবে না কেন? কি বল সনাতন!

সনাতন। না সে তো থাকবেই, সে তো অস্বীকার করবে না কেউ। তবে প্রেসিডেন্ট বাবু দেখুন, বর্তমান দিনে, যে কালে মানষির ঘরে ঘরে হাহাকার এতো গালগল্প না, আপনি সবই জানেন···

নরেন্দ্রনাথ। তা জানি নে!

সনাতন। এই আকালের দিনি···গত দুভিক্ষের সময় মানুষ তবু শাক পাতা খেয়ে ছিল আর এবার কি বলব, বল্লি পরে ভাল শোনায় না পুবির ভিটে ছাড়া মানষির কল্যাণি সেই শাক পাতা কচু ঘেচুও পাবার যো নেই, এমনি অবস্থা!

নরোত্তম। তারও দাম আপনার গিয়ে সিকে সিকে।

নরেন্দ্রনাথ। তা হবে জিনিষপত্তর যা আক্কারা...

সনাতন। হ্যাঁ এই রকম অবস্থায় নিজিদের ঘরে নেই ধান কারো ঠেঙে যে কর্জা পাওয়া যাবে এমন অবস্থাও কারো নেই—মহাজন লোক দু'মাস আগে বিশ পঁচিশ টাকা দাদন দিয়ে পাট খেতগুলো সব কিনে রেখেছে, এখন সেই পাট তারা মণ করা নব্বই একশ টাকায় বেচবে সুতরাং এক কানাকড়ির আশা এখানেও নেই— এখন বলুন, মানষি যে বাঁচবে কি করে বাঁচে!

নরেন্দ্রনাথ। সবটা না হোক কতকটা অসুবিধা আমি বুঝতে পারি; কিন্তু কি করব সনাতন ব্যক্তিগতভাবে আমি আর কতটুকু করতে পারি। আমার তো সেই ব্যক্তিত্ব নেই, পর হস্তগত ব্যাপার। এখন কিছু বলতে গেলেই সেই কথা আমার থাকবে না। অনেক ব্যাপার সনাতন; সে তোমারে আর কি বলব, এখন এর খোল নলচে পালটাতে হবে। সবই দেখছি সবই বুঝছি কিন্তু কিছুই করতে পারছি না। হাত পা বাঁধা হয়ে আছি। তবে হ্যাঁ থাকতাম যদি আজ গদিতে তা হলে একবার দেখে নিতাম। যে কেমন করে আমার জেলার একটা লোক না খেয়ে থাকে। তা সে ভাগ্য তো আর করে আসিনি দেখি সামনের বার তোমাদের দশজনের শুভ ইচ্ছায় দেশের দশের কল্যাণে যদি জাতে উঠতে পারি···কিছু বলতে ইচ্ছে করে না সনাতন, সে কি বলব, আমি জানি বাজারে চাল আচে, কাপড় একেবারে নেই, এ মিথ্যে কথা, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর সেই চাল সেই কাপড়ে হাত দেবার ক্ষমতা আমার নেই। (চোখে জল, স্বরভঙ্গ) সনাতন! চোখের ওপর তোমরা খেতে পাবে না পরণে বস্তর পাবে না, আর আজ আমার এমনি অদৃষ্ট যে দু'চোখে আমারে সেই দৃশ্য দেখতে হবে। (কেঁদে ফেলেন) অথচ আমি, আমার ক্ষমতা থেকেও আমি পঙ্গু আমার কোন ক্ষমতা নেই। (সামলে নেন) আজ আর কিছু বলব না।

আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে জনতা এক মুহূর্তের জন্য।

নরোত্তম। কিন্তু এ তো গেল ভবিষ্যতের কথা, এখন আমরা কি করে বাঁচি সেটা বলুন!

নরেন্দ্রনাথ। আমার ঘরবাড়ী স্থাবর— অস্থাবর নিলেম করে নাও, কি আর বলব। আশু সমস্যা তা ছাড়া কি করে আমি সমাধান করব।

সনাতন। আপনি দেশের নেতা মা বাপ, আপনার কি আজ কোনই ক্ষমতা নেই?

নরেন্দ্রনাথ। তোমরা আমারে সেই ক্ষমতার অধিকারী করলেই আমি ক্ষমতাবান হতে পারি। তার আগে তো পারি নে সনাতন।

পতিতপাবন। তা হলি আমরা কি করব কার কাছে যাব? প্রেসিডেন্টবাবু আপনি কি বলেন তা হলে আমরা সব ঘরে পড়ে মরব? কারো ঘরে আজ এক-দানা চাল নেই পরণে বস্তর নেই অথচ চাল কাপড় যে বাজারে একেবারে নেই তাও তো না।

নরেন্দ্রনাথ। শোন সনাতন, পতিতপাবন! এখন তোমরা যেমন করে পার ধারকর্জ করে চালাও।

পুঁটিরাম। কর্জা দেবে কে?

নরোত্তম। কোথায় ধার পাব!

সৃষ্টিধর। বাজারে চাল আছে, কন্ট্রোল দরে সেই চাল আমাদের দেওয়া হোক।

নরেন্দ্রনাথ। বাজারে চাল আছে! কার ঘরে আছে?

সখিচরণ। সাধুখাঁর ঘরে আছে।

নরেন্দ্রনাথ। না সাধুখাঁর ঘরে চাল নেই।

বামাচরণ। সাধুখাঁর ঘরে চাল না থাকে তো কুণ্ডুদের ঘরে চাল থাকবেই।

নরেন্দ্রনাথ। থাকবেই এ কথা তুমি জোর করে বলতে পার না। আর থাকলেও সে দু'দশ মণ চাল পাঁচশো লোকের ভেতরে টেনে বার করে শেষ পর্যন্ত কি অপদস্ত হব। কন্ট্রোল দরে চাল কেন পাবে না সে কথা তো নয়, আসলে বাজারেই যে চাল নেই। অবিশ্যি এর ভেতরে বাজারে যদি চাল আসে তো সেই চাল যাতে করে তোমরা পাও তার ব্যবস্থা আমরা করব— স্বীকার মানলাম। ইতিমধ্যে তোমরাও সন্ধান রেখো। কি আর বলব। কার চাল কে খায় আজ! হুঁ তবে এদিন দিন না বুঝলে সনাতন! ···আরও দিন আছে। দেখি, মনের কথা মুখে বলে আর লাভ নেই। যদি তোমাদের ইচ্ছেয় সেই সুদিনের নাগাল পাই তো···

হঠাৎ দুচার জন লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয় সভায়।

প্রাণকেষ্ট। হাই রে সে একেবারে গন্ধমাদন পর্বত···

রামনাথ। বলব কি সে চালের পাহাড় সাধুখাঁর গুদোমের...

ওফিলদ্দি। সেই ষষ্ঠিতলার কাছে···এক নরী চাল ধরা পড়েছে!

প্রাণকেষ্ট। আরে হ্যাঁ গুদাম থেকে চালান দিচ্ছিল, এর মধ্যে খবর পেয়ে আটকে ফেলেছে সকলে সেই চালের নরী ষষ্ঠিতলার কাছে।

হুড়ো হুড়ি পড়ে যায়। দু'দশ জন বেরিয়ে যায় ষষ্ঠীতলার দিকে।

নরেন্দ্রনাথ। আরে হঠাৎ কে একটা উড়ো খবর দিলে আর একেবারে অস্থির হয়ে উঠলে তোমরা! বলি কি হয়েছে কি?

রামনাথ। চালের নরী— সাধুখাঁর— ষষ্ঠীতলায় আটকে ফেলেছে সকলে।

সনাতন। চলুন একেবারে সরজমীনে গিয়েই দেখবেন প্রেসিডেন্টবাবু। বল্লাম সাধুখাঁর ঘরে চাল আছে তা আপনি...

নরেন্দ্রনাথ। আরে কি একটা উড়ো খবর...

পতিতপাবন। কেন, খবরটা সত্যি হতি বাধা আছে? আপনি টালিবালি করছেন কেন! আমরা তো বল্লামই সাধুখাঁর ঘরে, কুণ্ডুর ঘরে চাল আছে।

নরেন্দ্রনাথ। চাল আছে তুমি নিজে দেখেছ?

পতিতপাবন। কথাডা যেন আমি অবিশ্বাস করলিই আপনার সুবিধা হয়...হ্যাঁ আমি দেখেছি চাল আছে।

নরোত্তম। দাঁড়াও দাঁড়াও, ভাল করে বুঝতে দাও ব্যাপারটা—

ওফিলদ্দি। (তার স্বরে বেতালা) চাল নে নরী পালাল!

নরেন্দ্রনাথ। আঃ কে রে অসভ্যের মত চেঁচায়। সাধুখাঁরই যে ঐ লরী সেটা জানা গেছে?

প্রাণকেষ্ট। জানা গেছে কি বলছেন পিসিডেন্টবাবু? আমি দেখে এলাম!

নরেন্দ্রনাথ। সাধুখাঁরে দেখলে!

প্রাণকেষ্ট। সাধুখাঁ নেই, সাধুখাঁর লোক আছে।

নরেন্দ্রনাথ। সাধুখাঁ নেই, অথচ সাধুখাঁর লোক আছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ওফিলদ্দি। চাল নে নরী পালাল!!

নরেন্দ্রনাথ। আঃ কে রে ঐ রকম ষাঁড় চেঁচাচ্ছে! বার করে দাও ওরে···বদমাইস! তা ঘটনা যদি সত্যি হয় তা হলে ডেকে পাঠাই সাধুখাঁরে।

সনাতন। ডেকে পাঠাবার কি আছে পিসিডেন্টবাবু। আপনি চলুন নিজে'সামনে থেকে ঐ চাল কন্ট্রোল দরে বিলি ব্যবস্থা করে দিয়ে আসুন। আপনি না গেলে অযথা একটা গণ্ডগোল হতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ। না গণ্ডগোল হবে কেন? আর চাল যদি থাকেই যথার্থ তো আমি তো তোমাদের কথাই দিইছি যে চাল তোমরা পাবে তা সে যে চালই হোক হোক না কেন।

পতিতপাবন। কিন্তু এই চাল আছে এই চাল নেই—

চাল যদি উধাও হয় এর মধ্যে তো পাব কেমন করে চাল।

ওফিলদ্দি। চাল নে নরী পালাল !!

নরেন্দ্রনাথ। দে তো হারামজাদার কানটা ধরে বার করে! কে?

সনাতন। এ কি রকম ধারা কথা বলছেন পিসিডেন্টবাবু আমরা বুঝতে পারছি নে।

নরেন্দ্রনাথ। বুঝতে তোমরা কোন দিনই পারনি! আজও পারবে না! সোজা কথা সহজ ভাবে বুঝতে যেন তোমাদের একেবারে কুড়ুল বেধে যায়। বলছি বলে ডেকে পাঠাচ্ছি সাধুখাঁরে।

পুঁটিরাম। তা সাধুখাঁরে দিয়ে আমরা কি করব, তার মুখ দেখবার তো আমাদের দরকার নেই।

পতিতপাবন। পিসিডেন্টবাবু, চাল আমাদের চাই-ই চাই। মাগ ছেলেপুলে ঘরে ঘরে সব না খেয়ে আছে। কেউ দুদিন কেউ তিনদিন না খেয়ে আছে সব। তাই চাল আমাদের চাই-ই। চাল আমরা নেবই। আপনি চলুন। আর আপনি যদি আমাদের কোন রকম সাহায্যই করবেন না বলে স্থির করে থাকেন তো তাও পষ্ট করে বলুন।

নরেন্দ্রনাথ। আবার ভুল বুঝছ। আমি সাহায্য করব না। এই যদি তোমাদের সংশয় জেগে থাকে মনে তো বেশ চলো। আমি গেলেই যদি...চাল...

গমনোদ্যত।

ধ্বনি ওঠে—চল চল ষষ্ঠিতলা ইত্যাদি। এমন সময় হট্টগোলের মাঝখানে স্বয়ং সাধুখাঁ প্রতি পক্ষের আর সব লোকজনও নিজের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঘটনা স্থলে এসে হাজির হল।

নরেন্দ্রনাথ। ঐ তো এসে গেছে সাধুখাঁ, যাক ওঃ একেবারে বলতে বলতে এসে গেছো দেখছি! অনেকদিন বাঁচবে।

কৃপানাথ। শোন শোন কথা শোন।

সাধুখাঁ। নাঃ আর অনেকদিন বাঁচার সখ নেই প্রেসিডেন্ট বাবু। উঃ দেখুন গিয়ে সে একেবারে কি হুজ্জুতি আরম্ভ করেছে অযথা নরী আটক করে।

নরেন্দ্রনাথ। কি ব্যাপার বলতো! হঠাৎ...

সাধুখাঁ। আরে মশাই 'রিকুইজিশন' করা চাল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারী দিতে হবে, কইলি শোনবে না, বোঝালি বোঝবে না, তারপর এক্ষুণি পুলিশ এসে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেবেখন, তখন আপনারাই বলবেন এই সাধু খাঁ শালা পাজী পুলিশ এনে হাঙ্গামা বাঁধিয়েছে।

"ও মিথ্যা কথা", "ছিল কোথায় এদ্দিন এই চাল" যার বজ্রাতটারে...ধৈর্যচ্যুতি ঘটে মানুষের।

ওফিলদ্দি। (চিৎকার করে) চাল নে নরী পালালো!

নরেন্দ্রনাথ। আঃ — : — : চুপ কর। ঘটনা সামনেই মুকেবালা হবে... (সাধুখাঁকে) এমন সব কাণ্ড বাধাও!

সাধুখাঁ। দেখ এট্টা কথা বলি। অযথা হাঙ্গামা করে ঐ চাল যদি তোমরা আটক রাখ তো ঘটনা খারাপ হয়ে যাবে।

শোনব না শোনব না সাধু খাঁর কথা শোনা হবে না, প্রেসিডেন্ট বাবু বলুন—" হট্টগোল হতে থাকে।

...বেশ তো প্রেসিডেন্টবাবুই বলুন।

নরেন্দ্রনাথ। এখন সাধু খাঁ বলছেন...

কৃপানাথ। জবানীতে বলবেন না, আমরা চাল পাব কি না তাই বলুন।

নরেন্দ্রনাথ। আমিই বলছি, আমিই বলছি। (সাধুখাঁর সঙ্গে তাড়াতাড়ি কানে কানে ঘটনা শোনেন) ঐ চাল মিলিটারী রিকুইজিশন করেছে; সুতরাং ঐ চালের ওপর আমাদের কারো কোন হাত নেই।

সাধুখাঁ। দুটো কথা বলে আমি বুঝিয়ে দিই...আপনারা বিশ্বাস করুন মালের উপর আমার কোন হাত নেই। চিঠিও হয়তো এতক্ষণে এসে গেছে গদীতে। দরকার হলে আমি প্রেসিডেন্টবাবুকে সে চিঠি দেখাব।

কৃপানাথ। ও ভবিষ্যতে চিঠি আসবে আর তুমি তখন সেই চিঠি প্রেসিডেন্টবাবুকে দেখাবে। এসব বাজে কথা শিখলে কোথায়! চিঠি থাকে তো ভাখাও আমাদের।

"ওসব মিথ্যে কথা" "চাল চোর", "শালা ব্ল্যাক মার্কেট গোলমাল চলে।

ওফিলদ্দি। চাল নে নরী পালালো— ও-ও-ঃ

নরোত্তম। এ তল্লাটে আবার মিলিটারী কোথায়!

সাধু খাঁ। মিলিটারী কোথায় আসতে কতক্ষণ? নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও কিনা তাই কিছু জানতে পারনা, যুদ্ধুর ঘনঘটা দেখছ না।

সনাতন। যুদ্ধ তো বেঁধেছে এক আমাদের পেটে, আর যুদ্ধ তুমি দেখলে কোথায়?...খালি ধোঁকাবাজির কথা।

পতিতপাবন। ঐ যে কাগজে গুপ্তচরের কথা লেখে না সনাতনদা, ইই ত্থাখ সেই যুদ্ধের গুপ্তচর। প্রেসিডেন্ট-বাবু...

পুঁটিরাম। গরু মরে আর শকুন হাসে...কথা শোন!

নরেন্দ্রনাথ। বলি তোমরা সমঝোতা করবা না হাঙ্গমা করবা...শোন মিলিটারী রিকুইজিশন করা চাল, এ চাল তোমরা ছেড়ে দাও।

কৃপানাথ। কেন ছেড়ে দেব কেন! উনি চিঠিও পান নি, আর ওঁর চালও সীজ করেনি কেউ, সুতরাং চাল থাকতে উনি আমাদের চাল দেবেন না কোন যুক্তিতে! আমরা তো আর মিনিমাঙায় চাল চাচ্ছি না।

সাধু খাঁ। কোন যুক্তিতে অত কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারব না। তবে এ কথা জেনো এই চাল যদি তোমরা আটকাতে চেষ্টা করো...

পতিতপাবন। এই চাল কন্ট্রোলদরে আমাদের দিতি হবে তোমারে।

নরেন্দ্রনাথ। আঃ হা শোন পতিতপাবন, নাঃ, যা ইচ্ছে তোমরা করগে— আমি চল্লাম।

সনাতন। প্রেসিডেন্ট বাবু?

নরেন্দ্রনাথ। বলছি বলি চেঁচিও না অনর্থক। এরকম করে কখনও কোন সমাধান হতে পারে! শোন এখানে একটা কথা আছে।...

কৃপানাথ। শোনগে খালি কথা আছে। কেন কন্ট্রোল দরে চাল দেবার কথাডা কি ফেলনা হল!

সাধু খাঁ। আসল কথা এ চাল বিক্রি হবে না। আমার কি! আমি তো এখানেও বেচব, সেখানেও বেচব। সোজা কথাডা তোমরা যখন বুঝবে না তখন...হাজার বার বলছি যে রিকুইজিশন করা চাল। এ মাল সীজ হয়ে গেছে, তখন সে কথা তোমাদের কানেই ঢুকলো না।

পতিতপাবন। তোমার "সীজ" "রিকুউজিশন" সব কথা মিথ্যা কথা। আসল কথা পিসিডেন্টবাবু শোনবেন, আসল কথা কলাকোপার হাটে পঞ্চাশ টাকা দরে ঐ চাল তুমি বিক্রি করবে বলে লরী ভরতি করে পাচার করছিলে।

সাধু খাঁ। মিথ্যা কথা। জোচ্চুরি কারবার। একথা কখনও সত্যি হতে পারে না।

নরেন্দ্রনাথ। যাকগে অনর্থক... (কানাকানি করেন)

পতিতপাবন। বদমাইসি পেয়েছ। এখন মাঝপথে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছ লরী সমেত, তাই ঐ সব কায়-দার গদ আওড়াচ্ছ পিসিডেন্টবাবু!

নরেন্দ্রনাথ। তা আইন তো দেখি তোমরাই নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছ প্রেসিডেন্টবাবু আর কি করবেন।

সনাতন। এ কি কথা হল পিসিডেন্টবাবু!

নরেন্দ্রনাথ। হাঁা, তা এখন তাই তো হল দেখছি। সাধু খাঁ যে কথা বলছে সে কথার গুরুত্ব এই ডামাডোলের বাজারে...

চলমান গাড়ীর শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

আমি অস্বীকার করতে পারি নে অথচ তোমরা বলছ যে ঐ চাল তোমাদের চাই। এর সমাধান আমি কি করে করব! মাথায় আসা চাই তো ..কিছু কিছু লোক আমি জানি, এতে করে আমারে ভুল বোঝাবে, অবিচারও করবে কিন্তু একথাও আমি জানি, যে তোমাদের মধ্যে এই খানেই—অনেক ভাল লোক আছে, যারা বোঝবে যে ব্যক্তি জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘ, এর মধ্যিখানে দাঁড়ায়ে আছে হাজার আন্তরিকতা আর দরদ থাকা সত্ত্বেও সে ব্যক্তি কতটুকখানি কি করতে পারে।...

ওকিলদ্দি। চাল নে নরী......

নরেন্দ্রনাথ। আমি আবার বলব, জোর গলায় বলব এবং দাবি করেই বলব যে প্রকৃত যা করতে চাই আমি তোমাদের জন্তে তা আমি করতে পাচ্ছি নে।...কিন্তু

আজ পারছি না বলেই আমি ভেঙে পড়ব না। ভেঙে পড়লে আমার চলবে না। অন্তত আমার জেলার এই নিরন্ন মানুষের মুখের দিকে তাকিয়েই...আমি আজ...মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে...দুঃখ কষ্টের জগদ্দল পাথর মাথায় নিয়েই লড়াই করে যেতে হবে। আজ...তারপর দশজনের ইচ্ছেয় সেই...

দারুণ ঘর্ঘরে বামাল লরীটা উধাও হয়ে যায়, জনতা বিভ্রান্ত, দিশেহারা, ছত্রভঙ্গ। একটু পরেই লরীর শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসে। আবহাওয়া ধোঁয়াটে অস্পষ্ট, চুপচাপ কেউ কোথাও নেই। অথচ জননেতার বক্তৃতার বিরাম নেই। এক কোণে শুধু দেখা যায় দাঁড়িয়ে আছে ভগবতীচরণ, লক্ষ্মীকান্ত, সহায়চরণ, ত্রিলোচন ও জব্বর মিঞা।

সুদিনের নাগাল যদি আমি পাই...তখন এই দুর্দিনের কথা আমরা নিঃসন্দেহে ভুলে যাব। এ রাতও কেটে যাবে, দিন একদিন আসবেই এবং সেই বিশ্বাসেই আমি লড়াই...আমি লড়াই করে যাব।...

চলে গেছে সব। চলে গেছে। উঃ...

(কপালের ঘাম মোছেন) গোটাটাই একটা দুঃস্বপ্ন; ও-ো-ো-ো কে ?

ভগবতীচরণ, ত্রিলোচন, সহায়রাম প্রভৃতির প্রবেশ।

ও ভগবতী! লক্ষ্মীকান্তও আছ দেখছি...

ভগবতী। চলেন, একটু জিরাবেন চলেন।

লক্ষ্মীকান্ত। হাঙ্গামা বলে হাঙ্গামা, উঃ এট্টু বিশ্রাম করবেন চলুন।

[ভগবতীচরণ ও লক্ষ্মীকান্ত নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে যেতে থাকে ভিতরে]

শারদীয় পরিচয় | ১৩৫৮ | ১৯৫১

△ △ △ △ △ △ △ ॥ য ব নি কা ॥ △ △ △ △ △ △ △ △

* রিয়্যালিজ্‌ম, ন্যাচারালিজ্‌ম-এর ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে/পুনঃপ্রকাশ * * *

বিজন ভট্টাচার্যের নাটক

হাঁসখালির হাঁস

এইখানে বসা যায়। তাই বসা।

উদ্দেশ্য লোপাট। সামনে নেই, পেছনে নেই। তাই হাবাউদ্দেশ।

এখানেই যে কিছু খুঁজে পাওয়া গেল তাও নয়। তবু...

চৌরাস্তার মোড়। চারদিকে রাজপথ। ট্রাম, বাস। ঘাস ঘাস।

বড় একটা ন্যাড়া বুড়ো গাছ। একটাও পাতা নেই। ঊর্ধ্বমুখ হাতের কঙ্কালে হয়তো হাতছানি দেখেছে ওরা। গুঁড়িটা মোটা। ঝড়ে পড়ে নি, বাতাসে হেলে নি। ওপরে যতখানি, তলায়ও হয়তো ততখানিই। শেকড় বাকড় দিয়ে নিজেকে ধরে আছে।

মাটি ধরেই থাকা। মাটি ধরেই বাঁচা। তাই এখানে বসার কথা মনে হলো। এইখানে বসা যায়। তাই বসা।

বুড়োদের চোখের চাহনিতে ছেলেরা মেয়েরা বুঝে নেয় ভাষা। মাথায় ভারি মোট—ঘাড় ঘুরিয়ে চোখে চোখে কথা তারপর বস্তাবাঁধা ছেঁড়া কাথা আর হাঁড়িকুড়ির সংসার নামিয়ে ঘাস ঘাস জমিতে বসা।

দূরে ফুটপাথ। দোকানপাট। লোকালয়। বাজার বাজার। শহর বাজার।

শুধু এরা নয়। আরও অনেকে, অনেকে আছে। অঞ্চল বসতি মতো ভাগে ভাগে ভাসা। তারপর চাপ চাপ চিংড়ির ডিমের মতো খাল-বিল নদী-নালা বয়ে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তর দিয়ে মাটি ধরে শহরের ফুটপাতে আসা।

হাঁসখালির হাঁসেরা জলে থাকে। মানুষ থাকে মাটিতে। কিন্তু মাটিও আজ নোনাফেনা সব, সব মাটি দিয়েগো গাসিয়া। রাজপথ মহাশিরা। প্রাণ-কেন্দ্র ধরে চলমান বাস-ট্রাম, গাড়ি-ঘোড়া। অগণন যাতাআসা। মিছিলে পদাতিক নেই, তবু পদাতিক।...লোড্‌শেডে চলা-ফেরা, ক্লান্ত পদযাত্রা। হাঁসখালির হাঁস নয় এরা ডালহৌসি থেকে সদ্য ছাড় পাওয়া সাদা সার্ট পরা। রোজ ডিম দেয়, তবু বলে—হাঁস না আমরা। স্বেচ্ছায় ভুলো, তাই কতকটা নুলো।—স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। এদের পিতৃপুরুষের দিব্যি ছিল, সন্তানসন্ততিদের কাছে সোনার হরিণের কথা ঠিকমতো বলে যেয়ে যাওয়া।

সাদা সার্ট পরা হাঁসেদের অন্য এক কথা। হাঁসখালির মানুষের ভিন্ন গল্পগাছা। ট্রাম লাইনের সড়ক ধরে তো বসে গেছে ওরা। এখানে ওখানে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে। অনাসৃষ্টির সংসারে।

এখানে জমেছে মেলা। ছিন্নমূল জীর্ণবাস ভিকিরির মেলা। সভাসমাজ দেহে চাপ চাপ এঁটুলির দলা। ওপরে ঘোষণা, শহর সোন্দরী হবে। এরা যেন সব দেখতে এসেছে।

মাটি জমে জমে মাটির পাহাড়। সুড়ঙ্গ পথে পাতাল রেল। তাই মাটি কাটা। কোদাল, ঝুড়ি, মাটিকাটারা ছাড়া, কত ক্রেন, বুলডোজার। কালিকটে কলকাতা। কলকারখানা এমন কিছু নেই। তবু যন্ত্রযুগে স্বপ্নগর্ভা শিল্পের ঝনঝনা। কি যাবে পাতাল রেলে? বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—বাসি পচা সব কাঁচা মাল—আর অব্যাহত সৈন্য চলাচল।

আপাতত ঢাল জমির নাবাল ধরে হাঁড়িকড়াই-এর সোনার সংসারে আগুন ধরে গেছে। ঘেঁচু-কচু, ডাল-চাল, যার যা সম্বল, সেদ্ধ হচ্ছে। আগুনের আঁচ ঘিরে মাটিমুখ প্রতিমার মুখ, পাঁচিলে রেলিং-এ ছায়া ভাঙে। এখন প্রদোষকাল। পাখিরা কুলায় ফেরে। আর ফেরে ছন্নছাড়া ভিক্ষুকের দল। আনো কাজে ব্যস্ত কেউ। সশ্রম বিশ্রাম দণ্ড। অকাজের কাজে সব জীবন মন্থর।

ভাগ ভাগ খাওয়া নাওয়া, ওঠা বসা, তারপর শিয়রে সংসার নিয়ে সবে নড়ে শুয়ে শুয়ে পড়া।

কুরুক্ষেত্রে মনে হয়, এ-ও এক তুর্কমান গেট। বা যুদ্ধ বিরতি পরে ময়দানে মানভূম, সিংভূম, ধলভূমগড়। ছোটনাগপুর শৈলশ্রেণী। অথচ কোনো গাহিরী সাঁওতাল প্রস্তরা জাগে না হেথা। ঢালের ওপার সি. এম. ডি. এ-র রথের নমিত নিশান। রণভঙ্গে যেন সব মানুষের মৃতদেহ, ইতঃস্তত ছড়ানো ছিটোনো।

ধৃতরাষ্ট্র এক নয়। ভগ্নস্বাস্থ্য ন্যুব্জদেহ তিনমাথা এক করে বসা বৃদ্ধ প্রপিতামহ, কান পেতে শোনে রাতে মহাযুদ্ধে হাঁসখালির হাঁসেদের কথা। কাল থেকে কালান্তরে কহেন সঞ্জয় :

ঘোষণা। সাড়া নেই। সাড়া নেই। নড়ে না। চড়ে না। মরা না। মরা মরা। কারা এরা?

ধৃতরাষ্ট্র। আমরা যারা কানা, খোঁড়া, হাবা, বোবা, নুলো। মোগার অনেক দুঃখু। অনেক কষ্ট। আমরা আর মানুষনি। মানুষির জঞ্জাল। আস্তকুঁড়ি থাকি। আস্তাকুঁড়িই বাঁচি তারপর একদিন আস্তাকুঁড়ি হয়ে যাই।

বৃদ্ধ পাণ্ডু। মোগার দুঃখুকষ্টের শেষ নি। আমরা সইতি পারি, বলতি পারি নে। তাই মোগার কিছুই ব্যক্ত হলো নি। সব কথা তাই শব্দ হয়ে গেল। থাকিটা ভাবভঙ্গী। খোলপেটে আগুন ধরেছে, চিচিক্কার দে বাবাগো মাগো বলে ভাতরুটি চালাম। না দিলি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। নাক মুখ দে কিছু কিঞ্চিৎ শব্দ হলো। হলো।..রাগ হলো তো লাঠি নেলাম।— ভয় পাই, তাই ভয় দেখাই। জন্তুর নাগাল। আবুস্তান্তরে কেমড়ে দেই।— খাঁচার জানোয়ার যেমন খোঁচা খেয়ে লাঠি কামড়ায়? খুঁইচেছে যে, তারে সে চোখি দেখতি পায় না।

পরমেশ্বর। আগুনির ধম্মই হলো পুড়িয়ে ফেলা। তাই খোলপেটের আগুন আঙ্গা মাথাগুলোরে সব আঙ্‌রা করে দেছে। আমরা ভাবতি পারি নে। গোটা দেহকাণ্ড—নাকি চোখ, হাত, পা, মুখ গোড়াকাটা লতাগাছের মতো মরা সাপের খোলসের নাগাল পিরথিমির মাচা কেমড়ে নেতিয়ে পড়ে আছে।... বাবুরাই আমাদের সব— বাপ, ভাই, মা, বোন— ভগবান। অথচ বাবুদির আমরা কেউ না। কিছু না। বিষ হয়ে গেছি আমরা বাবুদির চোখি।... চোখে মোগার জল নি। মরা খালবিলির নাগাল চোখ সব মোগার শুইকে গেছে। নইলি সাঁড়াসাঁড়ির ডাকাতাম মোগার সকলার চোখি। বিশ্বসংসার শহর-বাজার, গঞ্জ সব ডুইবে দেতাম অনন্ত সায়রে। এখন আর কিছু ভাবতে পারিনে। সব কিছুর বাইরি চলে গিইছি আমরা।...আঙ্গা এখন আছে শুধু ভঙ্গী। অঙ্গীরা সব কাঁটাপুকুরি চলে গেলিউ ভঙ্গী যাবে না। এই এইখানেই স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে, বায়ুস্তরে কোথাও ঝুলে ঝুলে থাকবে। তারপর কোনদিন খরা, অনাবৃষ্টি, প্লাবন, ভুঁইচাল, স্যাওট, সাপটের গলা জাপটে ধরে আছড়ে এসে পড়বে বাবুদের ঘর সংসারে। বাবুরা ছাড়া অগতিতেও গতি নেই আমাদের।

যজ্ঞেশ্বর। মাঠঘাট পেরিয়ে বুড়োবটের নাবাল ধরেই শিশুহাড়ার মাঠ। সামনে তেপান্তর। ঢিবি ঢিবি এবড়ো খেবড়ো জমি। মাঝে মাঝি আল। আলির ধারে মেঠো ইঁদুর আর কাল কেউটের বাসা।—ইঁদুরির গথখে ধান বার করতি গিয়ে গোপালের মা-রে সেবরে সাপে কেটেছিল ঐ মাঠে। গর্তের ধান আবার গর্তে নে গেল ইঁদুর। মরে গেল গোপালের মা তিন তিনটে কচি গ্যাঁদা রেখে। তারপর ঐ তিনটে গ্যাঁদার এট্টা চেঁপী, দুটো ছেলে, ঐ মেঠো পথ ধরে যে কোথায় চলে গেল, তার আর কোনো হদিস হলো না। বাপ্‌ তো ছিল না! সব কথা স্মরণেও আসে না।

জনার্দন। শিশুহাড়ার মাঠ পেরোলিই গো হাড়ার ভাগাড়। দূরে হাটখোলা। শঙ্খচূড়ের বাসা। শালারা ন্যাজে ভর দে দাঁড়িয়ে দেখে মানষির যাতাআসা।— চৌসাপার রাজা।—তাই গোখরো বলো, কেউটে বলো, সঞ্চারিণী যে কেউ বা হও না তুমি, হেঁটমুণ্ড মাথানত ন্যাজ তোমার দিতিই হবে রাজার হাঁ-মুখির মধ্যে। তোমার-ও লেখন, খালেন ভাল, গতি হয়ে গেল তোমার।— নয়তো ছাড় যদি পেলে একবার প্রাণ নিয়ে পালাও।—সেই প্রাণ বাঁচাতি পোকামাকড় ব্যাঙ ধরে খাও'— ব্যাঙ আবার তখন বলবে বাঁচাও, বাঁচাও।— সে এক জীবনের কেচ্ছা।...ভাগাড় পেরিয়েই পায়ে হাঁটা বাড়ি যাবার পথ।— গাছগুলো এবার এটু বড়, তাল, খেজুর, আম, জাম, কলা— কলা— বাস্তুঘিরে বসা। মাথায় হলুদ ফুল, ভরতুপুর, শেয়াল কাঁটার ঝাড়। সূযিঠাকুর পাটে আর হেটুগঞ্জের পড়ো ভিটেয় মামাটি বসেছেন জপে।— কুমোর পাড়ার পাশে, এ-ও এক পট বটে!

জনার্দনের চোখে মিলিয়ে যায় পটের ছবি।

জনার্দন। আমার মামা এমন হয় জানো?

মামা। ...আমার আর হয় টয় না।

—সেই ভাল।

—হয়ে লাভ?

—কিচ্ছু না।

—সেই কষ্ট।

—সেই দুঃখু।

—হাইনেস।

—আর হুতাস।

—কেউ নেই।

—কিচ্ছু নেই।

মামার গীত।

ভেসে যায় মান্দাস ভেলা
অভাগিনী অনাথিনী,
দাঁড়াবার নাইরে গাছতলা—
ভেসে যায় রে......

জনার্দন। তুমি তো দেখি বেশ মজায় আছো।

মামা। হ্যাঁ কত মজা!

—আবার কি?

—না ভাল।

—আর ভাল মন্দ!

—কিছুই কিছু না।

—কিছু না-ই মোগার সব কিছু।

—কি করে বুঝলে?

—জীবন দিয়ে!—এই যে হাতে খোলা, পোঁদে মালা!—হায় ভগবান!!

—...আচ্ছা মামা, ভগবান বড়, না মানুষ বড়?

—কি করে কি বলবো?

—ভগবানরে তো চোখি দেখা যাবে না?

—কেউ কেউ বলে নাকি দেখা যায়।

—বাবুদের খবরাখবর?

—বাবুদেরই তো সব খবরাখবর।

—তেনারা ভগবান দেখেছেন?

—পুণ্যবানেরা দেখেছেন।

—দেখেছেন? আচ্ছা মামা, এক এক জেতের একো একো ভগবান, তাই নয়?

—হ্যাঁ, হেঁদুদের মহাদেব কালী...

—মোছলমানদের যেমন আল্লা...

—ক্রেশতানদের বিষ্ণু, যীশু...এক এক জেতের একো একো ভগবান।

—আঙ্গা কোন ভগবান নেই, না মামা?

—হয়তো বা আছে এট্টা, জানি নে।

—নি কেন?—আমরা মানুষ না?

—না, অমানুষ।—

ভাগ্নে। তা হলি জন্তু জানোয়ার?

—তাও না।

—তবে?

—ঐ, জন্তু আর জানোয়ারের মাঝমাঝি এট্টা কিছু।

—তাই অমানুষ?

—ভিকিরি, ভিকিরি।

ভাগ্নে। আচ্ছা মামা, আঙ্গা এই নামডা দেছে কেডা?

—বাবুরা দেছে;—আবার দেবে কেডা?

—বাবুরা দেছে?

—বাবুরা দেছে।

ভাগ্নে। দেছে বলেই মেনে নিতি হবে?

মামা। তা কি বলবি তাদের তোরা?... গরু ছাগল যে বলবি তোরা তোদের, তাতে করে গরু ছাগলদের আপত্তি আছে। কীট পতঙ্গ কি পক্ষীকুল যে বলবি. সেডাও কোন নেয্য কথা নয়। কেন না, তারাই বা তাদের কি নামে ডাকাডাকি করবে?

ভাগ্নে। সেডা ঠিকই তো।—তা হলি, আমরা আমাদের বলবো গরিব মানুষ?

মামা। গরিব মানুষ?

ভাগ্নে। হ্যাঁ।

মামা। সেডাও ঠিক হবে না।

ভাগ্নে। কেন?

মামা। গরীব মানুষ হচ্ছে বাবু মানষির নিচির সারি। যারা কোনমতে দুঃখুকষ্টে দু-বেলা ক'রে কম্মে খায়।

ভাগ্নে। কেও কেও মামা এক বেলাও খায়।

মামা। তা খায়। আবার একদিন অন্তর, দুদিন অন্তরও খায়। কালক্রমে আর সে-ও খেতি পায় না। ঠেলা খেতি খেতি, ঠেলা খেতি খেতি তারাও একদিন পথে নেমে এসে আমার সামিল হয়ে যায়। তখন তাদেরও হাল হাতে খোলা, পোঁদে মালা, ভিকিরি হয়ে যায়।

ভাগ্নে। আচ্ছা মামা, এমন কেন হয় বলতি পার?

মামা। কর্মদোষ, ভাগ্যদোষ—অনেক কিছুতি অনেক কিছু হয়।

ভাগ্নে। …ভাগ্য, ভগবান তো এক নাইনির কথা।

মামা। একই তিন।

ভাগ্নে। তা ভগবান যখন আজ্ঞা না, তখন ভাগ্যই বা আমরা মানবো কেন?

মামা। তো কি করবি?

ভাগ্নে। বাবুরা আমাদের যা করেছে, আমরাও তখন বাবুদের তাই করবো।

মামা। কি করেছে বাবুরা তোদের?

ভাগ্নে। কি করেছে—ঠেলা মেরেছে। ঠেলাতি ঠেলাতি রাস্তায় নাবিয়ে দেছে। নাঠি বাটি চাটি ধরিয়ে ভিকিরি করে ছেড়েছে।

মামা। সে তো দেছে!

ভাগ্নে। তা হলি আমরাও বাবুদের ঠেলা মারবো।—ঠেলা মারতি মারতি আমরাও একদিন বাবুদের রাস্তায় নেবিয়ে দাঁড় করাবো,—ভিকিরি করে দুবো।

মামা। পারবি? সে শক্তি আছে তোদের?

ভাগ্নে। চেষ্টা করে দেখতি দোষ কি?

মামা। বাবুরা শক্তিধর, বুঝলি?—শক্তির সঙ্গে বুদ্ধি। বাঘের থাবা আর শেয়ালের যুক্তিবুদ্ধি,—এই হচ্ছে বাবু। আছে তোদের বাবুদের সেই শক্তিবুদ্ধি? আছে?

ভাগ্নে। সেই শক্তিই তো নেই শরীলি। শক্তিও নেই, বুদ্ধিও নেই।

মামা। তো তবে?…কথা নেই, আবার কথাও আছে। শক্তি ভক্তি থাকতি থাকতি উঠে পড়ে নাগতি হয়। আমরা না পারলিউ গরিবরা এখনও পারে। সকলা একসঙ্গে উঠে পরে নাগলি পরে এট্টা ব্যাপার হয় বটে, এটা মানি। আমরা একা কি পারি? আমরা বড়জোর নাঠি, ঠেকা, সানকি বাটি হাতে হাতে জোগান দিতি পারি। সে কি হবে? কখনও হবে? বাবুদের গাঁটে গাঁটে বুদ্ধি, গোঁফে গোঁফে শলা—অনেক গুলি, অনেক বন্দুক, বাণে বাণে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে দেবে আমাদের। মাঝে মধ্যে আবার শিখণ্ডী শ্রীভগবান। তেনার হাতে আবার চক্কর সুদর্শন—পালটি বাণ যে মারবি তোরা সে উপায় নেই। সব বাণ কেটে দেবে সেই চক্কর সুদর্শন। নড়বি যে…; মুকোবালার অনেক ঝামালা; —গাঁজা আছে, গাঁজা?

ভাগ্নে। বিড়ি এট্টা দিতি পারি। নেবা এট্টা?

মামা। বকতি বকতি আঠা বেধে গেছে মুখি, তা দে এট্টা।

ভাগ্নে। আগুন আছে কাছে?

মামা। আগুনির খবর তো তোর কাছে। এই না শুনলাম, নড়বি?

ভাগ্নে। নড়বো তো। তবে ঐ যা বললে শক্তি ভক্তি থাকতি নড়তি হবে। আর গরীবগুরবো মানুষীর জানাতি হবে কথাডা। আমরা আছি, ভীষণভাবেই থাকবো…

মামা। অগ্রে তুই আমারে এট্টা বিড়ি দে দিনি?

ভাগ্নে। দাঁড়াও, আগুনির খবর করি।

ভাগ্নের ত্বরিৎ প্রস্থান।

এতক্ষণে সাজপাট সাঙ্গ হলো গণৎকার ঠাকুরের। প্রোথিত ত্রিশূল, হস্তরেখাপট, খাঁচায় ঘুঘুপাখী…। হঠাৎ অর্বাচীন মামা ভাগ্নের কথায় ধ্যানভঙ্গ হয় ছন্নছাড়া হঠযোগীর

গণৎকার। (মামাকে ইঙ্গিত করে) কথা বলে যেন কত না শাস্তরজ্ঞান?— সুদর্শন, শিখণ্ডী, ভগবান, ভাগ্যবান— শালা যেন কানা ধৃতরাষ্ট্র. দুরিখে সব দেখতেছে, সব বুঝতেছে? জাত ভিকিরি বলে কথা!

মামা। (রাগতঃ) আপনি তুমি কি?

গণৎকার। আমি?— আর যাই হই, তোদের মত ভিকিরি না। ভাগ্যদোষে পথে এসে দাঁড়িয়েছি।

(কোঁড়ে থেকে থাবা মেরে মেরে কি যেন খায়)—একদিন আমারও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল।—পুরানাদিতে অধিকার ছিল।—অনেক মানুষই এই চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতো না। আর আজ, জেতে অপজেতের চোখে চোখ রেখে দিনরাত আমাকে পেটের জন্যে বকবক্ করতে হয়। মানুষ আছি নাকি ?

মামা। তাহলিই তো স্বীকার মানছো কথাডা'—তুমিও আঙ্গা সামিল,—ভিকিরি। তার আবার লম্বা চওড়া কথা বলছো কি ?

গণৎকার। লম্বা না চওড়া ছিল।—দশ কাঠার ওপর বসতবাড়ি বলে কথা। পূর্ববঙ্গে। কিন্তু পশ্চিমে কোনো ঠাঁই হলো না। ঘর ছিল, সংসার ছিল। এখন সব বিস্মরণ। স্মৃতি, শ্রুতি, কিছু মনে পড়ে না। এ এক মহাকুরুক্ষেত্র। দাহ, দহন।

মামা। আনতি গেছে দাহন। এট্টা বিড়ি, তাই এখনতরি ধরাতি পারলাম না। বকবক্ করছে ?—রাক্কুসী বেলায় দেবখন জেলে তোমার পৈতেয় আগুন। কাল বেলা, বামুন মানুষ, থাবা মেরে মেরে খইমুড়ি খাচ্ছো তোমার লজ্জা করে না? গাছের পাত্তাডা পর্যন্তি থির হয়ে আছে, পাখপক্ষু কথা বলে না, আর উনি গরাসে গরাসে,—খাচ্ছেন আর আমারে শাস্তরজ্ঞান দেচ্ছেন ? বামুন মানুষ, তো বাবুদের পাড়ায় যাও না। ইজ্জত দেবে নেন। আঙ্গা সঙ্গ আছো কেন ? বামুন ?—নোকে তোমারে মান্যি দেয় ?

গণৎকার। নিশ্চয় দেয়। না দিলি বুঝবো রসাতলে গেছে দেশ।—জাহান্নামে গেছে সমাজ সংসার।

মামা। দেশ বলতি কি বোঝ আপনি তুমি ?

গণৎকার। দেশ, মাতৃকা,—শক্তি-রূপিণী।—বল্লি তোমার মাথায় ঢোকপে ?

মামা। ঢুকে আমার দরকার নি।—খালি আজেবাজে কথা বলবে—বকবক্...বক্‌বক্...আসলে মাথাডা তোমার গেছে।—দিনরাত বিড়বিড়, কি বকো কি দিনরাত ?

গণৎকার। ইষ্টজপ, ইষ্টমন্তর—ধরে তো রাখতে হবে নিজেকে ?

মামা। ফের বাজে বকে ? (ধমক খেয়ে গণৎকার থতমত খেয়ে যায়)—মাটির তো আর তোমার মত শাস্তরজ্ঞান নেই। মাঠের মধ্যিখানে হা পিত্যেস করে বসে হাজার মন্তর আওড়ালিউ মাটি কথা বলবে না! চরাচর, চরাচর! মন্তর সেখানে প্রতিপলে ফুটছে, ভাসছে, হাসছে,—মিলিয়ে যাচ্ছে। মাঠে, বিলি সে মন্তর আমি একদিন দুচোখ ভরে ফুটতি দেখিছি।— মন্তর দেখাচ্ছেন ?—মাটি, মাটি।—আর এক কথা কবেন মাটি হালের মুখি, ফালের মুখি— যখন তিনি ধর্ষণ হবেন। মানষির কারকিতিতি মাটি তখন গর্ভবতী হবেন।—প্রকৃষ্ট মাতৃগর্ভ তো জননী জন্মভূমি ?—মেয়ে বলো, ছেলে বলো, সকলার আগাম নিগম ঐ যোনীপথ ধরে।...তন্ত্রের সেই সিদ্ধি— যখন তলপাকধামে দুধ নামায়...(ছল ছল করে ওঠে মামার দুই চোখ, হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে মামা গানে) কোথায় ছিলাম কমলে আলাম—মাগো, আমার এই ভাবনা,— কোথায় যাবো নাই ঠিকানা, মাগো...

গণৎকার ভ্যাবাচাকা, বিভ্রান্ত, জলজ্বল। মামা স্থির, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত।

কাগজ পাকিয়ে আগুন জেলে ছুটে প্রবেশ করে ভাগ্নে। মামাকে ঐ অবস্থায় দেখে বলে।

ভাগ্নে। একি দৃশ্য, মামা।—গান গাচ্ছো, কাঁদতোছো—আগুন আনতি বললে, বিড়ি খাবা না ?—ধর, বিড়ি ধরাও, বিড়ি খাও...

গণৎকারকে কটাক্ষ করে বলে।

মন্তর ক'রোছো বুঝি তুমি মামারে ?—

গণৎকার মাথা নেড়ে অস্বীকার করে।

—নিজি নিজি বিড়বিড় করো—কর বিড়বিড়। আঙ্গা ঘাঁটাও কেন ?...

...কি একটা কথা বলতে গিয়ে কথা চেপে যায় গণৎকার। মামাকে

ধর বিড়ি ন্যাও। রাস্তায় গিইলাম আগুন আনতি, ধর।...

মামা বিড়ি ধরায়। বিড়ি টানে। ভাগ্নে পাশে বসে মামাকে লক্ষ্য করে।

—এট্ট দিও।

মামা। (ভাগ্নেকে বিড়ির শেষ দেয়) মাঠেই তো ছিলাম। পেরথমে বর্গাদার, ভাগচাষী। তারপর চাষীর হাতে সরকার থেকে যখন জমি দেবার কথা উঠলো তখন পাট্টার ভয়ে মান্যির ভাই নন্দর পুত ষষ্ঠীচরণ আমারে উচ্ছেদ করলো জমি থেকে। ছিলাম বর্গাদার হলাম দিনমজুর। পঙ্গপালের মধ্যি আর এটা পতঙ্গ।...আবাদ গেরাম। কাজ চাইলিই বা পাচ্ছে তুমি কোথায় কাজ!—হাত পাতলিউ ভিক্ষে মেলে না। পেট পোঁদ কথা শোনবে না। পোঙ্গায় না পর, পেটে তোমার দুটো দিতিই হবে।—ভাবলাম, শহরে তো কত কাজ হচ্ছে,—শহর গড়ছে, শহর বাড়ছে, নদী বেঁধে লোহার পুল হচ্ছে, পাতাল রেল করতেছে; শ' শ' কোদালি মাটি কাটা হচ্ছে—মাটি-কাটা গলাকাটা, পাঁঠাকাটা—এক পাঁঠাই খায় বাবুরা শুনি দিরতিদিন সাত হাজার করে,—আরও কি কি সব খায়, কত খায়, কে বলবে?

খাওয়া দাওয়ার কথা শুনে লোভাতুর বৃদ্ধ পাণ্ডু মামার সমীপবর্তী হয়। অতি-কৌতূহলে খাওয়ার সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করে।

পাণ্ডু। কে কোথায় কত কি খাচ্ছে?—খাওয়া দাওয়া আছে নাকি কাছেভিতে?

মামা। (চটে যায়) খাওয়া দাওয়ার কথা আবার তুমি কোথায় শুনলে?

—বাবুরা কি খায় না খায় সেই কথা তচ্ছিল।

পাণ্ডু—বাবুরা!—বাবুরা সব খায়। (দার্শনিক ভাবে)—কি খায় আর না খায়, তুমি ধারণা করতে পারবে না। বাবুদির কথা?—ভগবান তো দেখিনি চোখে; ছাখবোও না। দু-চোখ জুড়ে দেখিছি শুধু বাবুদের! ভাবতি পারবে না।—ই:, কি করছে আর না করছে বাবুরা!—জল, হাওয়া, মাটি—সে একেবারে কাঁইপে ফেলে দিচ্ছে। ধরছে, মারছে, কাটিছে, ছুটছে, স্বর্গমর্তে সে একেবারে ঝড় তুলে মেদিনী কাঁপাচ্ছে।...দেখতিউ সব দেবদূতির নাগাল।—ভাব, ভঙ্গী, চেহারা।—যেমন মদ্দো তেমনি মাগী। কারে ছেড়ে কারে দেখি। মাগীগুলো তো সাক্ষাৎরূপিনী সব জগত্তারিণী। গাব-থোড়পানা ঘাড় বুক পেট উরোত, দেখিলি মনে হয় (ভাগ্নেকে থাবায় ধরে) এখুনি আমার মিত্যু হয়ে যাক। (নিজেদের মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে) আর আঙ্গা, চেয়ে-দেখ সব শাখিনী ডাকিনী।

সামনে এক কল্পিতবাবুর খাওয়া লক্ষ করে লাফিয়ে উঠে চাষা ভিক্ষে চায় হাত বাড়িয়ে।

পেইছি এতক্ষণে—দেই বাবা, দেই বাবা—চেপির দিন খাওয়া হয়নি বাবা...মাগ ছেলে-পুলে নে অনাহারে আছি বাবা! কোলের বাচ্চাটার মুখি এট্টা দানা পড়েনি বাবা, দুটো পয়সা দে যাবেন বাবা,—দেই বাবা দোই বাবা,...

ভদ্রলোক মনে হয় ভ্রূক্ষেপ করেন না।

...চেয়ে দেখে না রে!...(পরিবারস্থ লোকজনকে দেখে) দেখলে দেখলে?—দেখলে কেমন বসে বসে দাঁত কেলাচ্ছে?—কোথায় দৌড়ঝাঁপ করে গ্যাঁদা কোলে চারদিক থেকে এসে বেড় দে ফেলবে বাবু-ডারে, তা না,...ঐ রম দাঁত বার করে ফষ্টি নষ্টি করলি কোন বাবু তোদের ভিক্ষে দেবে? কেউ দেবে?—শালা দেখতিছিস এট্টা ধরিছি বাবু, দয়াবান লোক, পকেটের মধ্যি হাত সেঁদিরে দেবো দিচ্ছি করছে পয়সা ..কেউ তোদের ঠেকাতি পারবে না মিত্যু,—তোরা সব মরবি!...শুয়ে বসে দন্ত কেলাচ্ছে আর আড়মোড়া ভাঙছে...যা যা পারিস তাই করগে যা।...কিছু বলবো না, কিছু শোনবো না।

বিতৃষ্ণায় দূরে গিয়ে বসে।

পিছনে পাবদৃশ্যমান—মাটির পাহাড়। সেখানে হাঁকডাক ঝুড়ি বওয়া মাটি কাটা চলছে। এক সারি নেমে যাচ্ছে খাদে তো আর এক সারি মাটি কাটা উঠে আসছে। কাজ চলছে তড়িঘড়ি। বেলা পড়ে আসে।

মঞ্চের সামনের দিককার পাঠক কিন্তু আরও তীক্ষ্ণধার বাস্তবধর্মী। বেলা শেষে ক্লান্ত পায়ে ডেরায় ফেরে কিছু কিছু ভিকিরি। শরীর এলিয়ে দেয়—এখানে ওখানে। কাজকর্মে বিরতি ঘনিয়ে আসে।

দিনরাত্রির সংক্রান্তি কালে ভিকিরিদের দঙ্গলের ভেতর থেকে একটা আইবুড়ো মেয়ে বাইরের সভ্য জগতের অসাধু ইঙ্গিতে পেটের দায়ে সাপিনীর মতো সোজা উঠে দাঁড়ায়—পরোয়া না করে। তার হাবভাব আকার ইঙ্গিতে যৌন তাড়নার অভিব্যক্তি ছাড়া প্রয়োজনের বাধ্যতামূলক তাগিদ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ফালুক ফুলুক এদিক সেদিক দেখে নিয়ে সে পা টিপে টিপে ঐ পথে এগিয়ে যায়। মর্মান্তিক এই

অভিসার লক্ষ করে এক ঝাঁক পাখির কলকাকলীতে বিপদ সঙ্কেত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোথায় একটা বাঘ বেরিয়েছে হরিণের সন্ধানে। যেন তাই এই সাড়া কাড়া পক্ষীকুলের। মেয়েটা চুপিসাড়ে এগিয়ে যায় বাইরের দিকে। ঠিক নিষ্ক্রান্ত হবার পূর্ব মুহূর্তে তার মা বোনরা ভাগে ভাগে দাঁড়িয়ে ওঠে। দূরে তার যে চাষা বাপ অভিমান করে বসেছিল এতক্ষণ, সে-ও দা হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে। সবাই মেয়েটিকে লক্ষ করে। বুকে মুখে ঢেউ ভাঙে মায়ের মেয়ের কথা মনে করে। একটু এগিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায় দলবদ্ধ ভাবে। পরে বাপও এগিয়ে যায় একটা বদলার মনোবৃত্তি নিয়ে সব নিথর, নিস্পন্দ।

পিছনে বাঁধের ওপরের মাটি কাটাদেরও ব্যাপারটা নজরে এসেছে। ঝুড়ি কোদাল ফেলে তারাও ঐ দিকে এগিয়ে যায় নিঃশব্দে।

একটা কিছু ঘটছে।

চাষা বাপ। মোক্ষদা না?—তা ওখানে কি করতেছে। ...(মোক্ষদার ছলা কলা, আকার ইঙ্গিতও অভি-ব্যক্তির শেষ নেই)...হেই হ্যা, হেই হ্যা...উঃ!... ছ্যাখ শালীর বিটির শালীর কাণ্ড? (চাষা বাপ বাঁ হাতের চেটোয় দারিদ্র্যের ধার মোছে) আর ঐ শালারে আজ আমি খতম করে ছাড়বো। মোক্ষদা?

এগিয়ে যায় দু-এক পা।

চাষী বৌ। টেঁপিরি তুমি ঘাটাতি যেও না বলছি?

চাষা বাপ। ভাবভঙ্গী তো ভাল বলে মনে হচ্ছে না আমার, ই—য়্যাঁ!

চাষী বৌ। (মুগুর তোলে) খবরদার বলছি টেঁপিরি ঘাঁটাবে না তুমি।

চাষা বাপ। তুই সরে যা মাগী।

চাষী বৌ। খবরদার বলছি মুগুরির ঘাড়ার বাড়ি মেরে আমি দু-ফাঁক করে দুবো তোর মাথা। তুমি আমারে চেনোনি এখনও।

চাষা বাপ। নতুন করে তুই আমারে আবার কি চেনাবি?

চাষী বৌ। যখন যেমন তখন তেমন। কোলের কচি গ্যাঁদাড়ার মুখি এখনও একরত্তি ফ্যান পড়েনি। কি বলবে তুমি?

ঝগড়ার মাঝখানে মোক্ষদা বেরিয়ে যায়।

চাষা বাপ। তাই বলে চোখির ওপর এই অনাচার?

চাষী বৌ। হ্যাঁ, অনাচারই আচার আচরণ।

চাষা বাপ। কখনও না।

চাষী বৌ। একশোবার!

দা তোলে। মুগুর দা-য়ে ঠোকাঠুকি। চাষা বৌ-এর হাত থেকে মুগুর টেনে ফেলে দেয়। মারামারি, চুলোচুলি)

অনন্ত। (জোয়ান ছেলে বাধা দিয়ে বাপকে সরিয়ে বলে) যে যা করছে করুক গে।—খেতি যখন দিতি পারছো না তুমি, তখন খামিখা···

চাষা বাপ। তাই বলে নাং করবে?

অনন্ত। করবে নাং।

চাষা বাপ। অগ্রজ হয়ে তুই—এই কথাডা উচ্চারণ করতি পারলি?

অনন্ত। কিসির অগ্রজ?—তুমি তো আমারও অগ্রজ। বাপ হও তুমি। কি করতি পারছো? যা দুটো উঠতেছে মুখি অন্ন সে তো টেঁপিই যোগাচ্ছে।

চাষা বৌ। যোগাচ্ছে আর সেই অন্ন তুই খাচ্ছিস। কথা বলতি তোর...তোরে আমি···

ঝটাপটি, মারামারি। বাপ ছেলেকে মুগুর মারে। এলো-পাথ্যারি ঘুঁষি মেরে বিধ্বস্ত করে অনন্ত বাপকে—কষ বেয়ে রক্ত পড়ে বাবার—চিৎকার চেঁচামিচি।

স্বল্পক্ষণের মারামারি অচিরেই থেমে যায় অন্যজনের বাধাদানে।

হাত ঝেড়ে একে ওকে ধমকে ওরা চলে যায় নিজের কাজে। চাষা বাপ বসে পড়ে স্থাণু হয়ে। অনন্ত দূরে বসে দাঁত খোঁটে।

ইতিমধ্যে চাষী বৌ মা-কে ঘিরে একদল ছোট মেয়ে মোক্ষদার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিল দূর থেকে। বয়স অনুযায়ী বোধগতভাবে তাদের ভাবভঙ্গী হচ্ছিল। মা-য়ের মুখ থমথমে। দু-চোখ ভরা জলে। কখনও বা আগুন ঠিকরোচ্ছিলো দাঁতে ঠোঁট চিপে।

চাষী বৌ এর চিন্তাভাবনার নিশানা ধরেই লক্ষ করা যায় বাঁধের ওপর থেকে একদল মাটিকাটা বেলচা কোদাল লাঠি নিয়ে মঞ্চের বাইরের গোলমালের ওপর লাফিয়ে পড়ে। মঞ্চের ভেতর থেকেও অনন্ত, ভাগে প্রমুখরা লাঠি হাতে ছুটে যায়। পরিদৃশ্যমান কিছুই নয়; শুধু লাঠিবাজির শব্দ, হট্টগোল, চিৎকার চেঁচামেচি, আর যুগপৎ বোমা বিস্ফোরণের শব্দে ঘটনার ভয়াবহতা প্রতীয়মান হয়। ক্রমশ গোলমাল

মিলিয়ে যায়। মাটি কাটারা বাঁধে ফিরে যায়। অনন্ত ও ভাগ্নেরা ডেরায় ফিরে এসে লাঠি ঠেঙা রেখে দেয়।

অপেক্ষমান শুধু মা। একদল মেয়ে তাকে ঘিরে আছে। সবাই মোক্ষদা-কে দূর থেকে দেখছে।

মা-য়ের ক্লান্ত প্রসন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমান হয়; মোক্ষদা ধীরে ধীরে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। একপা, দু পা, এগিয়ে যান মা।

দেহভার টেনে স্খলিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসে মোক্ষদা মা-য়ের কাছে। আলুলায়িত ভিজে ভিজে চুল লেপটানো মোক্ষদার তেল-কালো মুখে। কোঁচড়ের খুঁট ঝেড়ে ডান হাতে মায়েব কাঁধে ভর দিতেই সব চাল মোক্ষদার মাটিতে পড়ে যায়। বাঁ হাতে ট্যাঁক থেকে কখানা দুমড়োনো কাগজের নোট বার করে মোক্ষদা মায়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

মা কিছুই দেখেন না। মায়ের দুচোখ জুড়ে তখন প্রতিমার মুখ। দরবিগলিত বারিধারা চোখে।

এক মুহূর্ত মায়ের বুকে মাথা রেখে মায়ের বুক থেকে পায়ের ওপর মোক্ষদা গড়িয়ে পড়ে অচৈতন্য হয়ে যায়। সকলে তখন ধরাধরি করে মোক্ষদাকে পিছনে নিয়ে যায়; —সেবাযত্নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অন্ধকার ক্রমশ ঘনায়মান হয়। ডেরায় ফেরে মাটি-কাটারা আর ফেরে চাটি, বাটি, ঠেঙ্গা, খাবি হাতে ভিকিরিরা। এখানে সেখানে ঢাল জমিতে ইঁটের উনুনে আগুন জ্বলে। ধোঁয়া হয়। ধীরে আনা-গোনা স্তিমিত হয়ে আসে। রাতে সবটাই মনে হয় কবর খানা।

ক্রমশ ভোরের অস্পষ্ট আলো ফুটে ওঠে। প্রতীয়মান হয়, মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদর মুড়ে মাটিকাটারা চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে যেন ছড়ানো ছিটোনো কয়েকটা লাশ। আর সব ভিকিরিরা আশে পাশে কুঁকড়ে শুয়ে শুয়ে আছে।

আলো ফুটে উঠলে বুড়ো ভিকিরিরা চাটি বাটি লাঠি নিয়ে এন্তে ভিক্ষার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। মেয়েরা ছেলেরা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়।

বেলা হয়। কাজে যেতে হবে। একজন মাটিকাটা ঘুম ভেঙে উঠে বসে। ব্যস্ত ভাবে অপরকে ঘুম থেকে ঠেলা মেরে তোলে।

অভিমন্যু। এই, শান্তনু উঠে পড়।
কাজে যাবি নে? হেই···

শান্তনু। (উঠে বসে। এক অপরকে ঠেলা মেরে তোলে) উঠে পড়, উঠে পড়—দেরী হলো!

চলচ্ছক্তিহীন ভিকিরিরা যে যার মতো নিজের জায়গায় হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায়। চাষা বাপ—বাবা, হেই বাবা দেই বাবা বলে পথচারীর কাছে ভিক্ষা চায়। যে যার কাজে ব্যস্ত। মাটিকাটারা কোদাল, ঝুড়ি, ইত্যাদি হাতিয়ার নিয়ে তৈরি হয়ে নেয়।
এক ভীষ্ম তখনও ওঠে না। চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থকে। গত দিনের ঘটনায়—ভীষ্ম আহত। কাজে যেতে পারবে কি না তাই নিয়ে জওয়ানদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা।

শান্তনু। ভীষ্ম এখনও উঠলো না।—বোধ হয় ও আর আজ কাজে যেতি পারবে না। চোট আছে।

বলরাম। ভীষ্মের আজ শরশয্যা। প্রাণে বেঁচেছে এই ঢের। ও আজ কাজে যেতি হবে না।
—না যাক। মাটি কাটা ঝুড়ি বওয়া, ওরে দে আজ কোনটাই হবে না।

লাফিয়ে ওঠে ভীষ্ম কথা শুনে ঘুম ভেঙে।

ভীষ্ম। হবে না, হওয়াতি হবে।—মাটি কাটতি না পারি ঝুড়ি বইতি পারবো। যাবো।

অভিমন্যু। না গেলিই ভাল করতে।—যে কাজ নেই তোমার ভীষ্মদা।

ভীষ্ম। সে তো বোঝলাম। কিন্তু কাল যখন পাছায় নাথি মারবে তখন···

শান্তনু। দাঁড়াতিই তো পারছো না।

ভীষ্ম। এই তো দাঁড়িইছি, এই তো!—পাছায় এটা চোট আছে, তা সে আর কি করা যাবে। কাজে যেতি হবে।···এট্টু গরম চা পেলি হতো।

শান্তনু। আনতি গেছে চা। তুমি বসো।

ভীষ্ম। আমার ঝুড়ি কোদাল নিইছিস।

শান্তনু। সব ঠিক আছে।

টিনের কৌটয় গরম চা আসে। ভাঁড়ে ভাঁড়ে চা হাতে হাতে ফেরে।

। (চাষাবাপ-কে) কি হেই বাবা, দেই বাবা করছো

আর কেই বা তোমারে পয়সা দেচ্ছে,—ধর এট্টু চা খাও।

চাষাবাপ। পেটে যখন খেতি পারছি নে তখন বসে থাকবো?—মেঙ্গে খাই,—যা জোটে।

ভীষ্ম। সে ভাল, আগে চা খাও— গরম আছে।

চাষাবাপ-কে চা দেয় শান্তনু।

চাষাবাপ। (চা-এ চুমুক দেয়) বল বল বাপুবল জল জল ইন্দিরির জল;—যদ্দিন খটে খেতি পারবি।

শান্তনু। মাটি কাটতি, ঝুড়ি বইতে ঠেলা আছে মামা। হাতের নড়া আর পিঠির খাঁচা ফাটো ফাটো।

মামা। লাঙল ধরা অভ্যেস, করতি হচ্ছে মজুরির কাজ— চাষার কি দুর্গতি। তোদের যে কি কষ্ট হচ্ছে সে কি আর আমি বুঝি নে?

ভীষ্ম। তবু করতে হবে। নইলি বাদ দে দেবে ঠিকেদার। উটকো কাজের ঝামলা কত?

বলরাম। ঐ মানিার ভাইরি ইচ্ছে করে একদিন খাদের মধ্যি ফেলে মাটি চাপা দে দেই।—দু টাকা, তিন টাকা, প্রত্যেকের কাছের থে দালালি উশুল করবে।

ভীষ্ম। আমি দেইনি। এক পয়সা ঠেকাইনি।

বলরাম। আর কারো সঙ্গে কারো কথা বলতি দেবে না। নিরন্তর দৌড়ির ওপর রাখবে। বিড়িটা যে খাবা দু দণ্ড বসে, তাও দেবে না। মোটে দাঁড়াতি দেবে না।

ভীষ্ম। পেয়ারের নোক হয়েছে এখন হর্ষবর্ধন। মানিার ভাই হর্ষরে এখন ক্যাম্পে থাকতি দেচ্ছে। হর্ষর বউ আবার ঠিকেদারের ঘরে যাওয়া আসা করছে, পাঁঠা, মুরগী রেঁধে নে যাচ্ছে। এদানিতি হর্ষরে কোনদিন কোদালিতি হাত দিতি দেখিছিস?

শান্তনু। তাই তো বলি ভাই, হর্ষ এখন ইস্টোরে কেন?

ভীষ্ম। হর্ষ এখন ইস্টোর মাস্টার। উন্নতি হয়েছে বউ-এর কল্যাণে।

বলরাম। ঠিকেদার আবার এখন হর্ষর বউ-র কল্যাণ করতেছে।

মামা। বৌ-র কল্যাণে সোয়ামির কল্যাণ, সোয়ামির কল্যাণে বৌর কল্যাণ;—ঠিকেদারের কল্যাণে সকলার কল্যাণ।

ভীষ্ম—খাঁটি কথা বলেছো মামা। ধর এটা বিড়ি খাও। …আরও কথা কি জানো মামা?—মাটি কাটা লোকের তো কিছু কমী নেই?—রোজ নতুন নতুন মানুষ এসে লাইন দেচ্ছে মাটি কাটবে বলে। রোজ-এর কোন অভাবনি। তাই কাজ কামাই-এর ঝুঁকি আছে। শরীল বেযুত হলিউ তোমার যেতি হবে কাজে— নড়াই তোমারে করতিই হবে।

মামা। নইলি তো পথে নাবিয়ে দেবে। ঠিক কথা। নড়াই বই কথা নি। তরিকা নি।

ভীষ্ম। তবে মামা এটা কথা জানবে,—এ মাটি কাটার শেষ হবে নি।—মাটিরও শেষ নেই, কাটারও শেষ নেই। এই মাটিকাটা মনে হয় মামা একদিন শহর গঞ্জ ছাড়িয়ে আবাদ পেরিয়ে সাগরের দিকি চলে যাবে।

শান্তনু। আর মাটি বলে মাটি?—খাদের দুধারে মাটি জমেছে তোমার পাহাড় পর্বত। ধ্বস যদি নামে একবার তো ঐ খানেই, হয়ে যাবে তোমার জন্মের সমাধি। শালবল্লী কি বাঁশখোঁটার জাঙ্গাল বাগ মানাতি পারবে না ঐ ধ্বস।

মামা। তা হলি কি হবে?

ভীষ্ম। ঝামালা আছে, তা সেই ঝামালা নিয়েই কাজ করতি হবে। আর কাজ তুমি পাচ্ছো কোথায়?

বলরাম। কাজ আছে, আরও অনেক কাজ আছে। কল-কারখানায় কি আর আঙ্গা কোন কাজ নি?

ভীষ্ম। আছে, কিন্তুক তোর আমার জন্যি নেই। মোগার সেখেনে ঢোকাঢুকি নেই। রোড্ কোলোজ।

মামা। সেডা আবার কি?

ভীষ্ম। ঢুকতি দেবে না। ঢুকতি দেবে না, প্রথমত আমরা তেমন শিক্ষা তো নই। দ্বিতীয়ত, আঙ্গা তেমন জান্‌পরিচয় নি, ধরপাকড় করবার লোক নেই আমাদের।

শান্তনু। নয়তো হতি হয় তোমারে হর্ষবর্ধন!

ভীষ্ম। যা বলিছিস।

মামা। না, না, কক্ষনও না। মেঙে খাব সেও ষীকের। —না।

বলরাম। আচ্ছা ভীষ্মদা, গভরমেন্ট নাকি বাবুদের ঠেঙে সব কলকারখানা খাস করে নেচ্ছে?

ভীষ্ম। শুনি তো কিছু কিছু নেচে। কেরমে কেরমে জাতীয়করণ হচ্ছে।

মামা। ছাই হচ্ছে জমী জাতীয়করণ হলো জমী পালাম?

ভীষ্ম। তুমি পেলে না, তোমার নাতি-পুতি পাবে। এক জন্মেই সব উশুল করতি চাও?…চল সব কাজে চল।

মামা। মানুষ জাতীয়করণ হলো না; সব ভিকিরি হয়ে গেল।—জাতীয়করণ হচ্ছে!

ভীষ্ম। এই; এখন এ ব্যাপারে গবর্ণমেন্টই ব্যাগড়াদার না ব্যাগড়াদাররাই গবর্ণমেন্ট—ঠিক ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।—একই অঙ্গে দুই রূপ মেশামিশি হয়ে আছে—অরপরূপ এক অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।…

মামা অবাক বিস্ময়ে ভীষ্মর দিকে তাকিয়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখে। ভীষ্ম, বলরাম, শান্তনু—প্রত্যেকের কাঁধে হাতিয়ার তুলে চক্রাকার পরিক্রমণ করে আর বলে।

মামা। …ভোলে বাবা পার করেগা, পার করেগা ভোলে বাবা পার করেগা…

মাটিকাটাদের প্রস্থান।

মামা। 'হেই বাবা' সেই বাবা বলে এদিকে সেদিক ভিক্ষে মাঙে। বর্ষীয়ান ভিক্ষুকরা হাত বাড়িয়ে শম্বুক গতিতে চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে নড়বড় করে।

লোহা পেতলের ভাঙা টুকরো ছিপি কুড়িয়ে দু তিনটে ভিকিরি ছেলে ঘরে ফেরে। ঠাঁই ঠাঁই বসে যে যার সংগ্রহ খতিয়ে দেখে।

পেছনে বাঁধের ওপর মাটিকাটারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বেলা বাড়ে।

একদল অন্ধ আতুর কানা খোঁড়া নুলোর ত্বরিৎগতি প্রবেশ, যেন তাড়া খেয়ে ঢুকছে ওরা।

কানা। (লাঠি দিয়ে পেছনের সহযাত্রীকে তাড়না করে) হুড়বড় করিস নি তো! দেখছিস এগুচ্ছি। আর এট্টু হলিই হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তাম। চোখি দেখি?

খোঁড়া। পেছন থেকে ঠেলা মারতেছে তার আমি কি করবো? ইচ্ছে করে মেরেছি?

কানা। ঐ নুলো শালারে আনলি কেন সঙ্গে? নড়ার জোর আছে ও তো কালীবাড়ী যেতে পারতু।.. হৈ ত্যা আবার ঠেলা মারে?

খোঁড়া। এগোও না, চলতি চলতি কথা বলো।

কানা। (দু-পা এগিয়ে ঘুরে) বল্লাম, আমরা যারা কানা, খোঁড়া, নুলো, অন্ধ, আতুর—মোগার তেমন কোনো বিপদ নেই। বিপদ হলো তো যাদের শক্তি ভক্তি আছে,—গতোর আছে, করে কম্মে খেতি পারে, তাদের। (অন্য ভিকিরিদের লক্ষ্য করে) গতোর আছে, ক্ষেমতা আছে তাদের, তোরা কেন মেঙে খাবি শালারা? খেটে খাগে যা না। আমরা হলাম অন্ধ, আতুর চলতি ফিরতি পারি নে। মোগার ক্ষুধার অন্নে ভাগ তোরা বসাচ্ছিস শালারা, তোদের লজ্জা করে না? বাবুরা কতো দেবে?—কনথে দেবে?

মামা। কি বিত্তান্ত?—সোরগোল কেন?

খোঁড়া। (টিপুনি কাটে) এই আসেন।

কানা। কেডা ওডা?

খোঁড়া। (মামাকে) খুব তো দেখি ডাঁটো আছে।—খুব সাবধান।

মামা। কি সাবধান? সাবধান করতি এলে তুমি আমারে এতকাল পর?

খোঁড়া। এই কথা। পাততাড়ি গুটিয়ে ফেল সময় থাকতি থাকতি। নইলি চালান হয়ে যাবা শহরেথে।—সব ধরে নে যাবে।

মামা। কেডা ধরবে ধরুক দিনি? শালা মগা, তুই আমারে সাবধান করতি এলি?

খোঁড়া। আমি কেন?—যে করবার সেইতি এসে সাবধান করবে। ভাল কথা বল্লাম তাই মনে ধরলো না। বল্লাম, শহরে আর তোমাদের থাকাথাকি হবে না। ডাঁটো আছ তুমি, করে কম্মে খেতি পারো, ভিক্ষে করতি দেবে না;—সব চালান করে দেবে।

কানা। শহর সোন্দরী হবে।—তোমরা নোংরা করছো।—

খোঁড়া। চারদিকি হেগে, মুতে…

মামা। আর তোমরা?—চন্নামেত্য ছিটোচ্ছো?

কানা। তবু কথা বলবে?—আমরা হলাম কানা, খোঁড়া

অন্ধ, আতুর, নুলো। কিছু করবার নি যোগার। আর তোমরা হলে তো সক্ষম দেহধারী মানুষ। খেটে খেতি পারো। অন্যায়ডা কি বলা হয়েছে শুনি?

মামা। ও, অন্যায়ডা সয়েই তবে অন্যায় করিছি আমরা ...সক্ষম দেহধারী দেখতোছো?

কানা। আঙ্গা হাত আছে তো পা নি পা আছে তো হাত নি, চোখ নি; মাথা আছে তো হুস নি...

মামা। আর আঙ্গা যে সব থাকতিউ কিছু নেই। হাল, গরু, ভিঁটে, মাটি—সব বাণের জলে ধুয়ে মুছে গেছে। কুটোর মতো মাটি কেমড়ে মরতি মরতি বেঁচে আছি আমরা।—কি বলতোছো তোমরা, দেহধারী?

কানা। তা হলি তো দেখি তোমাদের অবস্থা আমাদের চাইতিউ খারাপ।--দেহ তোমারে ধারণ করে আছে?--তুমি দেহের কোনখানে নেই?

মামা। না, নি।

কানা। কিন্তু কেন?

খোঁড়া। কেন?

নুলো। কি করে হলো?

আতুর। কেডা মারা গেল?

উচ্চকিত থমথমে ভাব। প্রবীণ চলচ্ছক্তিহীন ভিকিরিরা খটমট করে নড়বড়িয়ে পড়ে ওঠে। হঠাৎ পিছন দিককার ভিকিরির জমায়েৎ থেকে নবজাতকের কান্না ফেটে পড়ে।

কানা। আছে।

খোঁড়া। বেঁচে আছে।

নুলো। হৈ!

কানা। আছে, আছে।

নবজাতকের কান্নার সঙ্গে মাদলসঙ্গীত ক্রমশঃই প্রবল হয়। সামনের দিকে কয়লা কুড়োনো ছোট ছেলেদের মধ্যে কথোপকথন হয়।

এক। ভাই হয়েছে।

দুই। এবার তা হলে তোরা দুটো থলে নিতি পারবি। তুই এট্টা আর তোর ভাই এট্টা?

এক। পেরথমে ছিপি কুড়োবে, আংতা কুড়োবে; তারপর বস্তা ধরবে, কাগজ কুড়োবে।

তিন। আমার যদি এট্টা ভাই থাকতু!

দুই। তোর মা-ডা বেঁচে থাকলি অ্যাদ্দিনি তোরা অনেক কডা ভাই হতি পারতিস।

এক। মা নেই, বাপ তো আছে।

তিন। বাপ কখনও বাচ্চা পাড়ে?

এক। রতন, কালু তো ওর ভাই হয়।

তিন। তাদের মা তাদের ছাড়বে কেন? মা ধরে সম্পর্ক, বলো? বাপটা কি? অগামারা। (পিতৃত্বের উদ্দেশ্যে একজন প্যাঁক দিয়ে ওঠে)

দুই। হেই, বাপরে শালা প্যাঁক দিচ্ছিস?

তিন। দেব তো। (উপুর্যুপরি কয়েকটা প্যাঁক দেয়)

জনৈকা ভিকিরি মেয়ে একটা সানকিতে কিছু তেলেভাজা আর জিলিপি আনে ভূমিষ্ঠের কল্যাণে। হাতে হাতে মণ্ডা মিঠাই বিতরিত হয়।

ধৃতরাষ্ট্র। (মিষ্টি হাতে নিয়ে) কি ব্যাপার?

ভিকিরি মেয়ে। সদার মায়ের ছেলে হয়েছে, তাই...

পাণ্ডু। (হাতে ফুলুরি নিয়ে) জিলিপি দেখতি পাই।

ভিকিরি মেয়ে। সদার মায়ের ছেলে হয়েছে গো!

পাণ্ডু। ভগবান মঙ্গল করুন।

ভিকিরি মেয়ে। এই যে, ধরো দাদা মিষ্টি নাও।

পরমেশ্বর। হ্যাঁ শোনলাম সব;—ছেলে হয়েছে সদার মার।

মঙ্গল গানে একটানা কান্নার মতো তখনও শোনা যায়। বেলা পড়ে আসে।

সহসা বাঁধের ওপর ভীষণ হট্টগোল শোনা যায়। বহু শ্রমিক ও মাটি কাটাদের দৌড়ঝাঁপ, চেঁচামিচিতে বাঁধের ওপরকার ভৌগোলিক রেখা ভাঙতে থাকে। বাঁধ ভাঙছে। সমূহ সর্বনাশের আতঙ্কে থর থর করে মঞ্চ কেঁপে ওঠে। উর্ধ্বশ্বাসে কিছু লোক বাহিরে থেকে ভেতরে ও ভেতর থেকে বাহিরে ছুটোছুটি করে। প্রবীণ ভিকিরিরা দৈত্যের মতো চলাফেরা করে। মামা তারস্বরে বলরামকে ডাকে। শান্তনু খবরদারি করে সবাইকে। ভীষণ বিশৃঙ্খলার মাঝখানে বুনো মোষের মতো ভিড় ঠেলে ঢোকে অভিমন্যু।

অভিমন্যু। তফাৎ যাও; তফাৎ যাও।

শান্তনু। বলা হচ্ছে সরে যাও। (ঠেলা মেরে ফেলে দেয়)

বলরাম। ভিড় করবে না, সামনে ছেড়ে...

অভিমন্যু। বড্ডি এসে গেছে। তফাৎ যাও। তফাৎ যাও।

দুজন মাটিকাটা দুদিকে হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে পেছনে হটিয়ে দেয়।

ভীষ্মর মৃতদেহ মাটিকাটারা কাঁধে নিয়ে ভেতর ঢোকে। চাপা গণ্ডগোলের মাঝখানে মেয়েদের আর্তনাদ হঠাৎ ফেটে পড়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

মামা। এ কি করলি ?—বলরাম !!

শান্তনু। মাটি চাপা।

বলরাম। মাটি কাটতি-কাটতি মাটি চাপা।

অভিমন্যু। ওপর থেকে পনেরো বিশ ফুট মাটি, বলতি গেলি সে পাহাড় পর্বত...

বুড়ী। কেডা গেল

মেয়ে। কার কি হলো ?

মেয়ে। কেন হলো ?

চাপা আর্তনাদ আগুনের মতো গন গন করে।

অভিমন্যু। (মামাকে) মামা, আচার আচরণ যা করবার তুমিই করো সকলার হয়ে।...ভীষ্ম তোমারে খুব ভালো বাসতু...(গলা ধরে যায়)···

শান্তনু। যা করবার এট্টু তাড়াতাড়ি করবেন। বড্ডি কিন্তু এখানে বেশীক্ষণ থাকবে না। কাজ হলিই এখান থেকে সিধে কাঁটাপুকুরি চলে যাবে।

গণৎকার। না স্বর্গ, নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ—এক্ষেত্রে কাঁটাপুকুরই প্রশস্ত।

ভাগ্নে। (গণৎকারকে) এট্টু চুপ দেবেন ?—এট্টু !

আত্তিরা ধীর মন্থরে শায়িত শবদেহ অর্ধচক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ায়। মাথা শিয়রে প্রবীণ প্রধানেরা; পায়ের দিকে মাটিকাটারা। মামা মৃতের সামনে ক্রিয়াকর্মে ত্রস্ত আনাগোনা করে।

মামা। গেরাম সম্পর্কে আপ্তজন যারা আছেন, তেনারা সব একধার হয়ে যাবেন।—জ্ঞান পরিচয় নি, প্রবীণ অগ্রজেরা তফাৎথে ভীষ্মের সদ্গতি কামনা করবেন।...

হাঁসখালির হাঁস, আবাদে থাকলি বাঘের পেটে যেতো, সাপে কেটে মারতো। পেটের দায়েটিম কাটতি এসে আজ সে মাটি চাপা পড়ে মরে গেল... ভীষ্ম আমারে বলিছিল এ মাটি কাটার শেষ হবেনি। এই মাটি কাটতি কাটতি শহরভারে সে একদিন আবাদ পেরিয়ে সাগর পর্যন্ত যাবে। ভীষ্মর হেতের এখন আজ্ঞা হাতে। মাটি কাটা চলবে।.. ভীষ্ম মরতো না। মলো যে, ত্যাও এক ঘটনা। কথাডা বলি। কোলের ছেলের এই নিগ্রহ, মা মাটির ভালো লাগলো না। ধাড়ে-বাড়ে কাউরি না পেয়ে তখন তিনি বনবিবিরে দে, মা জগদম্বারে খবর করলেন,—যে দিদি, ছেলে যখন তোমার আশ্রয়ে, তখন ছেলের ভালোমন্দ এখন তোমার হাতে। ছেলের আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমার সন্তানরে দেখো।... জননী জন্মভূমি তখন অস্থির হয়ে উঠলেন। কেঁপে উঠলো তেনার বুক। কাঁপতি লাগলো মাটি। মা জননী তখন হেঁটমুণ্ড হয়ে দু হাত বাড়িয়ে কোলের ছেলে কোলে তুলে নিলেন।...

ভীষ্ম চলে গেল। মোগার কামনা বাসনার শেষে সলতে আগা দু চোখের ওপর দাউ দাউ করে জলে গেল।—যদ্দিন না আমার মা মাটির বুক কাঁপবে ভুঁইডোলা কি ভূকম্পন হবে, বাটি-চাপা-মাটি-চাপা-আমরা, তখন আবার ভীষ্মরে নে মাটির বুকি উঠে দাঁড়াবো আবার আমরা ...(গলা ধরে যায় মামার) ...কামনা কথার এই শেষ! এখন ছেলেরে তোমরা সেঁকতাপ দাও, মুখ মিষ্টি করাও...

আচার আচরণ। মেয়েরা ভীষ্মের মরা মুখে সন্দেশ গুঁজে দেয়।

পাণ্ডু। আমাদের ছেলে এখন কাঁটাপুকুর চলে যাবে। গওরমেন্ট তার হেফাজতি করবেন।

কাঁচা বাঁশের চেঁটি আনা হয়। বলরাম, অভিমন্যু, শান্তনু মৃতদেহ বাঁশের চেঁটিতে তুলে হরিধ্বনি দিয়ে শব তোলে। ধীর মন্থরে শবাধার এগিয়ে যায়। পিছনে অগণিত শোকাহত আর্তি। বাঁধের ওপর দিয়ে ধীর মন্থরে এগিয়ে যায় মিছিল। অনাগত ঝঞ্ঝার সঙ্কেত জানিয়ে চাপা বিদ্যুৎ ঝলকে চমকে চমকে ওঠে শৈলশ্রেণী—মাটির পাহাড়।

সপ্তাহ-র সৌজন্যে

। । । । । । সমাপ্ত । । । । । ।

ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজনা ও তৎকালীন সমালোচনা। সংগৃহীত

ক্যালকাটা থিয়েটার তার দ্বিতীয় পর্বের যাত্রা শুরু করে 'গোত্রান্তর' দিয়ে। ১৬ই আগস্ট, ৫৯ রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে 'গোত্রান্তর' অভিনীত হয়।
সাইন অ্যাডভান্সের রিভিউয়েও যেখানে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সমাজ বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো সম্ভব হয়েছে (৩ নভে, ১৯৫৯,) সেখানে অল্প পরবর্তীকালের 'গোত্রান্তর'-এর ২৪ জানুয়ারী '৬০ শোয়ের রিভিউ করতে গিয়ে 'দেশ' (৬.২.৬০) নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীকে উদ্দেশ্যধর্মী বলে বর্ণনা করেছেন।

১ △ ক্যালকাটা থিয়েটারের গোত্রান্তর

দেশ বিভাগের অভিশাপ সমাজ-জীবনের নৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতেই যে শুধু দেখা দিয়েছে তা নয়, গত কয়েক বছর ধরে এর বিষময় ফল ফলতে শুরু করেছে সাহিত্যে ও চারুকলায়।
নাটকে এই অবক্ষয়ের সূচনা দেখি, যখন নাট্যকার পূর্ববঙ্গের নিম্ন মধ্যবিত্ত ছিন্নমূল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমাজ বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন বীজাণুর সন্ধান করে বেড়ান। এই অনুসন্ধান উদ্দেশ্যবাদী রাজনীতিকের, নাট্যকারের নয়। নাটকের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য যখন কোন বিশেষ সমাজ দর্শনের বাহন হয়ে দেখা দেয়, তখন শিল্পের শর্তকেই শুধু অস্বীকার করা হয়। 'উদ্দেশ্যধর্মী' নাটকে জীবনের বাণী হয়তো থাকে, কিন্তু জীবন ভাবনা থেকে সে নাটক বিচ্যুত। কারণ উদ্দেশ্যের উপাদানে ভরপুর জীবন কখনই জীবনরসের পূর্ণকুম্ভ হয়ে উঠতে পারে না। জীবনধর্মের সামান্যও নাটককে বড় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়। আর এই সামান্যও যে নাটকে নেই সে নাটক সমাজ জিজ্ঞাসার বাণীবহ হতে পারে, কিন্তু জীবনধর্মে মহৎ নয়।
ক্যালকাটা থিয়েটার অভিনীত, প্রগতিবাদী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য-র "গোত্রান্তর" (গত ২৪শে জানুয়ারী নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ) নাট্যরসিকদের কাছে এমনি এক সমাজবাদী বক্তব্যের নাট্যরূপ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে।
পূর্ববঙ্গের একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত বাস্তুহারা পরিবার ভাঙনের শেষ দশায় সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে কলকাতায় শেষ পর্যন্ত মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে নেয় এক বাঙ্গালী বস্তিতে। বস্তির অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যেই পরিবারের কর্তা হরেন্দ্র, একজন ভূতপূর্ব স্কুল শিক্ষক, খুঁজে পান আসল মানুষ। তাঁর মেয়ে গৌরী খুঁজে পায় তার মনের মানুষ বস্তির ছেলে কানাই-এর মধ্যে—যে কানাই নিজের জীবন তুচ্ছ করে গৌরীকে বড়লোকের লালসার ফাঁদ থেকে বাঁচিয়েছে। পরিবারের গৃহিনী শঙ্করীর কাছে বস্তির আবহাওয়া অসহ্য। গৃহস্বামী হরেন্দ্র'র কাছে বস্তিবাসীরাই ভদ্র, সত্যিকারের মানুষ। তিনি চান তাদের সঙ্গে নিজের ও তাঁর পরিবারের সমগোত্র-পরিচয় গড়ে তুলতে। গৌরীর সঙ্গে কানাই-এর বিয়ে দিয়ে এবং বস্তি উচ্ছেদকারী ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি এই গোত্রান্তর সার্থক করে তোলেন।

বিজন ভট্টাচার্যের এই নাটকের মূল বক্তব্য—নাটকের নামকরণে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—শিক্ষা ও আভিজাত্যের অভিমান বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজের কুলীন ও অকুলীনের, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সমগোত্র প্রতিষ্ঠা। নাটকের মর্মবাণীর বিস্তারের প্রয়োজনে এতে যে কয়টি ঘটনা সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে একটি শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের ব্যর্থতা ও বিলোপ, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রেণীবৈষম্য ও এক ভাবী সমাজ বিপ্লবের পূর্বাভাস। মানুষের সঙ্গে মানুষের গোত্র-ঐক্য গড়ে ওঠার প্রয়োজনে একটি শিক্ষিত, ভদ্র-পরিবারের ব্যর্থতা বিড়ম্বনা এবং ক্ষয়ের যে অপরিহার্যতা এ নাটকে দেখানো হয়েছে তাতে ভ্রান্ত সমাজবাদের দাবিই সরব হয়ে উঠেছে। মানুষকে সমাজের নীচস্তর থেকে উপরের স্তরে নিয়ে আসার কোন্ শুভবুদ্ধির আভাস নেই এ নাটকের ভাবাদর্শে। উপরের মানুষকে বঞ্চনা ও দুর্দশার মধ্য দিয়ে নীচে ফেলে তাকে গোত্রান্তরিত করে তোলার এক অশুভ আদর্শবোধ এই নাটকের জীবনাদর্শকে প্রভাবান্বিত করেছে। তা-বাদে এক দুরপনেয় নৈরাশ্যবোধের রাহুগ্রাসে এ নাটকের মর্মরস মোহাচ্ছন্ন। আশার বাণী যা রয়েছে নাটকের শেষ দৃশ্যে প্রভাতী আলোয় তাও কষ্টকল্পনা ও অবাস্তবতার আলেয়া।

তবে নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক নাটকের কতগুলি চরিত্রাঙ্কনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি আবেগ মুহূর্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর রসবোধ প্রশংসনীয়।

নাটকটির এই সকল সম্পদের জন্যে বিন্যাস ও প্রয়োগ কর্মের অন্যান্য ক্রটি-বিচ্যুতি উপেক্ষণীয়।

অভিনয়ের দিক দিয়ে নাটকটি অবশ্য প্রশংসনীয়। হবেন্দ্রের চরিত্রে বিজন ভট্টাচার্যের অভিনয় মনোজ্ঞ ও সংবেদনশীল। শঙ্করী ও গৌরীর চরিত্রে যথাক্রমে বেণু ঘোষ ও কুমারী দাশগুপ্তার অভিনয় মনে রেখাপাত করে। অন্যান্য চরিত্রে বাবীন বসু (কানাই), সীতা মুখোপাধ্যায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (রাখাল), অমল ভট্টাচার্য, মণিকা চক্রবর্তী, সলিল ভট্টাচার্য ও শৈলশিখর অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।

তাপস সেনের আলোকসম্পাত ও খালেদ চৌধুরীর শিল্প নির্দেশনা ক্যালকাটা থিয়েটারের এই নাটকটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। নাটকটির মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপট মনোরম। সৌম্যেন ঘোষাল, মহেশলাল শর্মা ও অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশানুগ।

দেশ, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

স্বাধীনতা পত্রিকা ৭ এপ্রিল '৬১র সংখ্যায় ক্যালকাটা থিয়েটার আয়োজিত 'মরাচাঁদে'র সমালোচনা প্রকাশ করেন 'চলচ্চিত্র ও নাট্য আলোচনা' বিভাগের 'নাট্য-মঞ্চে' কলমে বেশ গুরুত্বসহকারে। সোয়া কলম রিভিউ বেরোয়। ডবল গ্রেট কম্প্রেসড্ (৩৬ পয়েন্ট) হয়ফে শিরোনাম দেন।

২ △ মরাচাঁদ

গত ৩১শে মার্চ নিউ এম্পায়ার মঞ্চে শ্রীবিজন ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত ক্যালকাটা থিয়েটারের 'মরাচাঁদ' নাট্যাভিনয় দেখবার সুযোগ আমাদের ঘটেছিল।

গ্রাম বাংলার বাউল, বৈরাগী ও কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে এই নাটক রচিত। নায়ক পবন বৈরাগী অন্ধ লোকশিল্পী। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী থেকে রস আহরণ করে সে তার মানস জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। স্ত্রী রূপবতী রাধাকেও সে ভালবাসে এই ভাবাবেগেরই বিশুদ্ধতা ও গভীরতা দিয়ে।

বামপন্থী সংগঠক শচীনের প্রভাবে কৃষক আন্দোলনের আওতায় আসে পবনের কাব্যশক্তি এবং সে তার কাব্যস্ফুরণের নূতন পথের সন্ধান পেয়ে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে অতি দরিদ্র। গানকে জীবিকার উপায় রূপে পেতে গিয়ে গাঁয়ের আখড়ার ধুরন্ধর মোহান্ত কেতকদাসের শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন হয়। সংগ্রাম বাধে জীবন ও জীবিকার। কেতকদাসও গায়ক। কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যের কদর্য বিকৃতি ঘটিয়ে সে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে সমাজপতিত্ব করে। পবনের স্ত্রী পড়ে তার লোভের দৃষ্টিতে। সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কপট আদর আবেগের টানে পবনের প্রেমকে উপেক্ষা করে কেতকদাসের কাছে চলে যায় রাধা। পবন ভেঙ্গে পড়ে, গণ-সংগ্রামের ডাকে আর সে সাড়া দিতে পারে না। কিন্তু তার স্বগোত্রীয় বৈরাগী চাষীদের এবং বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনের সংগঠক শচীনের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে, সে তার স্রষ্টার সমস্ত শক্তি নিয়ে পদকর্তা ও সুরকাররূপে গণআন্দোলনে যোগ দেয়। (অস্পষ্ট) শিল্পীর নবজন্ম ঘটে

এই হল মরাচাঁদ নাটকের সংক্ষিপ্ততম সারাংশ। এক অভিনব নাটক ও নাট্যাভিনয়। কেতকদাস ও পবন, এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রকে কেন্দ্র করে বাংলার একটি কৃষিজীবি বিশেষ বৈরাগী সম্প্রদায়ের আলোছায়া মিশ্রিত সমাজজীবনের এক আশ্চর্য বাস্তব চিত্র এই নাটকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পবন ও কেতকদাস দুইজনই কবি, দুইজনই গায়ক এবং দুইজনই কথার যাদুকর ও নারীরসিক কিন্তু দুইজনের সাধনার দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা, ফলে ব্যক্তিত্বেরও তাই। কেতকদাসের পথ বিকৃতির পথ, লালসার পথ, স্বার্থপর সম্ভোগ ও শোষণের পথ, সরল নারীকে কাব্যের জালে সম্মোহিত করে ধ্বংস সাধনের পথ। আর, পবনের পথ সহজ সরল ভালবাসা ও গভীর সৌন্দর্যবোধের পথ। মানবিক মর্যাদায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, মানুষকে প্রকৃত নারী-প্রেমে ও জীবন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার পথ। বিজন ভট্টাচার্য নিজে এই দুই ভূমিকায় অভিনয় করে চরিত্রাভিনেতা হিসাবে আদর্শ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ের দিক থেকে এই হোল নাট্যাভিনয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। প্রতিটি পার্শ্বচরিত্র সুঅভিনীত এবং টীমওয়ার্ক সত্যই প্রশংসনীয়। যে সমাজজীবন নিয়ে নাটক রচিত, সঙ্গীত তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নাটকে সঙ্গীতের প্রাচুর্য এসেছে এবং আবহাওয়া সৃষ্টিকে বিশেষ সহায়তা করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের নিজের কণ্ঠ-সঙ্গীতের অবদান উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবী নয়নতারারূপে শ্রীমতী গীতা সেনের গান সত্যই চিত্তাকর্ষক।

এ নাটকের সংলাপ এক আশ্চর্য বস্তু। বৈরাগীদের সমাজজীবন ও আখড়া জীবনের বিশেষ বাক্-প্রয়োগ ও বাক্‌ভঙ্গীগুলি সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু পবনের কথাবার্তায় অকৃত্রিমতার সঙ্গে গভীরতার, এবং স্থূল দৈনন্দিনতার সঙ্গে নিবিড় কাব্যময়তার যে সংমিশ্রণ ঘটেছে তা সত্যই অপূর্ব।

তাপস সেনের উপদেশ অনুযায়ী আলোকসম্পাত নাট্যাভিনয়ের সাফল্যে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল' গল্পে আখড়া ও বৈরাগীদের যে ছবি আঁকার চেষ্টা হয়েছে, বিজন ভট্টাচার্যের 'মরাচাঁদে'র ছবি বাস্তবতার দিক থেকে তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং নিঃসন্দেহে অগ্রপদক্ষেপ।

পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবি ও সঙ্গীতজীবি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সমাজজীবনে এই নাটকের পটভূমিকা রচনা করলেও, ব্যাপকভাবে এবং সাধারণভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জীবিকার সঙ্গে জীবনের মৃত্যুপণ সংঘর্ষের রক্তাক্ত জয়যাত্রার আলেখ্যরূপে এই নাটকের অস্তিত্ব উপেক্ষা করার সাধ্য কারো নাই।

—স্বাধীনতা, ৭ এপ্রিল, ১৯৬১

মফঃস্বলে দেবীগর্জন | অবনী চৌধুরী

রাজধানী থেকে মফঃস্বলে—ভৌগোলিক দূরত্ব যতই থাক না কেন, শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চেতনা ও রুচির ক্ষেত্রে রাজধানী ও মফঃস্বল দুটি প্রায় ভিন্ন জগৎ। দুই জগতের গুণগত পার্থক্য রুচিগত ব্যবধানের জন্য কোন সূক্ষ্ম বিচার বোধের প্রয়োজন নেই। রাজধানীর সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহ মফঃস্বল নিরপেক্ষ কিন্তু মফঃস্বলের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ রাজধানী নির্ভর-শীল, অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ অনুকরণের মধ্যেই এই উদ্যোগ সীমিত। যুগের সঙ্গে তাল রেখে যদি কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতি-শীলতা গ্রাম-গঞ্জ-বন্দরের দিক ধাবিত না হয় তবে 'প্রগতি' কাগজে-কলমেই অথবা বক্তৃতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ ব্যাপারে রাজধানীর দায়িত্ব অনেক কিন্তু কার্যতঃ এই দায়িত্ব কতটা পালন করা হয়েছে বা হচ্ছে তা মফঃস্বলের সাংস্কৃতিক প্রয়াসগুলি সম্পর্কে খবরা-খবর করলেই জানা যায়।

কলকাতার নাটকই সাধারণত মফঃস্বলে অভিনীত হয়ে থাকে। এ আলোচনা যে নাটককে কেন্দ্র করে সেই 'দেবীগর্জন'ও কলকাতার নাটক এবং প্রথম অভিনীত হয় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য'র নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠী 'ক্যালকাটা থিয়েটার'এর প্রযোজনায়। রাজধানীতে অনেক নাটকের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া 'দেবীগর্জন' নতুন করে বেঁচে উঠেছে মফঃস্বলে, যথেষ্ট প্রাণবত্তার সঙ্গে ছোট-বড় অনেক শহর-বন্দরে আজও অভিনীত হয়ে চলেছে। বাংলাদেশের নাট্য-জগতে এ ধরণের ঘটনা নজীর-বিহীন।

ঘটনা এ নয় যে মফঃস্বলের অনেক নাট্য-গোষ্ঠী 'দেবী-গর্জন' মঞ্চস্থ করছেন বা করেছেন। যতদূর জানা গেছে একমাত্র বালুরঘাটের 'ত্রি-তীর্থ' ছাড়া এ পর্যন্ত উল্লেখ-যোগ্য কোন গোষ্ঠী 'দেবীগর্জন' মঞ্চস্থ করেন নি। ১৯৭৩ সালে, বালুরঘাট গোবিন্দ-অঙ্গনে 'ত্রি-তীর্থ'এর 'দেবীগর্জন' প্রথম অভিনীত হয়। ঐ বছরই মফঃস্বল বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসেবে 'দেবীগর্জন' পুরস্কৃত হয়। এ পর্যন্ত বালুরঘাট, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ইসলাম-পুর, রাজা রামমোহনপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বহ-রমপুর ও কলকাতাতে মোট ৩০ বার 'ত্রি-তীর্থ' 'দেবী-গর্জন' মঞ্চস্থ করেছেন। ১৯৭৬ সালেও শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য 'দিশারী' পুরস্কার পায় এই নাটক। আজ এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় মফঃস্বল বাংলার সব চাইতে জনপ্রিয় নাটক 'দেবীগর্জন'।

'দেবীগর্জন নাটকেই জনপ্রিয় হবার মূল কারণগুলি নিহিত। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরল আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনের সমস্যা, সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতি স্বাভাবিক কারণেই মফঃস্বলে বেশী জনপ্রিয় হবে। বাংলা —সর্বহারার সমস্যা মফঃস্বল দর্শকদের কাছে জীবন্ত।

মধ্যস্বত্বভোগী শোষক জোতদার প্রভঞ্জন-ত্রিভুবনের মত দালাল মফঃস্বল বাংলার দর্শকদের কাছে অনেক বেশী পরিচিত— এঁদের ষড়যন্ত্র দর্শকদের বিচলিত করে, সন্ত্রস্ত করে। প্রভঞ্জনের শেষ পরিণতি তাই এঁদের কাছে বেশী উপভোগ্য ও শিক্ষণীয়। আসল কথা মফঃস্বল বাংলার দর্শকরা অনেক গভীর ভাবে একাত্ম হ'তে পারেন, অনেক অন্তরঙ্গ হ'তে পারেন 'দেবীগর্জন' এর চরিত্রগুলোর সঙ্গে।

ম ফঃ স্ব লে বি জ ন

বিজন ভট্টাচার্য সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয়বার, গ্রামবাংলার সংগ্রামী চেতনার সাথী হলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'দেবীগর্জন'-এর মাধ্যমে। এর আগে প্রথমবার 'নবান্ন' পর্বে। তখন প্রতিরোধের আন্দোলনে বৃহত্তর বাংলার তথা ভারতের গণমানুষের সংগ্রামী শিল্পচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন গণনাট্য সংঘের প্লাটফর্ম থেকে। অথচ তাঁর মতো ক্ষমতাবান নাট্যকার যিনি জনগণের সংগ্রামী জীবনের রূপকার এবং বরাবরই সৃজনশীল মৌলধর্মীতায় থিয়েটার-শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন, তার সমাদর আজ এত কম কেন ? আমরা বিজনবাবুর নাটকগুলি, যেহেতু তা গ্রামীণ সমস্যা কেন্দ্রিক, গ্রামের সেই নিরক্ষর কিন্তু সংগ্রামী অভিজ্ঞতায় পোক্ত জনগণের কাছে কতখানি সমাদৃত হয়েছে জানতে চেয়ে বহুসূত্রে খোঁজ করেছি, বিজনবাবুকে সাক্ষাৎকারেও ধরেছি, কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাইনি যে বিজন ভট্টাচার্যের নাটকগুলি সম্পর্কে মফঃস্বল বাংলার বিভিন্ন এলাকার গ্রুপ থিয়েটারগুলি প্রযোজনায় আগ্রহী বা প্রযোজনা করেছে। মফঃস্বল বাংলায় বিজনের নাটক সম্পর্কে আগ্রহ কমেছে বিজনের সাংগঠনিক ব্যর্থতার জন্য। প্রথমতঃ গণনাট্য সংঘ ছেড়ে যাওয়া। দ্বিতীয়তঃ কোন গ্রুপ থিয়েটারকে বিশ্বাস করে নাটক দিতে না পারা, তাঁদের থিয়েটারী দক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত জেনেও তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে বেশী মাত্রায় স্পর্শকাতরতা। তৃতীয়ত সব নাটকেই অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ। চতুর্থত ডায়ালেক্টের বাধা, নাহলে দেবীগর্জন নবান্নর চেয়েও গণপ্রিয়তা অর্জন করতে পারতো। পঞ্চমত গোত্রান্তর-এর উত্তরকালে রচিত অধিকাংশ নাটকেই, একমাত্র দেবীগর্জন বাদ দিয়ে, বক্তব্য-নির্মাণ, এবং নাটকীয় বিন্যাস কলায় অস্পষ্টতা, স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে ; যার ফলে বিজন-হীন নাট্যাঙ্গনে, নাটকের যারা স্বরলিপিও চেনেনি এমন অনেক দুর্বল নাট্যকারও আজ সবচেয়ে বেশি অভিনীত ! 'ত্রিতীর্থ'র দেবীগর্জন দেখেছেন, গ্রাম বাংলায় থাকেন এমন একজন থিয়েটার-প্রেমীর কাছ থেকে আমরা এই প্রতিবেদন আনিয়েছি। অভিনয় পত্রিকা আজ মফঃস্বল বাংলার থিয়েটার দর্পণ। ওই কাগজ ঘেঁটে আমরা যে কটি দলের প্রযোজনার সংবাদ পেয়েছি তা প্রসঙ্গত উল্লেখ করি : ৫০ র দশকে কাঁচরাপাড়া আর্ট থিয়েটার 'নবান্ন' মঞ্চস্থ করেন যখন তারা আই পি টির সদস্য ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের অযান্ত্রিক সম্প্রদায় গোত্রান্তর প্রযোজনা করেন ৬০ এর দশকে। মৌলিক, বর্ধমান এই গোত্রান্তরকেই বেছে নেন। গোত্রান্তরের পর তারা 'চলো সাগরে' হাত দেন, কিন্তু প্রযোজিত হয়েছে কিনা সে তথ্য মেলেনি। শান্তিপুরের শিল্পী মহল ৭৪ 'শারদ সংখ্যার বিজ্ঞপনে জানিয়েছিল : তাদের চলতি নাটক 'নবান্ন'।

গণনাট্য সংঘের কোন কোন শাখা আজও তাঁর নবান্ন করে থাকেন কিন্তু তাঁর উত্তরকালের নাটকে তাঁরা হাত দেন না। তার কারণ বিজনবাবু, অন্য কেউ ন ▭

জগন্নাথ হালদার

শোষিত কৃষকের জীবন-সংগ্রাম নিয়ে সেই মধুসূদন-দীনবন্ধু থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক নাটক রচিত হয়েছে। এই ১০০ বছর ধরে শোষকের রূপ সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে খানিকটা পাল্টেছে, কিন্তু চরিত্র সেই এক। অবশ্য শোষণের কায়দাটাও পাল্টাচ্ছে। 'দেবী-গর্জন' এর প্রভঞ্জন এখন আর জমিদার নয়, কেননা জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটান হয়েছে। প্রভঞ্জন এখন জোতদার ও মধ্যস্বত্বভোগী বেনামদার—নিষ্ঠুরতা, লোভ ও পরস্বাপহরণে যার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ১০০ বছর আগেকার সামাজিক পটভূমিকায় রচিত 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এর ভক্তপ্রসাদকে মনে করিয়ে দেয়। দেখা যাচ্ছে প্রভঞ্জনের প্রবৃত্তি-কামনা-কুটিলতায় উদগ্র উলঙ্গ চরিত্রের সঙ্গে ভক্তপ্রসাদের অনেক মিল...কারণ প্রভঞ্জন ও ভক্ত একই শ্রেণীভুক্ত, ওঁদের চরিত্র ওঁদের শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য যুগের sentiment এবং দাবী অনুযায়ী প্রভঞ্জনকে আজ মরতে হয়, ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে টাকা গুণাগার দিয়ে ভক্ত পার পেতে পারে কিন্তু প্রভঞ্জন পার পায় না। সঙ্ঘবদ্ধ সাঁওতাল চাষীরা প্রভঞ্জন যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি— সেই ব্যবস্থার মূলে ঘা হানতে চায়, রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে অন্যায়ের অবসান চায়। জোয়ার আসছে, প্রভঞ্জন-বাঁধ ভাঙবেই—এই ঐতিহাসিক সত্য 'দেবীগর্জন' নাটকে পরিবেশিত।

'দেবীগর্জন' নাটকের এই নিজস্বতা দর্শকদের সহানুভূতি-শীল ক'রে তোলে— প্রযোজনার ব্যাপারে 'ত্রি-তীর্থ' এই সুযোগটি পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। পরি-চালক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর দর্শকদের চেনেন। সংগ্রাম সত্য, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের নাটকের এই মেসেজ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সংলাপ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও রস-গ্রহণে কারো অসুবিধে হয় না— এটা সংলাপ এবং ব্যবহৃত ভাষায় একটা শক্তি-শালী দিক।

সাধারণ মুহূর্তগুলি অবিস্মরণীয় ক'রে তুলে ছোট-খাট ঘটনাগুলিতে পরিমিত নাটকীয়তা আরোপ ক'রে দর্শকদের emotional response সৃষ্টি ক'রে দর্শক-মানসকে অনুপ্রাণিত করা পরিচালকের অসামান্য কৃতিত্ব। প্রয়োগ যদি অস্বচ্ছ হয়, অস্পষ্ট হয় দর্শকচিত্তে তার আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য— এই সহজ সত্যটি পরি-চালক এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলেন নি।

'দেবীগর্জন' এমনিতেই প্রচণ্ড গতিশীল নাটক, পরিচালক সার্থকভাবে নাটকের এই গতিশীলতা কাজে লাগিয়েছেন। সূচনাতেই চড়া সুরে নেপথ্যে ঢাকের বাজনা দর্শকদের অন্তরঙ্গ ক'রে তোলে নাটকের পরি-বেশের সঙ্গে। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দর্শক-চিত্ত আশা-নিরাশায় ক্রমাগত আন্দোলিত হতে থাকে, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে হয় চূড়ান্ত পরিণতির জন্য।

'ত্রিতীর্থে'র' 'দেবীগর্জন' অসাধারণ অভিনয় সমৃদ্ধ। যদিও তুলনামূলকভাবে পুরুষ চরিত্রগুলির পাশে স্ত্রী-চরিত্রগুলি অনেক ম্লান, কিন্তু গোটা দলটির সামগ্রিক অভিনয় এমন এক পর্যায়ে উন্নীত যেখানে গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রতিটি চরিত্রকে আলাদাভাবে অভিনয়ের গুণগত বিচার-বিশ্লেষণেও কোথাও অস্বাভাবিকতা বা কৃত্রিমতা চোখে পড়ে না। প্রায় প্রতিটি চরিত্রই অভিনয় গুণে সম্পূর্ণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে বলিষ্ঠ। প্রধান চরিত্র-গুলির ব্যক্তিত্বদৃপ্ত অভিনয় দেখে মনে হয় এঁরা রাজ-ধানীর প্রতিষ্ঠিত নটদের পাশে মর্যাদার সঙ্গে এক আসনে বসার যোগ্য। ▭

১ আগুন

প্রথম মঞ্চস্থ : নাট্যভারতী (গ্রেস সিনেমা) | মে, ১৯৪৩।
প্রযোজনা : ভারতীয় গণনাট্য সংঘ।

চরিত্রলিপি :

পুরুষ - সতীশ - নেত্যর মা - জুড়োন - নেত্য-ক্ষিরি - কৃষাণ - হরেকৃষ্ণ - কৃষাণী - মনোরমা - ১ম পুরুষ - উড়িয়া - দোকানী- সিভিক গার্ড - ২য়পুরুষ - ৩য় পুরুষ - ৪র্থ পুরুষ - মুসলমান-যুবক।

নেপথ্যে :

পরিচালনা-বিজন ভট্টাচার্য

আগুন | প্রথম প্রকাশ : ২৩ এপ্রিল ১৯৪৩, অরণি। পরে 'বহুরূপী' পত্রিকার ৩৩ সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৯৬৯-এ। এ পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত হয় নি। একাঙ্কিকা। ৫টি ক্ষুদ্র দৃশ্যে নাটিকাটি বিভক্ত।

এই নাটকের ভূমিকা লিপি সংগ্রহ করা যায় নি। তবে বিজনবাবু (কৃষাণ) এবং সুধী প্রধান (অন্য একটি কৃষক) অভিনয় করেন। তৃপ্তি মিত্রের প্রথম অভিনয় এই আগুনেই।

২ জবানবন্দী

প্রথম মঞ্চস্থ : ষ্টার | ৩ জানুয়ারি, ১৯৪৪। সূত্র : আ. ব. প. ৭ই জানু '৪৪
শ্রীরঙ্গম | তারিখ মেলেনি। ১৯৪৪। সূত্র : ছায়াপথ গ্রন্থ।
প্রযোজনা : ভারতীয় গণনাট্য সংঘ

চরিত্রলিপি :

পরান মণ্ডল-গঙ্গাপদ বসু। বেন্দা-বিজন ভট্টাচার্য। পদা-সুধী প্রধান। রাইচরণ-জলদ চট্টোপাধ্যায়। রমজান-শম্ভু মিত্র*। বেন্দার মা-অমু দাশগুপ্ত। বেন্দার বৌ-তৃপ্তি মিত্র। হাসি-রাণী চক্রবর্তী। মাণিক-মণিকা ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)। ভদ্রলোকদ্বয়, এ-আর·পি কর্মচারীগণ ইত্যাদি।

জবানবন্দী | প্রথম প্রকাশ : ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৩, অরণি। গ্রন্থভুক্ত হয়ে প্রথম প্রকাশ 'তিনটি নাটিকা'য়। প্রকাশকাল ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪৪। প্রকাশক : ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, কলিকাতা। বইয়ের সাইজ ১/৮ ক্রাউন। প্রচ্ছদ : ধূসর বর্ণের কাগজের লাল রঙে মুদ্রিত বইয়ের নাম ও তিনজন নাট্যকারের নাম : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বিজন ভট্টাচার্য ও বিনয় ঘোষ। ভূমিকা : তিন পৃষ্ঠার এবং স্বাক্ষরবিহীন। ভিতরে সঙ্ঘ সম্পাদক চিন্মোহন সেহানবীশের নাম মুদ্রিত। মূল্য : একটাকা।

গ্রন্থাকারে দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৬শে বৈশাখ ১৩৬৯ ছায়াপথ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। প্রকাশক জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা ৯। ভূমিকা : বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের লেখা। এতে রমজান ভূমিকাভিনেতা রূপে শম্ভু মিত্রের নামোল্লেখ আছে। শম্ভু মিত্র প্রতিবাদ করেন 'বহুরূপী'র ৩৪ সংখ্যায় : "না রমজান আমি করিনি। জবানবন্দীতে কোন রোলেই আমি নামি নি। তবে কোন শিল্পী অনুপস্থিত থাকলে তাতে আমায় নামতে হোতো।... গঙ্গাপদ বসু জামসেদপুর যেতে পারেন নি। তখন ওঁর ভূমিকাটি (পরাণ মণ্ডল) আমায় করতে হয়। তবে রমজান কোন দিনই করেছি বলে মনে পড়ে না। ওটা ভুল খবর।... যতদূর মনে পড়ে মনোরঞ্জন বড়াল।"

নেপথ্যে :

পরিচালনা-বিজন ভট্টাচার্য।

* যতদূর মনে পড়ে মনোরঞ্জন বড়াল—শম্ভু মিত্র। সুধী প্রধানও এর অভিনয় করেছেন।

৩ নবান্ন
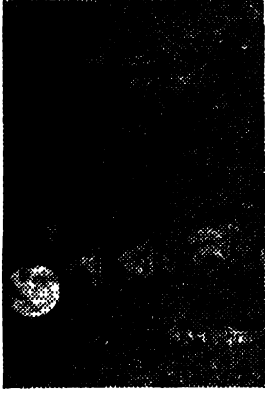
৪র্থ সংস্করণের প্রচ্ছদ

নবান্ন | প্রথম প্রকাশ 'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৫১। প্রকাশক: গিরীণ চক্রবর্তী পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭/৭ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা। উৎসর্গ: আমিনপুরকে। নাটকের সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত। দাম: পাঁচ সিকা। ডবল ক্রাউন, পৃষ্ঠা ৬+১২২। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৪৪, তৃতীয় সংস্করণ: ১৮ নভেম্বর ১৯৪৫। হিন্দী সংস্করণ : ১৯৪৭। ৪র্থ সংস্করণ: বাংলা ১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ মার্চ ১৯৬২। এই সংস্করণের প্রকাশক: এস দত্ত, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা ৯। প্রচ্ছদপট ও বর্ণলিপি: দেবব্রত ঘোষ। দাম ৩·৫০ পঃ (২য় ৩য় এবং হিন্দী সংস্করণ আমরা দেখিনি, এর বিবরণ মিলছে ৪র্থ সংস্করণে)।

প্রথম মঞ্চস্থ: শ্রীরঙ্গম | ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪।
প্রযোজনা: ভারতীয় গণনাট্য সংঘ

চরিত্রলিপি:

প্রধান সমাদ্দার-বিজন ভট্টাচার্য। কুঞ্জ সমাদ্দার-সুধী প্রধান। নিরঞ্জন সমাদ্দার-জলদ চট্টোপাধ্যায়। মাখন-মণিকা ভট্টাচার্য। দয়াল মণ্ডল-শম্ভু মিত্র। হারু দত্ত-গঙ্গাপদ বসু। কালীধন ধাড়া-চারুপ্রকাশ ঘোষ। রাজীব-সজল রায় চৌধুরী। চন্দর-রঞ্জিৎ বসু। যুধিষ্ঠির-নীহার দাশগুপ্ত। ফটোগ্রাফারদ্বয়-অমল ভট্টাচার্য, রবি মজুমদার। প্রথম ভদ্রলোক-মনোরঞ্জন বড়াল। বরকর্তা-চিত্ত হোড়। বৃদ্ধ ভিখিরী-গোপাল হালদার। ডোম-শম্ভু ভট্টাচার্য। দারোগা-বিমলেন্দু ঘোষ। ডাক্তার-সমর রায় চৌধুরী। দিগম্বর অজিত মিত্র বরকত-গঙ্গাপদ বসু। ফকির-সত্যজীবন ভট্টাচার্য। পঞ্চাননী-মণিকুন্তলা সেন। রাধিকা-শোভা সেন। বিনোদিনী-তৃপ্তি ভাদুড়ী। খুকীর মা-কল্যাণী কুমারমঙ্গলম। ভিখিরিনী-বিভা সেন। বাংলার ম্যাডোনা-ললিতা বিশ্বাস। ভদ্রলোক-নির্মলবাবু-টাউট-ভিখিরী-হারু দত্তর শালা-কনস্টেবল-রোগী-ভৃত্য-চন্দরের মেয়ে - কৃষক-নিরন্নের দল-জনতা ইত্যাদি।

নেপথ্যে:

পরিচালনা—শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য।
উপদেষ্টা—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।
আবহ সঙ্গীত পরিচালনা—গৌর ঘোষ।
সহযোগিতা করছেন—সুজিৎ নাথ, অর্ধেন্দু ঘোষ, বিজয় দে, ক্ষীরোদ গাঙ্গুলি, শৈলেন দাস, চণ্ডী ঘোষ, সুশীল বিশ্বাস, বরদা গুপ্ত, সুনীল গুপ্ত, শান্তি মিত্র, ননীগোপাল চৌধুরী, লক্ষ্মণ দাশ।
মঞ্চাধ্যক্ষ—চিত্ত ব্যানার্জী।
সহযোগী—অরুণ দাশগুপ্ত।
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ
(ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের নাট্যবিভাগ)
৪৬, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।
সভাপতি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।
সম্পাদক—চিত্ত ব্যানার্জী।

সূত্র: নবান্ন-র স্মারকপত্র।

৪ অবরোধ
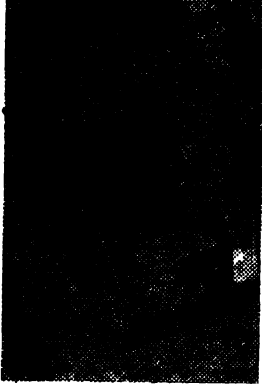
প্রথম মঞ্চস্থ : মঞ্চস্থ হয়নি।
প্রযোজনা :

চরিত্রলিপি :

এই সংখ্যার অন্যত্র মুদ্রিত হয়েছে।

নাটকটি এই সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত হলো মূল সংস্করণ (পৌষ ১৩৫৪) অনুসরণে। এ নাটক সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য নাটকের সঙ্গেই দেওয়া হয়েছে। এখানে শুধু প্রথম মুদ্রণের প্রচ্ছদপটের একটি প্রতিলিপি দেওয়া হলো। প্রসঙ্গক্রমে ওখানে 'অভিনীত' মুদ্রিত হয়েছে, আসলে 'অনভিনীত' হবে।

৫

প্রথম মঞ্চস্থ : মহম্মদ আলি পার্ক, ১৯৪৬।
প্রযোজনা : সর্ব ভারতীয় ছাত্র সম্মেলন, কলিকাতা।

চরিত্রলিপি :

পবন-বিজন ভট্টাচার্য। রাধা-গীতা সেন। শাশুড়ি-প্রভা দেবী। শচীনবাবু-সুধী প্রধান।

নেপথ্যে :

রচনা, পরিচালনা, সঙ্গীত-বিজন ভট্টাচার্য। মঞ্চ, দৃশ্যপট-ঋত্বিক ঘটক।

মরাচাঁদ | একাঙ্ক। প্রথম প্রকাশ ? ১৯৪৬। পরে পূর্ণাঙ্গ মরাচাঁদ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫)র ভূমিকায় : উনিশ শ ছেচল্লিশ থেকে উনিশ শ বাহান্ন সাল—মোটা-মুটি এই ছ-সাত বছরের মাঝখানে মরাচাঁদ নাটকটি রচিত ও মঞ্চে প্রযোজিত হয়।··· সংক্ষিপ্ত ভাবে অন্ধ দোতারা বাদক টগর অধিকারীর জীবনকাহিনীই মরাচাঁদ নাটকের বিষয়বস্তু। প্রাথমিক পর্যায়ে চরিত্র ছিল চারটি।....এই নাটিকাটির অভি-নয় ১৯৪৬-৫২ সাল পর্যন্ত। তখনকার দিনে ই. বি. আর. ইনস্টিটিউটে এই নাটিকাটি কয়েকবার মঞ্চস্থ করি।

৬ জীয়নকন্যা
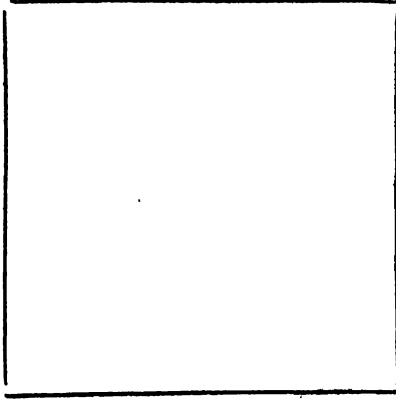
প্রথম মঞ্চস্থ : রঙমহল, ১৯৪৭।
প্রযোজনা : ?
চরিত্রলিপি :
উলুপী-কলাবতী-প্রবীর-নেত্রা-পুরোহিত-গুণাকর-রঘুপতি-রাধানাথ গণপতি-বদর আলি-টগর-পশুপতি-সর্প - সহচরীগণ - সেবাইতগণ-গ্রামবাসীগণ, বেদেনীদের দল।

এই গীতিনাট্যটি বিজন বাবুর এক অসাধারণ সৃষ্টি বলে অনেকেই নানান জায়গায় উল্লেখ করেন। রচনাকাল ১৯৪৫-৪৭। প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়েছে বিজনবাবু বলতে পারেন নি। অভিনয়ে ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, শোভেন মজুমদার, মহঃ ইজরাইল, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

সূত্র : বিজন ভট্টাচার্য।

৭ কলঙ্ক

প্রথম মঞ্চস্থ : ই. বি. আর ম্যানশন ইনস্‌টিটিউট ১৯৫১।
প্রযোজনা : ক্যালকাটা থিয়েটার।
চরিত্রলিপি :
পূর্ণ তথ্য মেলেনি।
গিরি-প্রভা দেবী। এ ছাড়াও গীতা সোম (সেন) উৎপল দত্ত শোভা সেন ঋত্বিক ঘটক ও বিজন ভট্টাচার্য অভিনয় করেন।

কলঙ্ক | একাঙ্ক | প্রথম প্রকাশ? এই নাটকটি পরবর্তীকালে 'দেবীগর্জনে'র জন্ম দেয়।

৮ জননেতা

প্রথম মঞ্চস্থ : মঞ্চস্থ হয়নি।
প্রযোজনা :
চরিত্রলিপি :
এ সংখ্যার অন্যত্র মুদ্রিত হয়েছে।

এ সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ শারদীয় পরিচয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৫১)। পরিচয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০-৯৫। এ নাটিকা-টির কোন অভিনয়ের খবর নেই।

সূত্র : বিজন ভট্টাচার্য।

৯ জতুগৃহ

প্রথম মঞ্চস্থ : মঞ্চস্থ হয়নি।
প্রযোজনা :

চরিত্রলিপি :

এ প্রসঙ্গে তথ্য মেলেনি।

পূর্ণাঙ্গ নাটক। পরিচয় পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থভুক্ত হয়নি। ক্যালকাটা থিয়েটারের বাইরে অন্য কোন দল এ নাটকের অভিনয় করেছে, এমন কোন খবর নেই।

সূত্র : বিজন ভট্টাচার্য

১০ গোত্রান্তর

প্রথম মঞ্চস্থ : নিউ এম্পায়ার। ১৬. ৮. ৫৯ রবিবার সকাল।
প্রযোজনা : ক্যালকাটা থিয়েটার।

চরিত্রলিপি :

হরেন্দ্র-বিজন ভট্টাচার্য। কেশব-অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। কানাই-বারীন বসু। রঘুবীর-জ্যোৎস্না মৈত্র। চিকনরাম-দিব্যেন্দু ঘটক, জিতেন বসু। সতীশ-বিমান ভট্টাচার্য। জগো-অসিত দাস, বিধু মুখোপাধ্যায়। অভয়পদ-হীরেন চক্রবর্তী। রাখাল-অমলেন্দু পত্রনবীশ, শক্তি সেন। ফটিক-ফল্গু ঘটক। পাল-মুরারী সেন। বিষ্ণুপদ-নবারুণ ভট্টাচার্য। মিঃ লাহিড়ী-জগদীশ চক্রবর্তী। ভদ্র যুবক-অনিল দাস। ছোটবাবু-সলিল ভট্টাচার্য। হরিধন-অরুণ দাশগুপ্ত, অমল ভট্টাচার্য। বাড়ীওয়ালা-অবনী রায়,অতনু দেব। দারোয়ান-বিভূতি মুখোপাধ্যায়। বংশী-রেন্টু চট্টোপাধ্যায়। পুলিশ ইন্সপেক্টর-রণধীর দাশগুপ্ত, ঝুনু ব্যানার্জী। কাবুলীওয়ালা-সাধন চট্টোপাধ্যায়, শৈলশেখর চট্টোপাধ্যায়। শঙ্করী-পরিমল রায়চৌধুরী, রেনু ঘোষ। গৌরী-মানসী দাশগুপ্তা। শৈলী-সীতা মুখার্জী। ভামিনী-মণিকা চক্রবর্তী। মজুরগণ, বস্তিবাসী, প্রতিবেশী, গুণ্ডা, কনস্টেবল, পিয়ন, এয়োস্ত্রীগণ প্রভৃতি।

সূত্র : সিনে অ্যাডভান্স ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
গোত্রান্তর-গ্রন্থ

গোত্রান্তর। প্রথম প্রকাশ শারদীয়া বসুমতী ১৯৫৭? গ্রন্থাকারে ফাল্গুন ১৩৬৬। প্রকাশক জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলি-৯। উৎসর্গ : নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। গ্রন্থের অন্তর্গত ভূমিকার নাট্যকার লিখছেন : ... তারপর গোত্রান্তর লিখি ১৩৫৪ সালে। দেশ বিভাগ ও তজ্জনিত অভিসম্পাত তখন গোটা দেশের মাথার উপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে।

নাটকাকারে প্রকাশিত হবার পর মঞ্চস্থ করবার ইচ্ছা থাকলেও নবনাট্যের রাজা রাণীর জলসার অনূঢ়া কন্যা গৌরীর হাত ধরে বহু বৎসর প্রতীক্ষা করি। তারপর গোত্রান্তর মঞ্চস্থ করি মাত্র সেদিন— অতি আয়াসে।

১১ মরাচাঁদ

মরাচাঁদ | পূর্ণাঙ্গ নাটকরূপে প্রথম প্রকাশ 'চলচ্চিত্র' পত্রিকায়, ১৯৬১। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫। প্রকাশক : তরুণ সেনগুপ্ত, মণীষা গ্রন্থালয় প্রা· লিমিটেড, ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট· কলিকাতা ১২। মুদ্রক : নিউ এজ প্রিন্টার্স, ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯। দাম : তিন টাকা। উৎসর্গ : টগর অধিকারীকে। গ্রন্থের আকার ডবল ডিমাই ১/১৬। হাফটাইটেল টাইটেল, ভূমিকা ১৪ পৃঃ, বাকি নাটক ৭-৬০ পৃষ্ঠা। ভূমিকায় লিখছেন : নাটকটি দ্বিতীয় পর্যায়ে অনেকটা পরিমার্জিত ও বর্দ্ধিত আকারে ক্যালকাটা থিয়েটার বিভিন্ন মঞ্চ ও সম্মেলন মণ্ডপে বহুবার মঞ্চস্থ করে দর্শকবৃন্দের ধন্যবাদার্হ হয়।

নেপথ্যে :

রচনা ও পরিচালনা-বিজন ভট্টাচার্য। আলোকসম্পাত-তাপস সেন। শিল্প নির্দেশনা-খালেদ চৌধুরী। কারুশিল্প-কৃষ্ণা রায়। যন্ত্রসঙ্গীত-সৌম্যেন ঘোষাল। মঞ্চাধ্যক্ষ-জগদীশ চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনা-শৈলেন ঘোষ, গোকুল দে প্রভৃতি।

প্রথম মঞ্চস্থ : নিউ এম্পায়ার | ৩১ মার্চ, ১৯৬১।
প্রযোজনা : ক্যালকাটা থিয়েটার।

চরিত্রলিপি :

শচীন বাবু-বিভূতি মুখোপাধ্যায়। হরিদাস-অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। মহীন্দর-দুলাল মিত্র। নিরঞ্জন-বিধু মুখোপাধ্যায়। ভোলা-জ্যোতি মৈত্র। উকিল-অনিলকুমার দাস। রাঘব-বারীন বসু। কুণ্ডু-মধু ঘোষাল। ত্রিলোচন-রণেন চৌধুরী। সনাতন-দিব্যেন্দু ঘটক। যুগল-উমাশঙ্কর চক্রবর্তী। শ্যামাদাস-বিমান ভট্টাচার্য। রাখহরি-কল্যাণ বসু। গোকুল-দুলাল মান্না। ব্রজবিলাস-শান্তনু ঘোষ। দুলাল-বিপ্লব দত্ত। উদ্ধব-রেন্টু চ্যাটার্জী। রাধা-রুবী মিত্র। মাসী-মণিকা দত্ত। নয়নতারা-গীতা সেন। সৌদামিনী-ইন্দুলেখা দেবী। •এবং পবন ও কেতকদাসের দ্বৈত ভূমিকায়-বিজন ভট্টাচার্য।

নেপথ্যে :

রচনা, সঙ্গীত ও নির্দেশনা-বিজন ভট্টাচার্য। আলোক নিয়ন্ত্রণ-তাপস সেন। মঞ্চ পরিকল্পনা-ক্যালকাটা থিয়েটার। রূপসজ্জা-সরোজ মুন্সী।

সূত্র : মরাচাঁদ গ্রন্থ।

১২ ছায়াপথ

প্রথম মঞ্চস্থ : মিনার্ভা থিয়েটার। ১১ অক্টোবর ১৯৬১।
প্রযোজনা : ক্যালকাটা থিয়েটার।

চরিত্রলিপি :

কানা-বিভূতি মুখোপাধ্যায়। খোঁড়া-বিধু মুখোপাধ্যায়। চাষা-দুলাল মান্না। মাতাল-বিজন ভট্টাচার্য। গোপাল-অশোক ভট্টাচার্য। ভদ্রলোক ১-কেদার মল্লিক। ভদ্রলোক ২-মধু ঘোষাল। ভদ্রলোক ৩-কল্যাণ বসু। পাগল-অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে বারীন বোস)। মিঃ স্পীড-লোচন দে। ভেণ্ডার-জ্যোতি মৈত্র। কাগজ কুড়ানো ছেলে-দিব্যেন্দু ঘটক। স্ট্রেচার বাহকদ্বয়, পথচারী, ও ব্রাত্য মিছিল। প্রিয়া-বানী দাশগুপ্তা। চাষী বৌ-আল্পনা গুপ্তা।

ছায়াপথ। প্রথম প্রকাশ : গ্রন্থাকারে ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৯। প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ১২। প্রচ্ছদ : জোছন দস্তিদার। উৎসর্গ : অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু। দাম : ২.৫০ টাকা। ১/৮ ডবল ক্রাউন আকার। ছায়াপথ গ্রন্থেই জবানবন্দী অন্তর্ভুক্ত। পরিচারিকা : আশুতোষ ভট্টাচার্য। জবানবন্দীর ভূমিকা : বিভূতি মুখোপাধ্যায়।

নেপথ্যে :

মঞ্চ পরিকল্পনা ও পরিচালনা-বিজন ভট্টাচার্য। আবহসঙ্গীত-ধীরেন দাস।

সূত্র : ছায়াপথ গ্রন্থ।

১৩ মাষ্টার মশাই

প্রথম মঞ্চস্থ : পার্ক সার্কাস। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসব ১৯৬১।
প্রযোজনা : ক্যালকাটা থিয়েটার।

চরিত্রলিপি :

বিস্তৃত তথ্য মেলেনি।

এ নাটকের একবারই অভিনয় হয়েছে। নাটকটি পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই রয়েছে। বিশ্বভারতীর অনুমতির ঝামেলার জন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

সূত্র : বিজন ভট্টাচার্য।

১৪ দেবীগর্জন

দেবীগর্জন। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৭৬। (ইং ১৯৬৯)। প্রকাশক: রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলিকাতা ১২। প্রচ্ছদ: শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। মুদ্রাকর: মনোরঞ্জন নায়ক, শংকর প্রেস, ৩।১।১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা ৬। দাম তিন টাকা মাত্র। উৎসর্গ: কৃষক আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে। গ্রন্থের আকার ১/১৬ ডবল ক্রাউন। পৃষ্ঠা ১৬+৯৬, মোট ১১২। লেখকের ভূমিকা ২ পৃষ্ঠা, কাহিনী ২ পৃষ্ঠা, প্রযোজনা ৫ পৃষ্ঠা। গ্রন্থোল্লিখিত ২য় অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্যে প্রযোজনাকালে ৪র্থকে ৫ম দৃশ্য করা হয়েছে। (সূত্র স্মারকপত্র) এখানে যে ৪র্থ দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে তাতে স্থান: ধানতলা; চরিত্রের প্রবেশক্রম: গুণাই, দশরথ, দিগম্বর সর্দারিয়া ও বহুরূপী। ৫ম দৃশ্য: স্থান সর্দারের গৃহ; চরিত্রের প্রবেশক্রম: সর্দার, সর্দারিয়া, খগেশ্বর, লক্ষণ, ভাল্লু, ধনাই, ত্রিভুবন, লাঠিয়ালবৃন্দ।

প্রথম মঞ্চায়ন: ওয়েলিংটন স্কোয়ার। জাতীয় সংহতি সম্মেলন। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

প্রযোজনা: ক্যালকাটা থিয়েটার।

চরিত্রলিপি:

প্রভঞ্জন-বিজন ভট্টাচার্য। ত্রিভুবন-বিভূতি মুখোপাধ্যায়। সর্দার-সজল রায়চৌধুরী। মংলা-বিধান মুখোপাধ্যায়। সর্দারিয়া-শ্যামল ঘোষ। খগেশ্বর-অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। লক্ষণ-তপন লাহিড়ী। ভাল্লু-রথীন দাশগুপ্ত। গুণাই-সমীর ভট্টাচার্য। ধনাই-গুরুদাস ভট্টাচার্য। দশরথ-সুনীত চৌধুরী। দিগম্বর-মনীন্দ্র সেনগুপ্ত। মনা-অভিনিবেশ চৌধুরী। সরকার-তরুণ লাহিড়ী। লেঠুয়া-কেষ্ট বসু। পুরোহিত-প্রদীপ সেন। ঘুগর্যা-অপরাজিত চট্টোপাধ্যায়। কামিন-শ্যাম চট্টোপাধ্যায়, রণজিত ঘোষ। লাঠিয়াল-বিধু মুখোপাধ্যায়, অশোক চন্দ, অচল হালদার। তরজা গায়ক-তুষার ভঞ্জ। চাষীগণ-অখিল সরকার, শিশির মজুমদার, দীপক চ্যাটার্জী, সমীর দাশগুপ্ত, দেবনাথ চক্রবর্তী। গিরি-রেবা রায়চৌধুরী। রত্না-কবিতা রায়। সখী-মানসী সেন। চাষী মেয়ে ও কামিন-বুলবুল গুহ, অঞ্জু গুহ, দেবযানী ঘোষ, ঝঞ্ঝা ঘোষাল ও সুচিত্রিতা রায়চৌধুরী।

সূত্র. দেবীগর্জন। ১৩৭৬।

সনাতন-চন্দন লাহিড়ী। আমলা-কেষ্ট বসু।

সূত্র: এই চরিত্র দুটির উল্লেখ মেলে নিউ এম্পায়ার ৬ মার্চ, ১৯৬৬র অভিনয় উপলক্ষে ক্যালকাটা থিয়েটারের স্মারকপত্রে।

নেপথ্যে:

পরিচালনা-বিজন ভট্টাচার্য। মঞ্চ পরিকল্পনা-খালেদ চৌধুরী। আবহসঙ্গীত-কেষ্ট বসু। আলোক সম্পাত-প্রদীপ চক্রবর্তী। রূপসজ্জা-শক্তি সেন। সঙ্গীত ও সুর-বিজন ভট্টাচার্য।

সূত্র: দেবীগর্জন, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৭৬।

১৫ ধর্মগোলা

প্রথম মঞ্চস্থ : [illegible] ১৯৬৭

প্রযোজনা : লোকরঞ্জন শাখা

চরিত্রলিপি :

এ প্রসঙ্গে আর কোন তথ্য মেলেনি

এ নাটকটি প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় মন্ত্রী সোমনাথ লাহিড়ীর অনুরোধক্রমে লিখিত হয়।

সূত্র : বিজন ভট্টাচার্য।

১৬

কৃষ্ণপক্ষ | প্রথম প্রকাশ : শারদীয় থিয়েটার, ১৩৭৩ (ইং অক্টো. ১৯৬৬)। ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজের পত্রিকার ১৩৪ পৃঃ-১৬৮ পৃঃ। নাটকের শুরুতেই সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি : একটি অনন্য-সাধারণ মৌলিক নাটক। শুরুতেই পরিচায়ক বিজ্ঞপ্তি : এ নাটক ঐক-তান জীবনের গান। পাঁচটি দৃশ্যে বিন্যস্ত পূর্ণাঙ্গ নাটক। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।

প্রথম মঞ্চস্থ : রবীন্দ্রসদন | ১২ জানু. ১৯৭৫।

প্রযোজনা : কবচকুণ্ডল।

চরিত্রলিপি :

কাশীনাথ-বিভূতি মুখোপাধ্যায়। চুনিলালজী-অমরেশ দাস। রাজেনবাবু - দেবীবাবু - দেবতোষ-বন্দন রায়। দত্ত গুপ্ত - অঘোরী বাবা - বালগোপাল - মৌনীবাবা - জন-প্রিয়ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শশধর শীল - মাণ্ডু - মদনবাবু - নক্ষত্রজ্যোতি - সৌমিত্র - অনাদি - আত্মারাম/দয়ারাম-বিজন ভট্টাচার্য - সখীচরণ - ডলি বাবলি - ব্রাত্যগণ - গ্রামবাসী যজমানগণ - ভিখারী ছেলেরা - শ্রমিক - আশ্রমিক নাগরাজ ভুলো।

নেপথ্যে :

রচনা পরিচালনা-বিজন ভট্টাচার্য। আলোকসম্পাত-তাপস সেন। সঙ্গীত-দীপক চৌধুরী।

এ নাটকের অভিনয়-লিপি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য মেলেনি।

সূত্র : বিজন ভট্টাচার্য

১৭ সাপ্তিক

প্রথম মঞ্চায়ন : হয়নি
প্রযোজনা :
চরিত্রলিপি :

নাটক সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য মেলেনি।

এই একাঙ্কিকাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিজনবাবুর প্রদত্ত তথ্য : সপ্তাহে বেরিয়েছিল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জেনেছি সপ্তাহে এটা বের হয়নি।

১৮

গর্ভবতী জননী | প্রথম প্রকাশ : বাংলা নাটক : নাট্যকার সিরিজে গ্রন্থভুক্ত। শ্রাবণ ১৩৭৮। সূত্রধার সম্পাদিত। প্রকাশক : অপেরা ২৭/৬ সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা ৯। ডবল ডিমাই আকারে ৪০ পৃষ্ঠা। সংকলনের সম্পাদকের ভূমিকায় লেখা হয়েছে : আমরা কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত। মায়ের দেহে যখন মৃত্যুর কঠিন শীতলতা তখনও আমাদের চেতনা ফিরে আসেনা।

প্রথম মঞ্চায়ন : মুক্ত অঙ্গন | মে, ১৯৬৯।
প্রযোজনা : ক্যালকাটা থিয়েটার।
চরিত্রলিপি :

মামা-বিজন ভট্টাচার্য। কথ-তরুণ লাহিড়ী। সুধন্য-?। সুবল-তপন লাহিড়ী। দুখে-?। রতন-বিভূতি মুখোপাধ্যায়। মথরো-শোভেন মজুমদার। ওঝা-শ্যামল ঘোষ। সন্তোষ-অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। পাইকার-তপন চট্টোপাধ্যায়। ওঝার সাগরেদ-রামকৃষ্ণ সিন্‌হা রায়। কালী-বিজয়া চক্রবর্তী। মা-আল্পনা গুপ্তা। ধাইমা-নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়। বনবিবি-উমা বসু। বিনী-ছন্দা চ্যাটার্জী চাচারাজা-বিভূতি মুখোপাধ্যায়। ভীম-? বিবেক-?। অসিত দে-?

নেপথ্যে :

পরিচালনা, সঙ্গীত-বিজন ভট্টাচার্য।

সূত্র : বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত বিবরণ ও 'যুগান্তর'র ১৯ মে, '৬৯-র রিভিউ।

আমাদের সেই বিভ্রান্তি, নায়কদলের সুযোগ নেয়ার জন্যে—বিজনবাবু এই কথাটি বলতে চেয়েছেন 'গর্ভবতী জননী'তে। উপস্থাপনা এবং প্রকাশে প্রাচীন ও প্রচলিত সংজ্ঞাকে ভেঙেছে। সংলাপে, গানে সবাক ও নির্বাক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যা সৃষ্টি, বলা বাহুল্য সমকালের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

১৯

প্রথম মঞ্চস্থ : মঞ্চস্থ হয়নি।
প্রযোজনা :
চরিত্রলিপি :

এ সম্পর্কেও কোন তথ্য মেলেনি।

এই রূপকধর্মী একাঙ্কিকাটি শারদীয় কালান্তরের ১৯৭০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

সূত্র : বিজন ভট্টাচার্য

২০ সোনার বাংলা
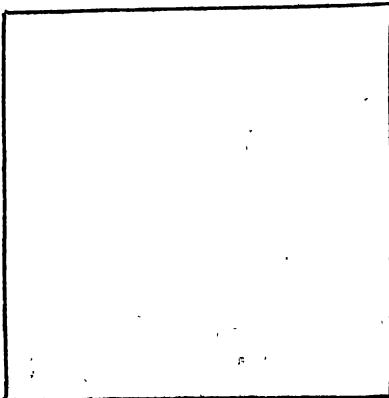
প্রথম মঞ্চস্থ : ইডেন গার্ডেন। বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদ ১৯৭১।
প্রযোজনা : কবচকুণ্ডল।
চরিত্রলিপি :

কোন তথ্য মেলেনি।

'বাংলাদেশ' সৃষ্টির সময় বাংলা দেশ মৈত্রী পরিষদের উদ্যোগে লিখিত ও পরিবেশিত। এর একটি চরিত্র গাজীর ভূমিকায় বিজনবাবুর অভিনয়ের আলোকচিত্র এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

২১ আজ বসন্ত

প্রথম মঞ্চস্থ : অ্যাকাদেমী অব ফাইন আর্টস | তারিখ মেলেনি।
প্রযোজনা : ক্যালকাটা থিয়েটার।

চরিত্রলিপি :

কেদার-বিজন ভট্টাচার্য। উমেশ-বিভূতি মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সুবিনয়-সিন্‌হা রায়। তপেন চট্টোপাধ্যায়। মীরা-মমতা চট্টোপাধ্যায় পরে মঞ্জুশ্রী বসু, মীনাক্ষী গোস্বামী।

নেপথ্যে :

পরিচালনা-বিজন ভট্টাচার্য। আলো-তাপস সেন।

সূত্র : ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায় 'আজ বসন্ত'র প্রথম অভিনয়ের এই তথ্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয় মঞ্চস্থ : রবীন্দ্রসদন | নাট্যোৎসব অভিনীত, ২২ মার্চ '৭৫
প্রযোজনা : কবচকুণ্ডল।

চরিত্রলিপি :

কেদার-বিজন ভট্টাচার্য। উমেশ-বিভূতি মুখোপাধ্যায়। মীরা-মঞ্জুশ্রী বসু। সুবিনয়-রামকৃষ্ণ সিন্‌হা রায়।

নেপথ্যে :

নির্দেশনা-বিজন ভট্টাচার্য। সঙ্গীত-দীপক চৌধুরী। আলো-তাপস সেন। ব্যবস্থাপনা-বিদ্যুৎ হালদার।

সূত্র : রবীন্দ্রসদন আয়োজিত নাট্যোৎসবের স্মারকলিপি থেকে।

আজ বসন্ত | প্রথম প্রকাশ : গল্পভারতী শারদীয় ১৯৭০ (?)। পুনর্লিখিত রূপটি মুদ্রণের জন্য আমাদের কাছে আছে। পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। গ্রন্থাকারে বেরোয়নি। স্মারকপত্রে মুদ্রিত নাট্যকাহিনীর আভাস : ভালবাসা নিয়ে গল্পের কোন শেষ নেই।

২২ চলো সাগরে

প্রথম মঞ্চস্থ : তপন থিয়েটার | ৩০শে মার্চ, ১৯৭৭।
প্রযোজনা : কবচকুণ্ডল।

চরিত্রলিপি :

প্রথম তরঙ্গ :

সুরেন ডাক্তার-বিজন ভট্টাচার্য। নামু-অমরেশ মজুমদার। জসিমুদ্দীন-অসিত মুখার্জী। জমিরুদ্দিন-অজয় আচার্য। আলতাফ-দেবু মিত্র। ইয়াকুব-করবেন্দু ব্যানার্জী। মন্মথ-প্রবীর চক্রবর্তী। অভয়বাবু-শচীন চ্যাটার্জী। পিয়ারীলাল-অমরেশ দাস। রোগী-শেখর সাহা। শঙ্করী-মলিনা ব্যানার্জী। কৃষ্ণা-বৈশাখী ব্যানার্জী পিয়ারীলালের স্ত্রী-মলিনা দেবী।

দ্বিতীয় তরঙ্গ :

কমরেড বিভূতি-অশোক চক্রবর্তী। পার্টি সেক্রেটারী-তপন ঘোষ। প্রতুল-হারাধন মজুমদার। অনল-কল্লোল নাথ। অসীম-তপন বিশ্বাস। এস. এফ. সভ্য-শেখর সাহা। কল্যাণী-গীতা ভট্টাচার্য।

চলো সাগরে | প্রথম প্রকাশ পরিচয় পত্রিকায়। '৭১-'৭২-এ। পরে গ্রন্থাকারে। এই গ্রন্থের প্রকাশক

মনীষা। কঙ্ক এর কোন কপি আমরা মনীষা, পরিচয় পত্রিকা, বিজন ভট্টাচার্য, বা ন্যাশনাল লাইব্রেরী— কোথাও পাই নি।
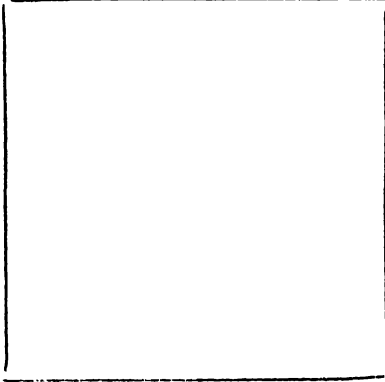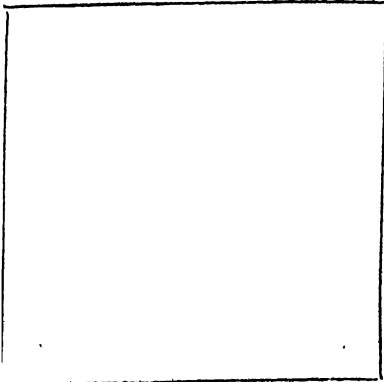
তৃতীয় তরঙ্গ : কমরেড প্রভাত-তপন ঘোষ। মাইকেল বিলুহন-তীর্থপতি ঘোষ। নরসিংহ রাজবংশী-হারাধন মজুমদার। সোমরা সাঁওতাল-বিজয় দে। মিলিটারী অফিসার-প্রিয়ব্রত ব্যানার্জী। বিপ্লবী ১-পল্লব দাস। বিপ্লবী ২-অজয় আচার্য। বিপ্লবী ৩-তপন বিশ্বাস। কালিন্দী-মিনতি দে। কালিয়া-ইরা ভঞ্জ।

চতুর্থ তরঙ্গ : নাগিনা-অসিত মুখার্জী। চাচা-প্রীতেশ লাহিড়ী। সতীশ-হারাধন মজুমদার। ইমরত-অশোক চক্রবর্তী। যজ্ঞেশ্বর-স্বপন রায়।পণ্ডিত-প্রিয়ব্রত ব্যানার্জী। পণ্ডিতের সহচর-দেবু মিত্র, কল্লোল নাথ। চা ওয়ালা-শেখর সাহা। কাওয়াল-পল্লব দাস মাদারি-বিশ্বনাথ ব্যানার্জী। ছোকরা-অভিজিৎ ঘোষ। জন বুল-করবেন্দু ব্যানার্জী এবং পতিতাগণ।

নেপথ্যে : আলো-স্বরূপ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চ-দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। রূপসজ্জা-শক্তি সেন। সঙ্গীত-ভিক্টর জারা : লা পার্তিদা।

সূত্র : প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ।

২৩ চ

প্রথম মঞ্চস্থ : মঞ্চস্থ হয়নি।

প্রযোজনা :

চরিত্রলিপি :

শারদীয় সপ্তাহ '৭৪-এ এই একাঙ্কটি প্রকাশিত হয়।

২৪ হাঁসখালির হাঁস

প্রথম মঞ্চস্থ : মঞ্চস্থ হয়নি।

প্রযোজনা :

চরিত্রলিপি :

নেপথ্যে ঘোষক - ধৃতরাষ্ট্র - পাণ্ডু - পরমেশ্বর - যজ্ঞেশ্বর - জনার্দন - মামা - ভাগ্নে - গৎকার - চাষাবাপ - চাষী বৌ - অনন্ত - অভিমন্যু - শান্তনু - বলরাম - ভীষ্ম - কানা - খোঁড়া - নুলো - কয়লা কুড়ানো ছেলে এক - ছেলে দুই - ছেলে তিন - ভিকিরি মেয়ে।

সপ্তাহের পরপর তিন সংখ্যায় প্রকাশিত একাঙ্কটি গন্ধর্বের এ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বিজনবাবুর ভাষায় 'ভেরী ভেরী এক্সপেরিমেন্টাল' এই একাঙ্কটি বর্তমানে কচবকুণ্ডলের সম্ভাব্য প্রযোজনা তালিকাভুক্ত। অতি সত্বর এর মহলা শুরু হবে।

সংকলন : নৃপেন্দ্র সাহা

বাংলা থিয়েটারে সুস্থতার প্রত্যাশায় । প্রকাশকের কথা

মূলত সত্যদার অর্থাৎ সত্যপ্রসন্ন দত্তের, সঞ্জয় ভট্টাচার্যর আজন্ম বন্ধুর প্রেস, একদা বহু কবি সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে যে প্রেস থেকে, সেই ঐতিহাসিক পূর্বাশা প্রেস, এ কালে যার নাম প্রাচী প্রেস, সেই প্রেস আমাদের ডুবিয়ে দিল। প্রথমতঃ সময়ের দিক থেকে, দ্বিতীয়তঃ ভুল ছাপার নতুন নতুন নজির তৈরী করে। নাহলে মহালয়ার পূর্বেই যথাকালে গন্ধর্ব আশ্বিন '৮৪ সংখ্যা তার পাঠকদের দরবারে গিয়ে পৌঁছাতো।

এরপর গন্ধর্ব-র এই নব পর্যায়ের আত্মপ্রকাশের সমর্থনে যে কথা আমরা বলতে চাই তা হলো বর্তমানে বাংলা থিয়েটারের লুপ্তপ্রায় সুস্থতাকে আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই। আমরা চাই নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার করে থিয়েটার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সুস্থ গণসংস্কৃতির প্রবর্তনায় গণনাট্য সংঘ-সহ কলকাতার ও গ্রামবাংলা তথা বহির্বাংলার যে সমস্ত গ্রুপ থিয়েটার যথার্থ পিপলস্ থিয়েটারের জন্য আগ্রহী, তাদের সঙ্গে সর্বস্তরের পাঠক সাধারণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে। আমরা চাই গ্রুপ থিয়েটারের পেশাদারী হয়ে ওঠার ধ্বংসপ্রায় প্রবণতাকে রুখে দিতে। নাহলে পেশাদারী থিয়েটারের বাণিজ্যিক প্রবণতার দুষ্ট ব্রণগুলি কলকাতার বাকি গ্রুপ থিয়েটার-গুলিকেও মারীগুটিকার ন্যায় আক্রমণ করলে তাদের আর এইসব মধ্যবিত্তসুলভ দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠে যথার্থ জনগণের নাট্যে মেতে ওঠার কোন সুযোগই জুটবে না।'

এইসব একান্ত জরুরী উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা থিয়েটারের লুপ্তপ্রায় সুস্থতাকে ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশায় গন্ধর্ব-র মতন নাট্যপত্রিকার পুনর্জীবন লাভ যে একান্ত জরুরী, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। এটা বিগত একদশক ধরেই আমরা আমাদের বহু শুভানুধ্যায়ীর মতই অনুভব করছিলাম কিন্তু কার্যত তার রূপায়ণ সম্ভব হচ্ছিল না যথেষ্ট উদ্যমের অভাবে। এই উদ্যম আমরা নতুন করে ফিরে পেলাম আমাদের সংগঠনের ২০ বর্ষ পূর্তি উৎসবের মেলামেশার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়তঃ বাংলার থিয়েটার আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে আমরা, গন্ধর্বরা, মনে করি যে, একক একটি সংস্থার অস্তিত্ব রক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের সমূহ দায়িত্ব কখনই পালন করতে পারি না যদি না আমরা সার্বিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে

সবাইকে নিয়ে এগোতে পারি। তৃতীয়তঃ এই সবাইকে নিয়ে একত্র হতে চেয়ে সংগঠনগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিচারের ক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়ে দেখি দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিতে আমরা বিভিন্ন রকম শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছি।

কিন্তু মূল উদ্দেশ্য যেটা থিয়েটার করা এবং থিয়েটারের জন্য থিয়েটার নয়, জনগণের জন্য থিয়েটার করা— থিয়েটারের ভাষায় জনগণের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার লড়াইকে প্রতিষ্ঠিত করা, তার জীবন সংগ্রামের সাথী হওয়া— এই মূল উদ্দেশ্য থেকে কিন্তু আমরা কলকাতার বহু গ্রুপ থিয়েটারই বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। থিয়েটার করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠার যে বেদী আমরা ভাঙ্গতে গিয়েছি, পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে সেই বেদীই আজ আমাদের অনেককে গ্রাস করেছে। আমরা আমাদের অপেশাদার চরিত্র যেটা গণনাট্যের উত্তরসূরী হিসেবে নবনাট্যের কাল পর্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছিলাম, সেটা খোয়া গেছে পেশাদারী থিয়েটারকে কবজা করতে গিয়ে। পরিবর্তে মুনাফা শিকারী পেশাদারী কলকবজার মধ্যেই গ্রুপ থিয়েটারের বহু শিল্পী আজ আমরা ফ্রিজ হয়ে গিয়েছি। নবনাট্যের কালেও ট্র্যাডিশানকে বাদ দিয়ে জীবনের সঙ্গে যোগহীন উৎকট পরীক্ষামূলক নাটক করার মোহ আমাদের ছিল না। কিন্তু নাটকের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্কে নবনাট্যের যে অংশের সামান্যতম অনীহা ছিল, সেই অনীহার সূত্র ধরেই আরো সূক্ষ্ম রাজনীতির আবর্তে সেই সব নবনাট্যের সেনানীরা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম এতো আজ সংগ্রামী অভিজ্ঞতার শিক্ষা। বুদ্ধিবাদী তথা জীবনবাদী নাটক সৃষ্টি করাকেই আমরা যারা অনিষ্ট মেনেছিলাম তারা সব বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম কিমিতিবাদী থিয়েটারের নৈরাশ্যে। হতাশার আর্তধ্বনিতে বাংলার থিয়েটার আন্দোলন যখন জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে ধিক্কৃত হতে চলেছে তখনই শাসকশ্রেণীর শিরোপা জুটেছে তার কপালে। গন্ধর্ব পত্রিকা, আমরা আমাদের এই বিভ্রান্তির কালেই, বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

তারপর এই একদশকের মধ্যে উপর্যুপুরি দু-দুটি যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয় আক্রমণে শাসকশ্রেণী যখন ছিন্নভিন্ন, ছত্রখান, জনগণের মধ্যে শোষকশ্রেণীর শাসনমুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র বর্ধমান— আর শাসক শ্রেণীও রঙ পাল্টে পাল্টে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে চলেছে জনগণের সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করে ফেলার উদ্দেশ্যে, ঠিক ততদিনে বাংলার এই থিয়েটার আন্দোলনও আক্রমণে প্রতি-আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে নিজেই নিজের চেহারাটিকে স্পষ্টতই সাদা কালোর দুটি ভিন্ন রেখায় এগিয়ে নিয়ে এসেছে।

থিয়েটারের এই সাদা কালোর প্রাচীর, শহরের বুকে বসে আমরা যারা থিয়েটার করি, গাল ফুলিয়ে আমরা আজ যাকে অন্য থিয়েটার বলি, সেই সেই থিয়েটারের মধ্যে কিন্তু এইসব সাদা আর কালোর ব্যাপারটা খুব স্বচ্ছ নয়। বিশেষত কালো অর্থাৎ ব্ল্যাক পলিটিক্যাল থিয়েটার যারা করি তারা কিন্তু সবাই ঐ মহান গণনাট্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলে নিজেদেরকে চিহ্নিত করি না। কারণ বামপন্থী থিয়েটারের আবার নানান মত, নানান পথ। কারণ এখানে বড়বাবু, মেজবাবু এবং সেজবাবুদের মতাদর্শ গত লড়াইটা যে এখনো থামেনি। তবে মফঃস্বল বাংলায় যে অসংখ্য দল বামপন্থী থিয়েটার আন্দোলনে সামিল হয়েছে তাদের মধ্যে মতাদর্শ-গত ফারাকটা অনেক কম। সেখানে আজও বাম থিয়েটারের পথিকৃত সেই ভারতীয় গণনাট্য

সংঘের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার ছন্দটা স্পষ্টগোচর। জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ কোন থিয়েটারের থাকে তো সে এই মফঃস্বল বাংলার বাম থিয়েটার আন্দোলনেরই আছে। বিগত দশ বৎসরে বাংলার থিয়েটার কতখানি গণঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে তার হিসেব নিকেশ করতে গেলে আমাদের এই মফঃস্বলী থিয়েটারের খোঁজ নিতেই হবে। না, শুধু বক্তব্যর ক্ষেত্রেই নয়, থিয়েটারের শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও মফঃস্বল বাংলার থিয়েটার অনেক তীব্র, অনেক প্রোভোকেটিভ্। এক্ষেত্রে কলকাতার থিয়েটার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী মধ্যবিত্ত এবং কোন কোনও ক্ষেত্রে বিনোদনকলাকুতূহলী। এ ছাড়া বাম থিয়েটারের ছদ্মবেশধারী কিছু প্রতিক্রিয়ার থিয়েটারও এইসব দলের সঙ্গে মিশে আছে যারা 'বাম ঘেঁষা নাটক চলছে দেশে, ফলে ধরো সেই নাটক। কাটবে ভাল।' এই মতলবে থিয়েটারের অঙ্গনকে কলুষিত করছে। 'অথবা বাম ঘেঁষা ঠিক জমছে না ফলে হাসি গান নাচ নিয়ে তামাশা লাগিয়ে দাও, বিক্রী বাড়বে।'— এ সব চরিত্রহীনতার কথা আজকের কলকাতার বেশ ক'টি গ্রুপ থিয়েটারের থিয়েটারী কাজকর্মের বিচারে লাগসই মন্তব্য হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
এই গেলো আমাদের কালো থিয়েটারের কথা। তুলনায় সাদা রঙের থিয়েটার অনেক নির্ঝঞ্ঝাট। পরিস্কার। সহজে চেনা যায়। জীবনের অবক্ষয়ের গ্লানিকর দিকটাই এদের নাটকের মুখ্য বস্তু। আর তার রূপায়ণে থিয়েটারের ভাষা প্রয়োগে এরা কদাচ ভুল করে। অব্যর্থ আক্রমণে মধ্যবিত্ত বাঙালীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে এরা অনায়াসেই। এদের হাত থেকে আত্মরক্ষার দায়িত্ব মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর, জনগণের নয়। কারণ জনগণ এদের থিয়েটার দেখে না, দেখলেও বোঝে না।
আমাদের থিয়েটারের এই দুইরূপের এক আশ্চর্য সহাবস্থান আবার আজকের পেশাদার থিয়েটার এবং যাত্রায়। যেখানে সুস্থতা রক্ষার দায়িত্ব মুষ্টিমেয়র হাতে, সেখানে সরস্বতীর পদ্মবনে মত্তহস্তীর তাণ্ডব তো চলবেই। একদা আমাদের অনেকেই যারা গণনাট্যের শরিক ছিলাম, কি নবনাট্যের পথিকৃৎ ছিলাম এমন সব নামী-দামী দলের ঋত্বিক বা প্রধানরা এই সব অসুস্থতার পৃষ্ঠপোষক বা পরিবাহক। পেশাদারী থিয়েটারে অসুস্থতা প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝি কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পী বা নাট্যকারেরা কোন্ প্রেরণায় এই সব অসুস্থ চিন্তাধারার সামিল হয় এটা বুঝতে আমাদের কালমাত্র দেরী হয় না।
আমাদের এখন জনগণের সরকার। এই সরকারের কাছে থিয়েটার কর্মীদের অনেক দাবি, অনেক আর্জি। সরকার তার দেশের সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত করুক, এটা কোন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকর্মীই চাইবেন না। কিন্তু সেই সংস্কৃতিকর্মীই যদি সরকারী সাহায্য পুষ্ট হতে চান তাহলে সরকারই বা কেন সংস্কৃতির জগতে সরকারী অর্থের প্রলেপে মত্ত হস্তীর ন্যায় আচরণ করবেন না। যেমনটা কিনা আমাদের প্রাক্তন বুর্জোয়া সরকার বারবার এই অপকর্মটি করে গেছেন, কখনো সূক্ষ্মভাবে অসুস্থ সংস্কৃতির জাল বিছিয়ে, কখনো বা মোটা টাকার বাৎসরিক অনুদানে, কখনো বা রাজভবনে সাংস্কৃতিক চা পানের আয়োজন করে। সুতরাং রাজ্যের এই বাম জনগণের সরকার পেশাদারী থিয়েটারের আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে যদি তাদেরই উল্টে কিছু উপদেশ বা বিবেকবাণী শোনান তো খুব কি অগণতান্ত্রিক হয়ে যায় ব্যাপারটা? বরং আমরা তো বলবো আমাদের এই জনগণের সরকার শুরুতেই তো বলতে পারতেন যে যাঁরা এই বাম জনগণের সরকারের গুণপনা গাইবে তাঁদেরই তারা

বার্ষিক অনুদানের ব্যবস্থা করবেন। না, তাঁরা স্পষ্ট বলেছেন : জনগণই স্থির করে নিক যে তার সংস্কৃতির জগতে কোনটা সুস্থ, গ্রহণযোগ্য ; আর কোন্‌টা অসুস্থ, বর্জনযোগ্য। সরকার এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন না যেটা কিনা জনগণ চান না। আগের সরকারের সঙ্গে এ সরকারের এইখানেই পার্থক্য। জনগণ, তার প্রবহমান সংস্কৃতির জগৎ থেকে সুস্থতা না অসুস্থতা কোনটা বেছে নেবে তার এক আশ্চর্য পরীক্ষা করা শুরু হয়েছে সম্প্রতি থিয়েটার জগতের শ্লীলতা অশ্লীলতা নিয়ে। আমাদের মতে বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণায় এর কোনদিন বিচার হয়নি, হবেও না। তবে ক্যাবারে এমনই একজাতের নগ্ননৃত্য, যার প্রদর্শনের অধিকার রাতের কলকাতার নৈশ ক্লাবগুলির। এবং যথেষ্ট টাকার বিনিময়ে এই লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয় তাদের। সেটা কোন্‌ আইনের ফাঁকে বিনা লাইসেন্সে থিয়েটার হল মালিকের এক্তিয়ারভুক্ত হলো এটা কি আইন বিশারদরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না এই আমাদের প্রশ্ন ? এ ছাড়া পতিতা মাত্রই আদর্শ সংসারী হবার বাসনা প্রকাশ করতে পারে এবং সেটা কোন দোষের কথা নয় কিন্তু এই বিষয়টাকে নিয়ে সিনেমার মত 'A' মার্কা বা 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' ছাপ মারলেই যে সমস্ত বিষয়টা হয়ে ওঠে থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে রীতিমত অশ্লীল এ বোধ কি দেশের সংস্কৃতিবান প্রভুদের মনে জাগে না। কারণ থিয়েটারের এমন কোন সার্টিফিকেট নিতে হয় না সেন্সার বোর্ডের কাছ থেকে বা সেটা এক্সজিবিট করতে হয় না দর্শকদের কাছে। কিন্তু এই বিশেষ কায়দায় প্রচারটাই অতীব অভিসন্ধিপূর্ণ— দর্শকদের প্ররোচিত করা হচ্ছে, উত্তেজিত করা হচ্ছে যে এখানে এমন একটা মারাত্মক যৌনলীলা হচ্ছে যা নিষিদ্ধ বস্তুর মত। ফলে দর্শক আকর্ষণের জন্য এই ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে 'বারবধূ'র সমস্ত প্রচেষ্টাটা থিয়েটার জগতে একটা অসুস্থ নজির হয়ে থাকে। তবে এ দোষ কেবল বারবধূরই নয়, ক্যাবারে নাচিয়েওয়ালা সব পাবলিক থিয়েটার এবং যাত্রাওয়ালাদেরই! তবু এর মধ্যেও আশার কথা, কলকাতার সব পাবলিক থিয়েটার বা যাত্রাওয়ালারাই বারবধূর পথ নেয় নি। জনগণের সংস্কৃতিকে মর্যাদা দেয় এমন পাবলিক থিয়েটার বা যাত্রাদলও বেশ কয়টি আছে। এবং বেশ জোরদার ভাবেই আছে।

এমতাবস্থায় বাংলা থিয়েটার আন্দোলনের সার্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ এবং সুস্থ পথে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার কাঠবিড়ালীর প্রচেষ্টা নিয়েই গন্ধর্ব পুনঃপ্রকাশিত হলো।

গন্ধর্ব-র এই পুনঃপ্রকাশ কালে আমরা বাংলা থিয়েটার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়সূত্রে, গণনাট্য আন্দোলন থেকে যে সচেতন সংগঠিত থিয়েটার আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার পর্যালোচনা সূত্রে, সেই থিয়েটার আন্দোলনের প্রথম পথিকৃৎ যে শিল্পী আজও গণনাট্যের বিশ্বাস নিয়ে থিয়েটার করে যাচ্ছেন, সেই অক্লান্ত কর্মী বিজন ভট্টাচার্যের শিল্পী-জীবনের এক সমীক্ষা করার চেষ্টা করেছি — এই উদ্দেশ্য নিয়েই যে অতীতে মূল গণনাট্য সংঘ দুর্বল হয়ে পড়লেও তার ভাবাদর্শ নিয়ে আজও গণনাট্য আন্দোলন সক্রিয়। এবং এই রকম আদর্শ-উদ্বুদ্ধ বহু শিল্পীই যেখানে উত্তরকালে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সংঘ জীবনের অমিল ঘটিয়ে সরে পড়েছেন এবং পরবর্তীকালে কেবল নিজের কেরিয়ারই তৈরী করেছেন সমস্ত আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে, সেখানে বিজন ভট্টাচার্যের মত শিল্পী আজও তাঁর আদর্শচ্যুত হন নি, এটা সংঘর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বিচারে কম শ্লাঘার কথা না ; কারণ যেখানে

অজস্র ব্যক্তির অধঃপতনেই বা সংকীর্ণ আচরণের জন্যই সংঘের আদর্শ বা কর্ম ক্ষুণ্ন হওয়ার রয়েছে ভুরি ভুরি। যেখানে বাংলার থিয়েটার আন্দোলনে, বাম থিয়েটার আন্দোলনেই অজস্র ঘোলা আবর্ত তৈরী হয়ে রয়েছে, সেখানে বিজন ভট্টাচার্যের মত, হতে পারে অভিমানী, এক রোখা, অসাংগঠনিক চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তাঁর মত সৎ নিষ্ঠাবান গণশিল্পীকে আমরা অচ্ছুৎ করে রাখবো কোন্ অহংকারে! অহংকার যদি করা সাজে, তবে তাঁর মতো মহদাশয়েরই অহংকার করা সাজে। যিনি অপেশাদারী থিয়েটার আন্দোলনে নেমে পেশাদারী হয়ে ওঠার জন্য ব্যাকুল হন নি কোনদিন, থিয়েটারকে গণের কাছে নিয়ে যাবার জন্য জনমনোরঞ্জনী অ্যান্টি-প্লের বিনোদনী প্রলেপ দেন না তাঁর থিয়েটারে; সেই বিজন ভট্টাচার্য যদি একবার তেড়েফুড়ে গর্জন করে ওঠেন আমাদের এই গণের মঞ্চে, তাহলে কোথায় থাকে আমাদের এই শহুরে মধ্যবিত্ত বাম থিয়েটার আর তার স্বরলিপি না জানা শিল্পীরা?

কই বিজন বাবু তো চান না যে তাঁর মধ্যবিত্ত শিল্পীরা প্রোলেতারিয় শিল্পীদের নকলনবিশি করুক! তিনি তো চান মজবুত একটা সংগঠনের সমর্থন পেতে। তিনি তো চান দেশের ভিতর চলে যেতে। চান মাটির ইতিহাস জেনে নিতে। সংগ্রামের ইতিহাস জেনে নিতে। তিনি তো চান তারপর সেই তাঁদের দিয়েই নাটক করাতে। বিজন ভট্টাচার্য জানেন যে তাঁর নিজের সঙ্গেই নিজের একটা সংগ্রাম আছে। এ সংগ্রাম একালে কার নেই? তিনি দায়বদ্ধ হতে চান। তাঁর নিজের কথায়: পেতি বুর্জোয়া শিল্পীরা দেশের মানুষকে ভ্যাঙাচ্ছে, এ বেশি দিন চলতে পারে না। নতুন হিস্ট্রি-অনিক্স জন্ম নিচ্ছে। তাকে গ্রহণ করতে হবে।

তিনি গ্রহণ করতে চান, আর আমরা তাঁকে গ্রহণ করবো না!

—রমণ মহেশ্বরী

॥ ত্রুটি স্বীকার ॥

বিগত প্রযোজনা সংখ্যায় ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বিশিষ্ট নাট্যকার বলবন্ত গর্গীর নামের শেষে প্রয়াত শব্দ মুদ্রিত হওয়ায় আমরা দারুণ লজ্জিত। মরার বাড়া গাল নেই. শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে বাংলা প্রবাদের যথার্থতা প্রমাণ করে শ্রীযুক্ত গর্গী শতায়ু হোন এই কামনা করি।

শোক প্রস্তাব

গণনাট্য আন্দোলনের একদা পুরোধা শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং এই নাট্য আন্দোলনেরই অন্যতম শিল্পী মলিনা দেবী ও জহর রায়ের মৃত্যুতে বাংলা থিয়েটারের জগতে যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, আমরাও তার শরিক।

১৯৭৭র
গন্ধর্ব-র
প্রযোজনা
বদনাম
মজার মজা
ফুলওয়ালী
মধুচক্র

: নির্দেশনা :
দেবকুমার ভট্টাচার্য

: মঞ্চস্থাপত্য :
পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় | যোগেন চৌধুরী
শান্তনু দাস | মুকুর ভট্টাচার্য

: আলোক সম্পাত :
বিপ্লব চৌধুরী

অভিনয়ে

জগন্নাথ হালদার | শিবাজী সেন | মুকুর ভট্টাচার্য | সুধাংশু মৈত্র | বিপ্লব চৌধুরী | দিলীপ ব্যানার্জী | দেবকুমার ভট্টাচার্য | অধীর সেন | কল্পনা মুখোপাধ্যায় | কাজল মুখোপাধ্যায় | ঝুমুর ভট্টাচার্য | শান্তিময় ঘোষ | অলক ব্যানার্জী | তন্ময় কর্মকার | কণিষ্ক রায়

গন্ধর্বর প্রস্তুয়মান প্রযোজনা

বিজ্ঞাপন

মনসামঙ্গল কাব্য অনুপ্রাণিত 'গন্ধর্বর নতুন নাটক বিজন ভট্টচার্যর কর্মকাণ্ড অনুসরণে নাটক □

বাংলার আচার বিচার লোককথার সঙ্গে মিশে আছে মানুষের নিজের প্রয়োজনে সৃষ্ট সংস্কার, অলৌকিকত্ব, গুরুবাদ তুকতাক বশীকরণ প্রভৃতি □

সাধারণ নিরক্ষর সরল বোকা বিশ্বাসী মানুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের সহায়তার জন্য একশ্রেণীর বুদ্ধিমান মানুষ এই সমস্ত অবৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার প্রচার এবং প্রসার ঘটান □

কিন্তু নানারকম দুর্দশার অভিজ্ঞতার মাঝে যখন অবৈজ্ঞানিকের সামনে চোখ তুলে মানুষ দাঁড়ায় তখনই জন্ম নেয় এক পরীক্ষিত 'সত্যর'। এই সত্যই জন্ম দেয় নতুন চেতনার যুক্তির বিজ্ঞানের। সংস্কার, ঈশ্বর অলৌকিকত্ব প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস লুপ্ত হয়ে চিরজীবিতের হয় জয় □

গন্ধর্বর আগামী নাটক সেই অবৈজ্ঞানিকের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক সচেতনতার জয়ের পালা। নির্দেশনা দিচ্ছেন দেবকুমার ভট্টাচার্য □

মনসামঙ্গলের কেন্দ্র চরিত্র মনসা
নাটকের কেন্দ্র চরিত্র কপিলা
মনসামঙ্গলের প্রধান চরিত্র চাঁদবেনে
নাটকের প্রধান চরিত্র অর্জুন
মনসার প্রধান শত্রু ধন্বন্তরী
কপিলার প্রধান শত্রু গুণিন
মনসার বুদ্ধিদাতা নেতা
কপিলার সাকরেদ অযোধ্যা
মনসামঙ্গলের পার্শ্বচরিত্র জালু মালু
নাটকের পার্শ্বচরিত্র রামলাল পরাশর
মনসার প্রধান অস্ত্র ভয় ক্ষতি ভেল্কি
কপিলার প্রধান অস্ত্র ভয় ক্ষতি ভেল্কি
মনসামঙ্গল রচিত কাব্যে
নাটক রচিত গদ্যে

অভ্যুদয়ের পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব

মিনার্ভায়

১৩ই - ১৪ই - ১৫ই 1978

নাটক : **নাম নেই | বারো ঘণ্টা**
মৃতের মিছিল | দেহ আলো

সেই সঙ্গে নাট্যপ্রদর্শনী — স্মরণিকা প্রকাশ — সম্বর্ধনা

নাট্যরচনা ও নির্দেশনা | **কিরণ মৈত্র**

যে সমস্ত নাট্যসংস্থা ২৫ বছর পূর্ণ করেছে তাদের সম্বর্ধনা ও নাট্যসংস্থা সমূহের পরিচিতি স্মরণিকায় প্রকাশ করা হবে। যোগাযোগ করুন :

সুশীল দালাল, সাধারণ সম্পাদক : অভ্যুদয় ২৫ বছর উৎসব কমিটি, এফ/২ শান্তিনীড় এস্টেট কলকাতা-৩৬

পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা
নাচে - গানে ভরা দিশারী পুরস্কার প্রাপ্ত
সর্বকালের সাড়া জাগানো নাটক

চলতি প্রযোজনা : জিওরদানো ব্রুনো

নাটক ও প্রয়োগ : সমর দত্ত

ছাতা বর্ষাতিকে না-মানা কুকুর ভেজা বর্ষায়
নিয়মিত লোড-শেডিং জনিত ঘুটঘুটে অন্ধকারে
হাড় কাঁপানো শীতে
ঘামে ভেজা ক্লান্ত অস্বস্তিকর গ্রীষ্ম
এবং সি, আর, পির, 'হল্ট' নিষেধাজ্ঞাকে
উপেক্ষা করে যারা দিনের পর দিন
নাটকের মাধ্যমে জীবনের তপস্যায় মগ্ন
তাদের সোনালী স্বপ্নের আমরাও সংগ্রামী শরিক হতে চাই।

'কর্ণিক'

প্রফুল্ল চাকী সরণী
দেশবন্ধু পাড়া
শিলিগুড়ি—৭৩৪৪০৪

গন্ধর্বর
আগামী
প্রযোজনা
প্রস্তুয়মান

দশ বছর পর পুনর্জীবিত গন্ধর্বের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা

লোকালয়

আমাদের প্রযোজিত নিয়মিত নাটক

রজনী গন্ধা ● ধনঞ্জয় বৈরাগী।
যদি আমি কিন্তু আমি ● রাধারমন ঘোষ।
মরা মানুষের পাঠশালা ● নাজমুল আলম।
সূর্যের সন্তান ● সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃষ্টি বৃষ্টি ● রিচার্ড ন্যাস
নির্দেশনা: প্রণবকুমার দাশগুপ্ত / মাহবুব হাসান

অভিনয়ে

সাহানা আহমেদ। সালমা আহমেদ। সালেহা চক্রবর্তী। শুলেখা ওসাজেদ। সোমা আহম্মদ। গায়ত্রী বড়ুয়া। জয়শ্রী বড়ুয়া। সাদেক আলী। ভোলা সেন। মাহবুব হাসান। তৌফিকুর রহমান। প্রণবকুমার দাশগুপ্ত। অমল চৌধুরী। মোস্তাফিজুর রহমান। গোলাম মুরসালীন। শামসুল আরেফিন। রজলুর রহমান। মুকুন্দনারায়ণ দাশ। সবুক্তগীন মাহমুদ। মলয় কর। মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী। তপন ভট্টাচার্য। বিষ্ণুপদ দে। জাহাঙ্গীর মুন্সী। দুলাল মিত্র। অমর পাঠক। ওয়াজেদ আলী। মহঃ আবুল কাশেম।

৮৮, আবদুস সাত্তার রোড, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম। ফোন-৮৮৭৬৫

সুস্থ গণসংস্কৃতির স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন।

স্বাধীন, সুস্থ ও বলিষ্ঠ সংস্কৃতি দেশের প্রগতির পরিচায়ক। বর্তমানে দেশে যে সংস্কৃতি ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করছে এবং সাধারণ মানুষকে অগ্রগামী পথ থেকে পিছনে টেনে আনছে, তা অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতিসচেতন মানুষকে এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে এবং দায়িত্ব হিসাবে দেশবাসীকে সচেতন করতে হবে এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। সংস্কৃতিগত প্রশ্নে শোষকশ্রেণী যথেষ্ট সংগঠিত ও সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নানাভাবে। তাদের উপকরণ সাম্রাজ্যবাদের রপ্তানী করা বই, গান, নাচ, ছবি, চিত্র-ভাস্কর্য, শৈলী ও শিল্পচিন্তা অথবা সাম্রাজ্যবাদী শিল্পের অনুসরণে ও অনুকরণে কৃত অশ্লীল, অবক্ষয়ী শিল্প ও শিল্পচিন্তা; আর এরই সাথে হাত মিলিয়ে চলেছে জরাজর্জর সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু চিন্তাধারা। এতে সৃষ্টি হচ্ছে অপসংস্কৃতির—যা দেশের প্রগতিকে করছে ব্যাহত, জীবনে টেনে আনছে কৃত্রিমতা, একাকীত্ব আর নৈতিক অবনতি। এই সংগঠিত অপসাংস্কৃতিক আক্রমণ রুখতে হলে সাধারণ মানুষের মধ্যেই গড়ে তুলতে হবে সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা চল্লিশের দশকের শেষ থেকে পঞ্চাশের দশকের প্রথমাবধি এই ধরনের একটি প্রচেষ্টায় রত হয়েছিল। আজো এই প্রচেষ্টা করে চলেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের সাংস্কৃতিক শাখাগুলি।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রয়োজন অনুভব করছি অন্ততঃপক্ষে মতবিনিময়ের একটি সাধারণ মঞ্চের। মতবিনিময় ও সমস্যা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে শোষকশ্রেণীর সংস্কৃতির মোকাবিলায় জনগণের এক ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে। এই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে :

(১) জনগণের সামনে শোষকশ্রেণীর রূপগুলি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা। (২) জনমানস হতে অপসংস্কৃতিসৃষ্ট বিকৃত মূল্যবোধ উৎপাটিত করা ও জনগণকে জীবন সমস্যার মূল পর্যন্ত দেখতে সাহায্য করা। (৩) শোষণ হতে মুক্তির সংগ্রামে জনগণকে সামিল করা। (৪) শোষিত মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস ও সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করা। (৫) জনগণের অন্তর্নিহিত শিল্পসৃষ্টির বিকাশ ও প্রকাশ ঘটিয়ে এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকে সংঘটিত করে সংস্কৃতি সৃজন প্রক্রিয়ায় তাঁদের সক্রিয় অংশীদার করে তোলা। (৬) সংস্কৃতি কর্মীদের সাথে মেহনতী ও গণতন্ত্রকামী মানুষের একাত্মবোধ সৃষ্টি করা।

জনগণের শোষণমুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক কাজে সত্যিকারের আগ্রহী ব্যক্তিরা দলমতনির্বিশেষে এই সংগঠনে যোগ দিতে পারেন।

৮।১০।১৯৭৭

গণসংস্কৃতি কর্মী সম্মিলনী প্রস্তুতি কমিটি

যোগাযোগের ঠিকানা : সুকান্ত সেনগুপ্ত | ১০৩ রাসবিহারী এভিনিউ | কলকাতা-২৯